ভারতের শাসনপদ্ধতি

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্, এ,
(ইতিহাস ও ধনবিজ্ঞান)
পি, এইচ, ডি, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, ভাগবতরত্ন, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ,
এইচ, ডি, জৈন কলেজ, আরা ও ভূতপূর্ব ইন্‌স্পেক্টর অব্
কলেজেস্, বিহার বিশ্ববিদ্যালয় পাটনা।

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শঙ্কর ঘোষ লেন্, কলিকাতা-৬
কলিকাতা : এলাহাবাদ : পাটনা

প্রকাশক :
শ্রীজানকীনাথ বসু এম, এ
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শঙ্কর ঘোষ লেন্
কলিকাতা-৬

বিক্রয় কেন্দ্র :
২১১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

শাখা :
অশোক্ রাজপথ
পাটনা-৪
৪৪, জনষ্টনগঞ্জ
এলাহাবাদ-৩

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী
লোকসেবক প্রেস
৮৬-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র
কলিকাতা-১৪

ভূমিকা

আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় ভারতের সংবিধান কিভাবে কাজ করিতেছে তাহা এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। কেবলমাত্র সংবিধানের ধারার ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিশ্লেষণ হইতে শাসনপদ্ধতির স্বরূপ বুঝা কঠিন। সংবিধান প্রচলনের সময় হইতে আজ পর্যন্ত কত সাংবিধানিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে; সেগুলি কিভাবে সমাধান করা হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে আমাদের শাসনপদ্ধতির গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা সহজ হইবে। সংবিধানে অনেক বিষয়ের উল্লেখ থাকে না এবং উহার ধারা উপধারায় যাহা লিখিত থাকে সব সময়ে সেই অনুসারে কাজ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদের (Council of Ministers) কথা আছে, ক্যাবিনেটের নামটি পর্যন্ত নাই; অথচ মন্ত্রিপরিষদের কখনও কোন অধিবেশন হয় না; ক্যাবিনেটই সমস্ত শক্তির আধারস্বরূপ। কেবলমাত্র সংবিধান পাঠ করিলে কিন্তু মনে হয় রাষ্ট্রপতিই বুঝি সকল শক্তির উৎস। সংসদ, শাসনবিভাগ ও রাজনৈতিক দলগুলির উপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের চাপ কিভাবে কতটা দেখা যায় তাহাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ভারতের নাগরিকবৃন্দ যাহাতে দেশের শাসনপদ্ধতির বাস্তবচিত্রের সহিত সুপরিচিত হইয়া গণতন্ত্রকে জয়যুক্ত করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত হইল।

১০।৬।৬৩

গোলাদরিয়াপুর

পাটনা-৪

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

সূচীপত্র

ভারতের শাসনপদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের বিকাশধারা

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র : আমাদের ভারতবর্ষ হইতেছে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে একুশ কোটি ভোটারের জন্য সওয়া দুইলক্ষ ভোট দিবার কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। গণতন্ত্রশাসিত অন্য কোন রাষ্ট্রে এত জনসংখ্যা নাই, এত ভোটারও নাই। আমাদের জনসংখ্যা ব্রিটেনের অপেক্ষা আটগুণ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আড়াইগুণের চেয়েও বেশি। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার সম্পূর্ণ সংবাদ এখন প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে আমাদের লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮২ জন, তন্মধ্যে ২২,৬২,৯৩,৬২০ জন পুরুষ এবং ২১,২৯,৪১,৪৬২ জন নারী। অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় নারী এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ কম। তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে এইটি বোধ হয় একটি উজ্জ্বল রেখা। কেননা মায়ের জাত সংখ্যায় কিছু কম আছেন বলিয়া লোকসংখ্যা ভবিষ্যতে কিছু কম বাড়িতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৫১ হইতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমাদের দেশের লোকের সংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ বাড়িয়াছে। ইহা যে কিরূপ ভয়াবহ ব্যাপার তাহা বুঝাইবার জন্য মনে রাখা দরকার যে আমাদের এই বাড়তি লোকসংখ্যাটা ব্রিটেনে সবশুদ্ধ যত লোক আছে তাহার দেড়গুণ এবং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির সম্মিলিত লোকসংখ্যার চেয়ে কিছু বেশি। পঞ্চবার্ষিকী যোজনা তৈয়ারির সময় ভাবা যায় নাই যে লোকসংখ্যা এত বেশি বাড়িবে। খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা বাড়াইতে না বাড়াইতে লোকসংখ্যার অনুপাতে উহাতে ঘাটতি পড়িতেছে।

জনসংখ্যার ভয়াবহ বৃদ্ধি

আমাদের নূতন গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সমস্যা হইতেছে এই দ্রুত পরিবর্ধমান জনসংখ্যা। জমির পরিমাণ একটুও বাড়ানো যায় না। আমাদের ভাগে আছে দুনিয়ার শতকরা আড়াইভাগ জমি, অথচ শতকরা চৌদ্দ ভাগ লোক। যদি শিল্প-বাণিজ্যে অধিকাংশ লোক নিযুক্ত থাকিত তাহা হইলে

একটি কাজের অনুপাতে আড়াইজন লোকের বৃদ্ধি

তত বেশি উদ্বেগের কারণ হইত না। কিন্তু আমাদের দেশে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৬৬.৮ জন কৃষিকর্ম করিয়া জীবনধারণ করিত, এখন সেটা একটু কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৬৪.৮ জন। গত দশ বৎসরে আমাদের সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা ও আর্থিক যোজনা করিয়া কর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা তিন কোটি আন্দাজ বাড়াইতে পারিয়াছেন। ইহা অসামান্য সাফল্যের পরিচায়ক বটে, কিন্তু যেখানে কাজ বাড়িতেছে একটি, সেখানে মানুষ বাড়িতেছে আড়াইজন, কেননা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দশ বছরে সাড়ে সাত কোটির চেয়ে বেশি লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির আহার, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান জোগাইবার এবং তাহাদিগকে সুশিক্ষিত নাগরিক করিয়া তুলিবার দায়িত্ব ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। এতবড় দায়িত্ব আর অন্য কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর নাই। প্রত্যেক নাগরিক যদি দেশের সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলিয়া মনে করিতে পারিতেন তাহা হইলে উহার সমাধান করা অনেক বেশি সহজ হইত। কিন্তু আমাদের দেশের শতকরা ২৪ জন মাত্র অর্থাৎ সিকিবিভাগেরও কম লোক মাতৃভাষায় নিজের নাম সহি করিতে পারেন। ইঁহাদের মধ্যে পুরুষের ভাগ শতকরা ৩৪.৪ জন, আর মেয়েদের ১২.৯ জন মাত্র। আমাদের সংবিধানের রচয়িতারা আশা করিয়াছিলেন যে দশ বৎসরের মধ্যে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বয়সের সব ছেলেমেয়েকে বিনা বেতনে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। এখন ছয় হইতে এগার বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেদের মধ্যে শতকরা ৬১ জন এবং এগার হইতে চৌদ্দ বছরের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে শতকরা ২১ জন মাত্র বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে।

শিক্ষা-প্রচারের সমস্যা

শিক্ষিত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও সহযোগিতা উভয়েরই অভাব। ভারতের ব্রিটিশ সরকারের সহিত অসহযোগিতা করিয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। তাই বোধ হয় সরকার যাহা বলেন তাহার উল্টা করিবার ঝোঁক এখনও অনেকের মধ্যে প্রবল। কিছুকাল আগে সরকারী মহল হইতে

বুভুক্ষা, বেকারি ও অশিক্ষা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু

যত জোর গলায় প্রচার করা হইত "ফসল বাড়াও" তত দিন দিন কম ফসল উৎপন্ন হইত। এখন আবার পরিবার নিয়ন্ত্রণের জন্য যত বেশি প্রচার চালানো হইতেছে লোকসংখ্যা তত বেশি বাড়িতেছে। লোকগণনার অধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়াছেন যে গত দশ বৎসরে শতকরা বার্ষিক আড়াই জন হারে লোক বাড়িয়াছে, কিন্তু আগামী দশ বৎসরে উহা প্রায় পৌনে তিন (২·৭) জন হারে বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। বুভুক্ষু জনসমষ্টি, ক্রমবর্ধনশীল বেকারি এবং অশিক্ষিত নাগরিকগণ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।

ব্রিটিশ আমলের শাসনপদ্ধতি ঃ ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি স্থাপনার প্রধান অন্তরায় ছিল ব্রিটিশদের প্রভুত্ব এবং তাঁহাদের আশ্রিত রাজন্যবর্গের স্বেচ্ছাচারী শাসন। কথায় বলে সূর্যের তাপের চেয়ে বালুকার উত্তাপ বেশি অসহ্য মনে হয়। ব্রিটিশ শাসকবর্গ শ' দেড়েক বছর শাসন করার পর ভারতীয়দিগকে কিছু কিছু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে দুই চারজন ছাড়া আর সকলেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিনা রক্তাক্ত বিপ্লবে এই দুই অন্তরায়কে বিদূরিত করাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

স্বাধীনতার দুইটি

ব্রিটিশ বণিকদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহাদের মানদণ্ড শেষ পর্যন্ত রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইল। পলাশীর যুদ্ধের ষোল বছর পরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জের মন্ত্রী লর্ড নর্থ পার্লামেণ্টের মাধ্যমে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস করাইয়া কোম্পানীর শাসনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করেন। ঐ আইনের দ্বারা বোম্বাই ও মাদ্রাজকে বাংলার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য করা হয়। যুদ্ধ ও সন্ধির ক্ষমতা কেবলমাত্র বাংলার সরকারকে দেওয়া হয়। ঐ আইনে গবর্ণর জেনারলের ও তাঁহার পরিষদের চারজন সদস্যদের পদ সৃষ্টি করা হয়। ঐ পরিষদই এখন পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া ভারতের কেবিনেটে পরিণত হইয়াছে। স-পরিষদ গবর্ণর জেনারল কোম্পানীর অধিকৃত সকল স্থানের জন্য আইন তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। ঐ আইনকে রেগুলেসন বলা হইত। সুপ্রিম কোর্ট নামে

রেগুলেটিং অ্যাক্ট ১৭৭৩

সর্বোচ্চ আদালতও ঐ সময়ে সৃষ্টি হয়। উহাতে একজন প্রধান ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি থাকিবেন স্থির হয়। রেগুলেশনগুলি সুপ্রিম কোর্টে রেজেস্ট্রি করিতে হইত।

ক্ষমতা পৃথকী করণ নীতি

রেগুলেটিং অ্যাক্টের দ্বারা পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনপদ্ধতিকে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনুসারে সাজাইতে চাহিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারলের শাসনপরিষদের সদস্যেরা কোম্পানী কর্মচারী হইবেন না, তাঁহারা খাস রাজার দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার দ্বারাই অপসারিত হইতে পারিবেন স্থির হয়। তাঁহাদের অধিকাংশের মত লইয়া গবর্ণর জেনারলকে কাজ করিতে হইত। কিন্তু প্রথম হইতেই তিনজন সদস্য গবর্ণর জেনারল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিপক্ষে দলবদ্ধ হইলেন। তাহার ফলে কাজকর্ম একরকম অচল হইয়া উঠিল। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গেও গবর্ণর জেনারলের সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। সুপ্রিম কোর্ট গবর্ণর জেনারলের সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিবার ক্ষমতা দাবি করিলেন। এদিকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ আইন উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ পার্লামেণ্টে পৌঁছিল। পার্লামেণ্ট বার্বোর সভাপতিত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি স্থাপন করিলেন। ঐ কমিটি ওয়ারেন হেস্টিংসকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু কোম্পানীর মালিকসভা (Court of Proprietors) বলিলেন যে হেস্টিংস ভারতবর্ষে খুব ভাল কাজ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলা যায় না। মোটের উপর পার্লামেণ্ট নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্টের নানাপ্রকার দোষত্রুটি বুঝিতে পারিলেন।

পীটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৭৮৪

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কেবলমাত্র বাণিজ্য চালাইবার ও কর্মচারী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা দিয়া পার্লামেণ্ট বাকী সব ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত করিবার জন্য ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আর একটি আইন তৈয়ারি করেন। উহাকে পীটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বলে। ঐ আইনের ফলে ভারত সচিবের পদ সৃষ্ট হয়। তিনি, রাজস্ব সচিব এবং চারজন প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য মিলিয়া বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সদস্য হন। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসিত সমস্ত স্থানের উপর

সামরিক ও বেসামরিক সকল ব্যাপারের নির্দেশ নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ঐ বোর্ডের হাতে ন্যস্ত হয়। বোর্ড কোম্পানীর যে কোন কর্মচারীকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতালাভ করেন। বাংলার গবর্ণর জেনারল ও বোম্বাই ও মাদ্রাজের গবর্ণর পরিষদের সদস্য সংখ্যা চার হইতে কমাইয়া তিন করা হয়। ইহার পর ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের এক আইন বলে গবর্ণর জেনারল তাঁহার পরিষদের অধিকাংশের মত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট আমাদের প্রদত্ত কর হইতে আমাদের শিক্ষার জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা খরচ করিবার অনুমতি দেন। ইহার পূর্বে তাঁহাদের ধারণা ছিল যে রাজার কাজ শাসন করা, লেখাপড়া শেখানো নয়। গত দেড় শত বৎসরে ভারতে শিক্ষার ব্যয় ত্রিশ হাজার গুণ বাড়িয়া প্রায় তিন শত কোটিতে দাঁড়াইয়াছে।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হারাইল। কলিকাতায় বসিয়া স-পরিষদ গবর্ণর জেনারল যে আইন করিয়া দিবেন তাহা কোম্পানী শাসিত সকল অঞ্চল এবং সকল আদালত মানিতে বাধ্য হইল। পূর্বে সুপ্রিম কোর্টে আইন রেজেস্ট্রি না করিলে উহা কার্যে পরিণত হইত না। এখন সে নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হইল। এখন আর সুপ্রিম কোর্ট গবর্ণর জেনারলের কাজে বাধা দিতে পারিতেন না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট হইতে আমরা ভারতের আইনসভার জন্ম নির্দেশ করিতে পারি। ঐ অ্যাক্টের ফলে গবর্ণর জেনারলের পরিষদের জন্য একজন স্বতন্ত্র আইন সচিব নিযুক্ত হইলেন। গবর্ণর জেনারল যখন তাঁহাকে পরিষদে আহ্বান করিতেন তখন ঐ পরিষদ আইন পরিষদে রূপান্তরিত হইত। লর্ড মেকলে প্রথম আইনসচিব নিযুক্ত হন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আবার যখন কোম্পানী সনদের মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তখন পার্লামেণ্ট শাসনব্যবস্থায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন। প্রথমতঃ ছয়জন আইনসভার অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্ত করা হইল। বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) হইতে এক একজন

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট

সরকারী ইংরাজ প্রতিনিধি এবং সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য একজন বিচারপতি এইভাবে আইনসভার অতিরিক্ত সদস্য হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গবর্ণর জেনারেলের শাসনপরিষদের সদস্যেরা মিলিত হইলে আইনসভা সংগঠিত হইত। এই আইনসভা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুসরণে শাসনবিভাগকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকায় গবর্ণর জেনারেলের খুব সুবিধা ঘটিয়াছিল। এতকাল পর্যন্ত ইংরাজেরা মুরুব্বির জোরে অথবা ঘুসের জোরে ভারত সরকারে চাকুরি পাইতেন এইবার তাহা বন্ধ করিয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন করা হইল। বাংলাদেশের জন্য এই সময় হইতে একজন ছোট লাট নিযুক্ত করা হইল।

কয়েকজন মাত্র ইংরাজ কোটি কোটি ভারতবাসীর মতামতের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া শাসনকার্য চালাইবেন এ ব্যবস্থা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অসন্তোষজনক, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপন করিয়া পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করেন যে ভারতে আইনসভা গঠিত করিয়া তাহাতে কয়েকজন ভারতীয়কে স্থান দান করা হউক। বোম্বাই ও মাদ্রাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও অনুরূপ দাবি করেন, কিন্তু পার্লামেণ্ট ঐ দাবি অগ্রাহ্য করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম বাধিয়া উঠিলে বিচক্ষণ ইংরাজরা বুঝিতে পারিলেন যে ভারতবাসীকে শাসন বিষয়ে কোন কথা বলিতে না দিলে শেষ পর্যন্ত বিপ্লব ঘটিবে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের কোম্পানীর ক্ষমতা লোপ পাইল এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের পূর্ণ অধিকার স্থাপিত হইল।

ভারতবাসীদের দাবি

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে Indian Council Act পাস করিয়া পার্লামেণ্ট ভারতীয় আইনসভায় কয়েকজন ভারতীয় সদস্যকে মনোনীত করিবার ব্যবস্থা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল যে আইনসভায় ছয় জনের কম নহে এবং বারজনের বেশি নহে অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্ত করা হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যে বেসরকারী সদস্য যেন অর্ধেকের কম না হয়। বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয়কে লইবার ব্যবস্থা করা হইল। তাঁহাদের কার্যকাল মাত্র

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ভারত কাউন্সিল অ্যাক্ট

দুই বৎসর ছিল। প্রথম প্রথম ভারতীয় রাজন্য বা তাঁহাদের দেওয়ানকে এবং বড় বড় জমিদারকে মনোনীত করা হইত।

কিন্তু ঐ আইনসভার ক্ষমতা ছিল নিতান্ত সামান্য। শাসন সম্পর্কে কোন কথা বলিবার এমন কি কর বসাইবার ক্ষমতাও ইহার ছিল না। কতকগুলি বিষয়ে বিল পেশ করিবার পূর্বে গবর্ণর জেনারেলের অনুমতি লইতে হইত। আবার যে কোন বিল নাকচ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল।

প্রাদেশিক আইনসভা

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও মাদ্রাজকে প্রাদেশিক আইনসভা গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু কোন আইন পাস হইবার পূর্বে উহাতে গবর্ণরের ও গবর্ণর জেনারেলের সম্মতির প্রয়োজন হইত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশে আইনসভা স্থাপিত হয়। প্রাদেশিক আইনসভায় অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ সদস্য বেসরকারী হওয়া দরকার ছিল।

ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রতিনিধিত্ব-মূলক শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন দাবি করিতে লাগিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল। গবর্ণর জেনারল লর্ড ডাফরিন ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষকে বুঝাইলেন যে ভারতীয়গণের দাবি মিটাইবার জন্য কিছু করা প্রয়োজন। তাই ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের India Council Act পাস করিয়া ভারতীয় আইনপরিষদে আরও পাঁচজন অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইঁহাদের মধ্যে চারজন চারটি প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা এবং একজন কলিকাতার বণিকসভার দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু সরকার তখনও নির্বাচন শব্দটি ব্যবহার করিতে নারাজ ছিলেন বলিয়া স্থির হয় যে বড়লাটের কাছে ঐ পাঁচটি নাম সুপারিশ করা হইবে এবং বড়লাট তাঁহাদিগকে মনোনীত করিবেন। অনভিপ্রেত ব্যক্তিকে এড়াইবার ইহা একটি কৌশলও বটে। প্রাদেশিক আইনসভা-গুলিতেও পরোক্ষভাবে নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হইল। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি হইতে যেসব সদস্যদের নাম সুপারিশ করা হইত লাট বা ছোটলাট তাঁহাদিগকে মনোনীত করিতেন। এইভাবে

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট

ভারতীয় আইনসভায় অতিরিক্ত সদস্যদের উর্ধ্বতম সংখ্যা স্থির হইল ১৬, মাদ্রাজ, বোম্বাই, ও বাংলায় প্রত্যেক ২০ এবং উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বর্মায় প্রত্যেকে ১৫। ইঁহারা ছাড়া শাসনপরিষদের সদস্যেরাও আইনসভার সদস্য হইতেন। এই সময়ে আইনসভাকে প্রশ্ন করিবার ও বাজেট লইয়া আলোচনা করিবার (পেশ করিবার নহে) অধিকার দেওয়া হয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার ভাব খুব বৃদ্ধি পাইল। সেই সময় হইতে চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হইল। এই আন্দোলনকে প্রশমিত করিবার জন্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মর্লে-মিণ্টো সংবিধান পাস করানো হয়। উহাতে ভারতীয় আইনপরিষদে বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করা হইল। বাজেট সম্বন্ধে পূর্ণতর আলোচনা করিবার এবং সেই সম্বন্ধে প্রস্তাব পাস করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল বটে, কিন্তু সেই প্রস্তাব মানা না মানা শাসনপরিষদের ইচ্ছাধীন রহিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নির্বাচন প্রথাকে মানিয়া লওয়া হইল। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রবর্তিত হইল। মুসলমানগণ, বণিকসভা, জমিদার প্রভৃতি নিজ নিজ প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পাইলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মর্লো মিণ্টো বিধান

১৯১২ খৃস্টাব্দে একটি রেগুলেশনের দ্বারা স্থির করা হয় যে ভারতের আইনসভায় শাসনপরিষদের সদস্যসমেত ৬৮ জন সভ্য, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের আইনসভায় ৪৮ জন করিয়া, বাংলায় ৫৩ জন, বিহার ও উড়িষ্যার সম্মিলিত প্রদেশে ৪৪ জন, উত্তরপ্রদেশে ৪৯ জন, পাঞ্জাবে ২৬ জন, বর্মায় ১৭ জন এবং আসামে ২৫ জন সভ্য থাকিবেন। ভারতীয় আইনসভায় ২৮ জন সরকারী ৫ জন সদস্য ছিলেন, বাকী ৩৫ জন বেসরকারী নির্বাচিত সদস্য। বাংলার আইনসভায় ৩ জন শাসনপরিষদের সদস্য, ১৬ জন সরকারী সদস্য ও ৪ জন মনোনীত সদস্য অর্থাৎ ২৩ জন সরকারের নিজের লোক থাকিতেন আর ১ জন কলিকাতা করপোরেশন হইতে, ১০ জন মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ড হইতে, ১ জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, ৪ জন জমিদারদের দ্বারা, ১ জন চা-কর সাহেবদের দ্বারা, ৫ জন মুসলমানগণের দ্বারা, ২ জন খৃষ্টানদের দ্বারা, ১ জন ভারতীয় বণিকসভার দ্বারা এবং ৫

প্রাদেশিক আইনসভা

জন অন্যান্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা মনোনীত সদস্য অপেক্ষা বেশি হইলেও সরকারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা কঠিন হইত না।

এই আইনেও দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়গণ ব্রিটেনকে প্রচুর সহায়তা করে। তাই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় শাসনবিধি তৈয়ারি করিলেন। ইহার নাম মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড আইন। ইহাতে কতকগুলি বিষয়কে প্রাদেশিক এবং কতকগুলি বিষয়কে সর্বভারতীয়রূপে স্থির করা হয়। প্রাদেশিক বিষয়গুলির মধ্যে আবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবগারী প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিষয়রূপে এবং রাজস্ব, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রভৃতিকে সংরক্ষিত বিষয়রূপে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ বিভাগকে ডায়ার্কি বলা হইত।—কেন না ইহা ছিল দুই ধরনের শাসনের সংমিশ্রণ। হস্তান্তরিত বিষয়গুলির পরিচালনার ভার ছিল নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে। তাঁহারা প্রাদেশিক আইনসভার নিকট দায়ী থাকিতেন। আর সংরক্ষিত বিষয়গুলি চালাইতেন শাসনপরিষদের মনোনীত সদস্যগণ। তাঁহাদের উপর আইনসভার কোন এক্তিয়ার ছিল না। সকল ব্যাপারের মূল হইতেছে টাকাকড়ি; সেই সিন্দুকের চাবিকাঠি থাকিত শাসন-পরিষদের সদস্যদের হাতে। লাটসাহেব আইনসভার যে কোন প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন। আইনসভা যদি কোন খরচা নামঞ্জুর করিতেন তাহাও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা লাটসাহেবের ছিল। মন্ত্রীরা যদি বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা দেখাইতেন তাহা হইলে লাটসাহেব তাঁহাদিগকে নানাভাবে অপদস্থ করিতেন।

১৯১৯ খৃস্টাব্দের মণ্টেগু-চেমসফোর্ড বিধান

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে বাংলাদেশের আইনসভায় ১৩৯ জন সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে অমুসলমানেরা গ্রাম অঞ্চল হইতে ৩৫ জন ও সহর অঞ্চল হইতে ১১ জন, মুসলমানেরা পল্লী হইতে ৩৩ জন ও সহর হইতে ৬ জন, ইউরোপীয়ান ৫ জন, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানেরা ২ জন নির্বাচন করিতেন। সরকারী সদস্যসংখ্যা ছিল ২০, বেসরকারী মনোনীত সদস্য ৬। জমিদারেরা ৫ জন, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ১৫ জন, ও বিশ্ববিদ্যালয় ১ জনকে

বাংলার আইনসভার সংগঠন

নির্বাচিত করিতেন। দেশকে খণ্ড খণ্ড স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের সমষ্টিরূপে দেখা হইত।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আইনসভায় দুইটি কক্ষ স্থাপন করা হয়। উচ্চকক্ষে অনধিক ষাটজন সদস্য ছিল, নিম্নকক্ষে মোট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৪৩ জন করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে মাত্র ৩৫ জন সরকারী এবং ১৫ জন বেসরকারী মনোনীত সদস্য ছিলেন। আর বাকী ১০৩ জন সাম্প্রদায়িক ও বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইতেন। অ-মুসলমানেরা ৫১ জন, মুসলমানেরা ৩০ জন, শিখেরা ২ জন, ইউরোপীয়েরা ৯ জন, জমিদারেরা ৭ জন, বণিকেরা ৪ জনকে নির্বাচন করিতেন। ভারতীয় শাসনপরিষদ কোন বিষয়ের জন্যই আইন-সভার নিকট দায়ী ছিলেন না। আইনসভা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিতেন না। গবর্ণর জেনারলের বিনা অনুমতিতে কতকগুলি বিল পেশ করা যাইত না। সরকার পক্ষ হইতে যে বিল উত্থাপন করা হইত তাহা ভোটে পাস না হইলেও বড়লাট উহা স্বীয় ক্ষমতাবলে আইনে পরিণত করিতে পারিতেন। কর বসাইবার ও খরচা মঞ্জুরির প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইলে বড়লাট উহা স্বীয় অধিকার বলে অনুমোদন করিতে পারিতেন। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী এরূপ ভুয়া শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত গণ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় প্রথমে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন ও পরে আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত হইল। হাজার হাজার লোক জেলে যাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় কক্ষ

মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন

দেশকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় নূতন সংবিধান রচনা করিলেন। এইবার সর্ব প্রথম ভারতীয় রাজন্যবর্গশাসিত অঞ্চলগুলিকে ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির সহিত যুক্ত করিয়া এক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু রাজন্যবর্গের তখনো চৈতন্যোদয় হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে রাজী হইলেন না। কাজেই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের কথা থাকিলেও, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা পূর্বে যেমন চলিতেছিল পরেও তেমনি রহিয়া গেল। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধান

হইল। প্রদেশে ডায়ার্কি উঠাইয়া দিয়া সকল বিষয়ই মন্ত্রীদের আয়ত্তে দেওয়া হইল এবং মন্ত্রীদিগকে আইনসভার নিকট দায়ী করা হইল। তবে লাটসাহেবের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা বজায় রাখা হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে ও প্রয়োজন বুঝিলে ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া দেশের শাসন বজায় রাখিতে পারিতেন। তিনি মন্ত্রীদের উপদেশ না লইয়াও কাজ করিতে পারিতেন। ঐরূপ ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য বড়লাট এবং ভারতসচিবের অধীন ছিলেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধানের প্রাদেশিক অংশ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চালু হয়। ব্রিটিশ ভারতের তখন এগারটি প্রদেশ ছিল—যথা আসাম, বিহার, বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সংযুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয়টিতে দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে জনগণের মধ্যে মাত্র শতকরা তিনজন ভোটের অধিকার পাইয়াছিলেন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে শতকরা ১৪জন ভোট দিবার ক্ষমতা পাইলেন। বাংলা দেশের আইনসভার প্রথম সদনে (Legislative Assembly) আড়াই শতজন এবং দ্বিতীয় সদনে (Legislative Council) পঁয়ষট্টি জন সদস্য ছিলেন। সাধারণ অর্থাৎ হিন্দুরা ৭৮ জন, হরিজনেরা ৩০, মুসলমানগণ ১১৭, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানেরা ৩, ইউরোপীয়ানগণ ১১, খ্রীষ্টানেরা ২, শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯, জমিদারেরা ৫, বিশ্ববিদ্যালয় ২, শ্রমিকেরা ৮ এবং মহিলারা ৫ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেন। দ্বিতীয় সদন বা উচ্চ কক্ষে সাধারণ ব্যক্তিরা ১০ জন, মুসলমানেরা ১৭ জন এবং ইউরোপীয়েরা ৩ জন নির্বাচন করিতেন ; আর প্রথম সদন হইতে ২৭ জন নির্বাচিত হইতেন এবং আটজনকে লাটসাহেব মনোনীত করিতে পারিতেন।

ভারতসচিবের পরিষদের অবসান

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে যে বোর্ড অব কণ্ট্রোল গঠিত হইয়াছিল তাহাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পরিবর্তিত হইয়া ভারতসচিবের পরিষদে পরিণত হইয়াছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে ঐ পরিষদ লোপ করা হয় এবং উহার স্থানে ভারতসচিবের কয়েকজন পরামর্শ দাতা নিযুক্ত হন। পূর্বে ঐ পরিষদের সদস্যদের বেতন ভারতবাসীকে দিতে হইত। পরামর্শ দাতাদের বেতন ব্রিটিশ সরকার

দিতেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শাসনসংক্রান্ত সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসার ক্ষমতা ছিল ভারতসচিবের। বড়লাট তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন নূতন নীতি গ্রহণ করিতেন না।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধানের প্রভাব

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধানের সংঘাত্মক অংশ কার্যে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু উহার অনেকগুলি ধারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া আমাদের ভারতীয় গণতন্ত্রের সংবিধানে স্থান লাভ করিয়াছে। পরাধীন ভারতের শাসনপদ্ধতির সহিত স্বাধীন ভারতের সংবিধানের গুরুতর পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু অতীতের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে কোন জাতিই মুক্ত হইতে পারে না। সেইজন্য ভারতের শাসনপদ্ধতির বিবর্তনের সামান্য একটু রূপরেখা এখানে নির্দেশ করা হইল।

সংবিধান প্রণয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধান কোন দল, সম্প্রদায় ও স্বার্থবিশেষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই।

সংবিধান রচনাকারী সভা

ব্রিটিশ ভারতের এগারটির মধ্যে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ঐ প্রদেশগুলির আইনসভা একটি প্রস্তাব পাস করিয়া দাবি করেন যে জনগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত এক সংবিধান প্রণয়নকারী সভা (Constituent Assembly) ভারতের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করুক। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এই দাবি উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ইহাতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ জাতি বুঝিতে পারিলেন যে ভারত-বাসীদিগকে সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে তাঁহাদের পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব। তাই ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনের কোয়ালিশন সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে ভারতীয়গণকে তাঁহাদের নিজের সংবিধান রচনা করিতে দেওয়া হইবে।

ক্রিপসের দৌত্য

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যখন জাপানীরা ভারতের দ্বারে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই সময়ে ব্রিটিশ কেবিনেট তাঁহাদের সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুঝাপড়া করিবার জন্য পাঠাইলেন। ক্রিপস্ প্রস্তাব করেন যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি সম্মত হন তাহা হইলে একটি Constituent Assembly-র হাতে

সংবিধান প্রণয়নের ভার দেওয়া হইবে, ভারতবর্ষকে ডোমিনয়ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে এবং ভারতীয় একাদশটি প্রদেশের সহিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের শাসিত অংশ যুক্ত করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইবে। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ্ একমত হইতে পারিলেন না। মুসলিম লীগ্ স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবি করিতে লাগিলেন। সুতরাং ক্রিপস্ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। বড়লাট ওয়াভেল সাহেব দুই দলের মধ্যে মিটমাট করিবার জন্য সিমলায় এক সম্মেলন ডাকিলেন। তাহাও বিফল হইল।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হইল। ব্রিটিশজাতি জয়লাভ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। ভারতবাসীদের সহিত মিটমাট না করিলে সমূহ বিপদ হইবে বুঝিয়া কেবিনেট পুনরায় তিনজন সদস্যের এক ডেলিগেশন প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা পাকিস্তানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন বটে, কিন্তু মুসলিম লীগের মূল দাবি মানিয়া লইলেন। কেননা উহাতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এক শাখায় এবং বাংলা ও আসাম একত্র করিয়া অন্য এক শাখায় স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। Constituent Assembly-র নির্বাচন হইয়া গেল; মুসলিম লীগ ঐ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ঘোষণা করিলেন যে Constituent Assemblyতে যদি ভারতীয়দের মধ্যে কোন বিশেষ এক অংশ সংবিধান প্রণয়নে অংশ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের উপর জোর করিয়া ঐ সংবিধান চাপানো হইবে না। ইহার তিনদিন পরে যখন Constituent Assembly-র প্রথম অধিবেশন বসিল তখন দেখা গেল যে মুসলিম লীগের সদস্যেরা অনুপস্থিত রহিলেন। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়াই সভার কাজ চলিতে লাগিল।

কেবিনেট মিশন

লর্ড ওয়াভেলের স্থলে ব্রিটিশ সরকার লর্ড মাউণ্টব্যাটনকে বড়লাট করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল যে যতশীঘ্র সম্ভব ভারতবাসীদের হাতে ভারতের শাসন-ভার তুলিয়া দিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারত হইতে চলিয়া আসুন। লর্ড

দ্বিধা বিভক্ত ভারত

মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে পাঞ্জাব ও বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাতে মুসলিম লীগ তাঁহাদের পাকিস্তান লাভ করিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে Indian Independence Act পাস করিলেন। ইহাতে স্থির হইল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট হইতে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান নামে দুইটি ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহাতে ভারতীয় রাজন্যবর্গ যোগ দিতে পারিবেন। উভয় ডোমিনিয়ন নিজ নিজ সংবিধান প্রণয়ন করিবেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ভারতবর্ষ নিজেকে সাধারণতন্ত্রভুক্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

ভারতের Constituent Assembly প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া সংবিধান রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারা ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর হইতে ঐ কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তিন শতাধিক সদস্য স্বাধীন ভারতের Constituent Assembly-রূপে বসিলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহারা সংবিধানের একটি খসড়া প্রকাশ করিলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ঐ সভার যে অধিবেশন বসিল তাহাতে খসড়ার প্রত্যেকটি ধারা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে সংবিধানের আলোচনা (Second reading) শেষ হইল। ঐ সালের ১৪ই নভেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ২৬শে নবেম্বর পর্যন্ত উহার তৃতীয়বার পাঠ সমাপ্ত হইল। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বি. আর. আম্বেদকার, আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কে. এম. মুন্সি, টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, বি. এন. রাউ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে আমাদের সংবিধানের জনক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। Constituent Assembly-র ১১টি অধিবেশনে ১৬৫ দিন ধরিয়া সভা হইয়াছিল। খসড়া প্রস্তাবের ৭৬৩৫টি সংশোধনী প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৪৭৩টি প্রস্তাব উত্থাপিত ও আলোচিত হয়। আমেরিকার সংবিধান তৈয়ারি করিতে চার মাস লাগিয়াছিল, অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান নয় বৎসরে এবং কানাডার সংবিধান দুই বৎসর পাঁচ মাসে তৈয়ারি হইয়াছিল।

পাকিস্তানের সংবিধান পনোর বছরেও তৈয়ারি হইয়াছে বলা যায় না। সে তুলনায় আমাদের সংবিধান তৈয়ারি করিতে খুব বেশি সময় লাগে নাই। তিন বছর ধরিয়া সংবিধান তৈয়ারি করিতে আমাদের চৌষট্টি লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল।

ভারতীয় রাজন্যবর্গ-শাসিত ভারতের যোগদানের ইতিকথাঃ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বাটলার কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে ভারতে সর্বসাকুল্যে ৫৬২টি ভারতীয় রাজ্য (Indian States) ছিল। ভারতবর্ষের শতকরা চল্লিশ ভাগ জমি এবং ২৫ ভাগ লোক ঐ সব রাজ্যের রাজাদের অধীনে ছিল। রাজন্যবর্গের মধ্যে ৩২৭ জন নিতান্ত ক্ষুদ্র জনপদের নরপতি ছিলেন; তাঁহাদের সমবেত প্রজার সংখ্যা ছিল মাত্র আটলক্ষ। বাকী ২৩৫ জন রাজাদের মধ্যে ১০৯ জন স্বাধিকারবলে Chamber of Princesয়ের সদস্য ছিলেন এবং ১২৬ জন ঐ সভায় ১২ জনকে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে পারিতেন।

ভারতীয় রাজন্যগণের অবস্থা

হায়দারাবাদের নিজামের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় নয় কোটি টাকা; মহীশূরে মহারাজার প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা, বরোদার ২ কোটি ষাট লক্ষ টাকা, ত্রিবাঙ্কুরের ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা, গোয়ালিয়রের ২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা, কাশ্মীরের ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং পাতিয়ালা, যোধপুর, বিকানীর এবং ইন্দোরের মহারাজাদের প্রত্যেকের এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা করিয়া আয় ছিল। মহীশূর, বরোদা এবং ত্রিবাঙ্কুরের শাসকগণ প্রজাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অনেক ক্ষমতা দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য শাসকদের মধ্যে অনেকেই দুর্দান্ত স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহাদের প্রতাপে প্রজারা থরহরি কাঁপিতেন। প্রজাদের ধনপ্রাণ, মানমর্যাদা সব কিছু শাসকদের মর্জির উপর নির্ভর করিত। ওয়েলেসলির অবলম্বিত subsidiary alliance নীতি অনুসারে রাজাদের খরচে যে ব্রিটিশ সৈন্য রাখা হইত তাহাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতেন ব্রিটিশ সরকার। 'যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' নীতি অনুসারে ঐ সৈন্যদের সাহায্যে রাজাকে এবং তাঁহার প্রজাদিগকে দমন করিয়া বশে রাখা হইত। ভারতের ব্রিটিশ সরকার রাজাদিগকে বিদেশী আক্রমণ ও প্রজাদের বিপ্লবের হাত হইতে বাঁচাইবার ভার লইয়াছিলেন। সাধারণতঃ রাজারা বিপ্লবের ভয়ে সুশাসন করিতে

বাধ্য হন। ইঁহাদের সে ভয় ছিল না—কাজেই ইঁহারা মনের আনন্দে বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিবার একমাত্র প্রভু ছিলেন ভারত সরকার এবং তাঁহাদের প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট সাহেব। কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ রাজাদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রেসিডেণ্টকে বিষ প্রয়োগ করিবার অপরাধে বরোদার গাইকোবারকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। আলোয়ার, ঝাবুয়া, টঙ্ক, ইন্দোর প্রভৃতি রাজ্যের নরপতির উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

ব্রিটিশ ভারতে গণতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবর্গ নিজেদের অবস্থার কথা ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতে লাগিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যখন সাইমন কমিসন নিযুক্ত করিয়া ভারতের শাসনব্যবস্থার আরও পরিবর্তন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার কথা উঠিল তখন রাজন্যগণ দাবি করিলেন যে তাঁহাদের স্বার্থ ও সুবিধা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিয়া যেন ব্রিটিশ ভারতের প্রজাদিগকে আর কোন অধিকার না দেওয়া হয়। সেইজন্য বাটলার কমিটি স্থাপিত হইল। এদিকে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন ঘোষণা করিলেন যে রাজন্যবর্গ যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেন তাহা হইলে তাঁহাদের সকল প্রকার অধিকার ও সুবিধা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে। রাজারা এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না।

নেহেরু কমিটির সিদ্ধান্ত

লণ্ডনে যে গোল টেবিল সম্মেলন বসিল, তাহার প্রথম অধিবেশনে নয়জন ভারতীয় রাজন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনে সম্মত হইলেন। তাঁহাদের অবশ্য ধারণা ছিল যে তাঁহারা নিজেদের রাজ্যে তো কর্তৃত্ব করিবেনই, উপরন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও সর্দারি করিবেন। কংগ্রেসের নেতারা বলিতে লাগিলেন যে গণতন্ত্রশাসিত ব্রিটিশ ভারতের সহিত স্বেচ্ছাচারতন্ত্রমূলক রাজ্যসমূহের অংশিদারী করা অসম্ভব। রাজারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ব্রিটিশ প্রভুরা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু তাঁহারা যখন কিছুই করিলেন না, তখন হায়দারাবাদের নিজাম ও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে থাকিয়া স্বাধীন হইবার জন্য

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দূরদর্শিতা

পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দৃঢ়হস্তে তাঁহাদিগকে দমন করিলেন। অসাধারণ দূরদর্শিতার সহিত তিনি ভারতীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় প্রদেশসমূহের সহিত যোগ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে Constituent Assemblyতে বরোদা, বিকানীর, ভবনগর, কোচিন, গোয়ালিয়র, জয়পুর, যোধপুর, পাতিয়ালা, রেওয়া এবং উদয়পুরের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়াছিলেন। রাজন্যবর্গের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৯৩। কিন্তু কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও ভূপাল শেষ পর্যন্ত যোগ দিবেন কিনা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ভারতীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে ব্যবস্থা

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় ভারতীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে চার প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। প্রথমতঃ কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনকে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন রাজ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল। দ্বিতীয়তঃ ২১৭টি রাজ্য লইয়া সৌরাষ্ট্র, ৪টি রাজ্য লইয়া মৎস্য, ১০টি রাজ্য লইয়া রাজস্থান, ৩৫টি রাজ্য লইয়া বিন্ধ্যপ্রদেশ, ২০টি রাজ্য লইয়া মধ্য ভারত এবং ৮টি রাজ্য লইয়া পেপসু প্রদেশ গঠন করা হইল। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে মৎস্যকে রাজস্থানের সহিত এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই কোচিনকে ত্রিবাঙ্কুরের সহিত যুক্ত করা হয়। তৃতীয়তঃ ২১টি রাজ্য লইয়া হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়। কিন্তু উহাকে এবং ভূপাল, বিলাসপুর, কুচবিহার, মণিপুর, এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিবার অধিকার দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ ২৩টি রাজ্যকে উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত, ১৫টি রাজ্যকে মধ্যপ্রদেশের সহিত, ২টি রাজ্যকে বিহারের সহিত, ৩টিকে পূর্ব পাঞ্জাবের সহিত এবং ১৭৪টিকে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইল। রাজন্যবর্গের প্রত্যেককে উপযুক্ত পরিমাণ ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। এতবড় সুদূরব্যাপী পরিবর্তন পৃথিবীর অন্য কোথাও বিনা রক্তপাতে সাধিত হয় নাই।

রাজ্য গঠনের ইতিহাস : অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় দেখা যায় যে পূর্বে স্বাধীন অথবা স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন কয়েকটি রাষ্ট্র কতকগুলি বিষয়ে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বর্জন করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু ভারতব—

বেলায় সেরূপ হয় নাই ও হইতে পারিত না। ভারতের সকল প্রদেশই ব্রিটিশ শাসকগণের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে গঠিত হইয়াছিল। ভারতীয় রাজন্যবর্গশাসিত রাজ্যগুলিও ব্রিটিশের পদানত হইয়াছিল। রাজ্য ও প্রদেশসমূহ ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরাবলে সৃষ্ট বলিয়া উহাদের গঠনের মধ্যে কোন নীতি আবিষ্কার করা দুরূহ। এক এক প্রদেশের মধ্যে একাধিক ভাষা ও বহু প্রকার সংস্কৃতি বর্তমান ছিল।

অংশীভূত রাজ্যগুলির কোনদিনই স্বাতন্ত্র্য ছিল না

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে প্রদেশগুলির মধ্যে ভাষা ও জাতি (race) গত ভিত্তিতে উপপ্রদেশ স্থাপনের কথা বিবেচনা করিয়া অগ্রাহ্য করা হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সর্বদলীয় সম্মেলনে নেহেরু কমিটি সিদ্ধান্ত করেন যে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত হওয়া উচিত। ইহার পর কংগ্রেস অনুরূপ প্রস্তাব প্রায় প্রতি বৎসরই পাস করিতেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে Indian Statutory Commission উহা আংশিকভাবে সমর্থন করেন এবং ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে Joint Committee ঐ নীতি অনুসরণ করিয়া সিন্ধুপ্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেন। কিন্তু আমাদের সংবিধান যখন প্রণয়ন করা হয় তখন কংগ্রেস স্থির করেন যে দেশের নিরাপত্তা ও ঐক্যবন্ধন বজায় রাখা সবচেয়ে বেশি দরকার। ঐ সময়ে পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ায় যে সংকট দেখা দিয়াছিল তাহাতে সকলেই জাতীয় সংহতিরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে লাগিলেন। কাজেই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কথা তখন মুলতুবি রাখা হইল।

ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য

মূল সংবিধানে স্থির হইল যে যুক্তরাষ্ট্রে চার শ্রেণীর রাজ্য থাকিবে। 'ক' শ্রেণীতে আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ এই নয়টি রাজ্য থাকিবে। 'খ' শ্রেণীতে ভারতীয় রাজন্যগণ শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যভারত, মহীশূর, পেপসু (অর্থাৎ পাতিয়ালা ও পূর্বপাঞ্জাব রাজ্য খণ্ড) রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন এই আটটি রাজ্য থাকিবে। 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য এই থাকিল যে 'খ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন। দ্বিতীয়তঃ 'ক' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যে রাজ্যপাল (গবর্ণর)

চার শ্রেণীর রাজ্য

থাকিবেন আর খ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যে একজন দেশীয় নৃপতি রাজপ্রমুখ নিযুক্ত হইবেন। কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যকে কোন প্রদেশ বা রাজ্যের সহিত যুক্ত না করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে রাখা হইল। এইভাবে আজমীঢ়, ভুপাল, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং বিন্ধ্যপ্রদেশ এই নয়টিকে 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য বলা হইল। 'ঘ' শ্রেণীতে কেবলমাত্র আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ রহিল।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তেলেগু ভাষাভাষীরা নিজেদের স্বতন্ত্র এক প্রদেশ স্থাপনের জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাহার ফলে ভারত সরকার ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে মাদ্রাজের তেলেগু ভাষা-ভাষী অঞ্চল লইয়া অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করিলেন। যে-সব স্থানে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠিত হয় নাই সেইসব জায়গায় এইবার স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবি জোরালো হইল। তাই ভারত সরকারকে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য এক কমিসন নিযুক্ত করিতে হইল। বিচারপতি ফজল আলি, শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং কে. এম. পানিক্কর উহার সদস্য হইলেন। দেড় বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া ঐ কমিসন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিলেন। কমিসন সুপারিশ করেন যে রাজ্যগুলির মধ্যে শ্রেণীভেদ উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং অন্ধ্র, আসাম, বিহার বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরালা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিদর্ভ এবং পশ্চিমবঙ্গ এই ষোলটি রাজ্য গঠিত হউক। দিল্লী, মণিপুর, এবং আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকুক। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে কমিসন বোম্বাইকে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার সুপারিশ করেন নাই। ভারত সরকার কমিসনের অধিকাংশ সুপারিশ মানিয়া লইলেও বিদর্ভ ও কর্ণাটক রাজ্য স্থাপনে সম্মত হইলেন না এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। মারাঠি ভাষা-ভাষী অংশ বোম্বাইয়ের সহিত, কনাড়া ভাষাভাষী মহীশূরের সহিত এবং তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল অন্ধ্রের সহিত যুক্ত হইল। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর হইতে যে রাজ্য পুনর্গঠন করা হইল তাহাতে আজমীঢ়কে রাজস্থানের

রাজ্য-সংগঠন নীতি

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য সংগঠনের সিদ্ধান্ত

সহিত ও কুর্গকে মহীশূরের সহিত সংযুক্ত করা হইল। মধ্যপ্রদেশের বিদর্ভ অংশ এবং সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছকে বোম্বাইয়ের সহিত যোগ করায় বোম্বাই সর্ববৃহৎ রাজ্যে পরিণত হইল। মান্দ্রাজের অন্তর্ভুক্ত মালাবার জেলার অধিকাংশ ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের সহিত যুক্ত করিয়া উহার নাম দেওয়া হইল কেরল। ভুপাল, মধ্যভারত ও বিন্ধ্যপ্রদেশকে মধ্যপ্রদেশের সহিত যোগ করা হইল। পেপসু রাজ্য পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হইল। বিহারের অন্তর্গত মানভুম ও পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের সহিত যোগ করা হইল। কুচবিহার রাজ্যও পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ছিল ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল, রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হইল ৩৪,৯৪৫ বর্গমাইল। কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে নিম্নলিখিত ছয়টি স্থান রাখা হইল—(১) দিল্লী (২) হিমাচল প্রদেশ (৩ মণিপুর (৪) ত্রিপুরা (৫) আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ (৬) লাক্কাডিভ, মিনিকয় ও আমিন্দিবি দ্বীপপুঞ্জ। শেষোক্ত স্থানগুলির বর্গফল মাত্র দশ মাইল ও জনসংখ্যা একুশ হাজার মাত্র ছিল। সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর দ্বারা উল্লিখিত পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়। কিন্তু গুজরাতি ও মারাঠি ভাষীরা নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্য না পাইয়া ঘোরতর আন্দোলন সুরু করিলেন। পণ্ডিত নেহেরুর বিরুদ্ধে অসন্তোষ জ্ঞাপনের জন্য অর্থমন্ত্রী ডাঃ চিন্তামণ দেশমুখ পদত্যাগ করিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বোম্বাই রাজ্যকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত এই দুই রাজ্যে বিভক্ত করা হইল। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর দ্বারা নাগাল্যাণ্ড স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। আসামের গবর্ণর নাগাল্যাণ্ডের গবর্ণর হইবেন এবং নাগারা আসাম হাইকোর্ট ব্যবহার করিবেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর দ্বারা পণ্ডিচেরীকে এবং গোয়া, দমন, দিউকে কেন্দ্রের অধীন দুইটি স্বতন্ত্র অঞ্চল (Territory) স্বীকার করা হইয়াছে। এই দুইটি অঞ্চলে এবং হিমালয় প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরাতে নিজস্ব আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে দিল্লীর আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ ছিল; এখন কেন্দ্রশাসিত অন্যান্য প্রধান অঞ্চলে আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ স্থাপিত হইলেও দিল্লীকে

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত পরিবর্তন

ঐ অধিকার দেওয়া হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন কলম্বিয়া জেলায় অবস্থিত, কিন্তু কলম্বিয়ার কোন স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার উহা শাসন করেন।

রাজ্যের নাম ও বিবরণ

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য ও অঞ্চলসমূহ: বর্তমানে নিম্নলিখিত ১৬টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে। উহাদের প্রত্যেকের জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে লোকের সংখ্যা, এবং ১৯৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে

রাজ্যের নাম	জনসংখ্যা (লক্ষ)	মাইল প্রতি লোকসংখ্যা	বার্ষিক খরচ লক্ষ টাকা
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩,৫৯	৩৩৯	১১৩,৩৪
আসাম	১,১৮	২৫২	৪২,৯০
বিহার	৪,৬৪	৬৯১	৮৮,২৪
গুজরাত	২,০৬	২৮৬	৬৯,৫৭
কেরল	১,৬৮	১১২৫	৬৭,৫৭
মধ্যপ্রদেশ	৩,২৩	১৮৯	৮৩,১৩
মাদ্রাজ	৩,৩৬	৬৭১	৯৯,৬৬
মহারাষ্ট্র	৩,৯৫	৩৩২	১৩৪,৪৪
মহীশূর	২,৩৫	৩১৮	১০২,৯৩
নাগাল্যাণ্ড	৩·৬	×	৪,২২
উড়িষ্যা	১,৭৫	২৯২	৫৬,২২
পাঞ্জাব	২,০২	৪৩১	৮৭,১৫
রাজস্থান	১,০১	১৫২	৬১,৫২
উত্তরপ্রদেশ	৭,৩৭	৬৫০	১৮৮,১০
পশ্চিমবঙ্গ	৩,৪৯	১০৩০	১১১,২২
ও কাশ্মীর	৩৬		×
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল:			
দিল্লী	১৬	×	১৬,০৬
হিমাচল প্রদেশ	১৩	×	১১,৫৩
মণিপুর	৭	×	৪,৬৮
ত্রিপুরা	১১	×	৭,৩৩
পণ্ডিচেরি	৩·৬	×	৪,৪৫
গোয়া, দমন, দিউ	×	×	×

রাজ্যের নাম	জনসংখ্যা (লক্ষ)	মাইল প্রতি লোকসংখ্যা	বার্ষিক খরচ লক্ষ টাকা
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	·৬	×	৩,১০
লাক্কাডিভ, মিনিকয় ও আমিনদিবি দ্বীপপুঞ্জ	·২	×	×

আয়তন হিসাবে সবচেয়ে বড় রাজ্য হইতেছে মধ্যপ্রদেশ (১,৭১,২১০ বর্গমাইল) ও সবচেয়ে ছোট রাজ্য কেরল (১৫০০৫ বর্গমাইল)।

রাজ্যগুলির তুলনামূলক বিচার

জনসংখ্যার দিক দিয়া সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তর প্রদেশ। কিন্তু কম জায়গায় বেশি লোককে ঘেঁষাঘেঁসি করিয়া করিয়া বাস করিতে হয় কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে। কেরলে প্রতি বর্গ মাইলে ১১২৫ জন ও পশ্চিমবঙ্গে ১০৩১ জন লোক বাস করেন। বার্ষিক মোট আয়ের দিক হইতে বিচার করিলে উত্তর প্রদেশের স্থান সর্বোচ্চ, কিন্তু মহারাষ্ট্রেরই জনসংখ্যার অনুপাতে রাজস্ব বেশি।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য রাজ্যগুলি গঠিত হইয়াছে। কোন রাজ্যই পূর্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এরূপ দাবি করিতে পারে না। সেইজন্য সংবিধানে

নূতন রাজ্য গঠনের বিধি

ভারতীয় পার্লামেণ্টকে কোন রাজ্য হইতে কিছু অঞ্চল লইয়া কিংবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের অংশ লইয়া নূতন রাজ্য সংগঠনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পার্লামেণ্ট আইন করিয়া জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া যে কোন রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারেন এবং উহার সীমানা ও নাম পরিবর্তন করিতে পারেন। পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন তৈয়ারির বিধি অনুসারে কেবলমাত্র অধিকাংশ সদস্যের মত লইয়া এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া অর্থাৎ সরকারী প্রস্তাব ছাড়া এরূপ আইন পেশ করা যায় না। তিনি সুপারিশ করিবার পূর্বে যে রাজ্যের সীমানার হ্রাস বৃদ্ধি বা পরিবর্তন করা হইবে সেই রাজ্যের আইনসভার মতামত লইবেন। কোন নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই আইনসভা মত প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের অমত থাকিলেও রাষ্ট্রপতি আইন সুপারিস করিতে পারেন। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে যে অনেকটা এককেন্দ্রিক তাহা এই ব্যবস্থা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের স্বরূপ বিচার

আমাদের সংবিধানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যঃ একশত নব্বই বৎসর পরে ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ভারতের নেতৃবৃন্দ যখন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে খুব কম লোকের মনেই নিখিল ভারতীয় ঐক্যের কথা স্থান পাইয়াছে। তাঁহারা বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন জাতির (tribe) মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষ সুবিধা দিয়া উন্নয়ন করিবার জন্য সংবিধানের মধ্যেই নানারূপ ব্যবস্থা করিলেন। তাই আমাদের সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সংবিধান হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে মাত্র সাতটি ধারা (articles), ২৪টি উপধারা এবং সাত হাজার আন্দাজ শব্দ আছে; আর আমাদের সংবিধান ছিল ৩৯৫টি ধারা ৮টি তপশিল (schedule) এবং ইহা মুদ্রিত করিতে ২৫০ পৃষ্ঠা লাগিয়াছিল। এখন চৌদ্দ বার সংশোধনের পর ভারতীয় সংবিধানে ৩৮০টি ধারা ও ৯টি তপশিল হইয়াছে। সাধারণতঃ সংবিধানে কেবলমাত্র শাসন বিষয়ক মূল ব্যবস্থাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা নানা অছিলায় এত বেশি নির্যাতিত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা সরকারের ক্ষমতাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অনেক খুঁটিনাটি নিয়মকানুনও সংবিধানে স্থান দিয়াছেন। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকেরা কত বেতন পাইবেন, কত বয়সে অবসর লইবেন, অবসর গ্রহণের পর কি ধরনের কাজ করিতে পারিবেন বা না পারিবেন এসব কথা সংবিধানে লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের জন্য যে শাসনবিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে এই ধরনের অনেক ছোটখাট বিষয়ের উল্লেখ ছিল বলিয়া স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও উহার অনুসরণ করা হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকেরা চাহিয়াছিলেন যে ভারতবাসীকে কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়া আসল কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রাখিতে; তাই

বৃহত্তম সংবিধান

তাঁহাদিগকে প্রাশাসনিক ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করিতে হইয়াছিল। স্বাধীন ভারত যখন সংবিধান রচনায় প্রবৃত্ত হইল তখন ঐরূপ করিবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র আমাদের সামনে সংবিধানের এক ভ্রান্ত আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিল। তাছাড়া সংবিধানের মাধ্যমে প্রচারমূলক কার্য চালাইবার ইচ্ছাও অনেকের মনে জাগিয়াছিল। তাই ৩৫১ ধারায় বলা হইয়াছে যে ইউনিয়ন সরকার হিন্দীভাষা প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

পৌরাণিক কাহিনীতে আছে যে বিধাতা বিভিন্ন সুন্দর বস্তু হইতে তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য আহরণ করিয়া তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমাদের সংবিধানের রচয়িতারাও তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন সংবিধানের ভালো ভালো অংশগুলি গ্রহণ করিয়া এক আদর্শ শাসনপদ্ধতি সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এককেন্দ্রিক শাসনতন্ত্রের পটভূমিকায় সংঘাত্মক

বিভিন্ন সংবিধানের নিকট ঋণ

(Federal) সংগঠন উদ্ভাবনা করিবার প্রয়োজনে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকা অ্যাক্ট (কানাডার শাসনতন্ত্র) হইতে 'ইউনিয়ন' শব্দটি গ্রহণ করা হইয়াছে। পুরাপুরি সংঘীয় তন্ত্র গ্রহণ করিলে কেন্দ্রের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হইবে আশঙ্কায় ভারতকে Union of States বলা হইয়াছে। আমেরিকার আঙ্গিক রাজ্যগুলি ও অস্ট্রেলিয়ার প্রদেশগুলি নিজ নিজ সংবিধান পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু ভারতের আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে সে স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। কানাডার মতন ভারতবর্ষেরও প্রদেশগুলিকে আঙ্গিক রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে এবং সংবিধানে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই সেগুলি কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আয়ারের সংবিধান হইতে রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) ঘোষণার রীতি গৃহীত হইয়াছে। কতকগুলি অধিকার আদালতের দ্বারা সুরক্ষিত হইবে (Justiciable) এবং কতকগুলি অধিকার কেবলমাত্র আদর্শ হিসাবে পরিগৃহীত হইবে এ ব্যবস্থাও আয়ারের শাসনতন্ত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং সংযুক্ত জাতিপুঞ্জের মৌলিক অধিকার ঘোষণার প্রভাবে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অধ্যায় রচিত হইয়াছে। আমেরিকার সংবিধান

হইতে সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধানের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকর্তা করা হইয়াছে। কিন্তু মূলতঃ ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির প্রভাবেই আমাদের দেশে সংসদীয় শাসন (Parliamentary government) প্রবর্তিত হইয়াছে। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ যুক্তভাবে সংসদের নিকট দায়ী এবং সংসদ আইনকানুন তৈয়ারি, টাকা পয়সা মঞ্জুর ও শাসন ব্যাপারের সমালোচনা করিবার অধিকারী এই মৌলিক নীতি ব্রিটেনের সংবিধান হইতে লওয়া হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের ১০৫ ধারাতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে ভারতীয় সংসদের সভ্যদের previlege বা বিশেষ অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্যদের অনুরূপ হইবে। এক দেশের সংবিধানে অন্য দেশের সংবিধানের এইরূপ উল্লেখ অন্য কোথাও দেখা যায় না। ব্রিটেনের পার্লামেন্টের যে পরিমাণ সার্বভৌমিকতা আছে ভারতীয় সংসদের সে পরিমাণ নাই। কেননা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে কোন প্রকাশ আইন পাস করিলে আদালতসমূহ উহা মানিতে বাধ্য। কিন্তু ভারতীয় সংসদের আইন সংবিধান অনুসারে রচিত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার ভার সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত আছে। ভারতবর্ষে আমেরিকার ন্যায় judicial review প্রথা প্রচলিত আছে। বিভিন্ন দেশের সংবিধান হইতে কিছু কিছু অংশ লওয়া হইলেও আমাদের সংবিধান-রচয়িতাগণ ভারতের ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র হইতে সবচেয়ে বেশি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বহু স্থলে ঐ শাসনতন্ত্রের ভাব এবং ভাষাও অবিকল গৃহীত হইয়াছে। কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রীয় শাসনের হাতে, কতকগুলি রাজ্যসরকারের হাতে এবং কতকগুলি উভয় সরকারের হাতে দিবার অভিনব পদ্ধতি ঐ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনতন্ত্রের প্রভাবে স্থান পাইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে কতকগুলি বিষয়কে কেন্দ্র ও আঙ্গিক রাজ্য এই উভয় এলাকাভুক্ত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির সংকটকালীন ক্ষমতাও (Emergency powers of the President) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ বা অনুরূপ কোন বিপদ ঘটিবার পূর্বেই বিপদের আশঙ্কা দেখা দিবামাত্র মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। ঐ সময়ে সংঘাত্মক শাসন এককেন্দ্রিক শাসনে পরিণত হইতে পারে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা

ভারতের সংবিধানের আকার এত বড় এবং বিভিন্ন সংবিধান হইতে

এত জিনিস ধার করা হইলেও শাসনসংক্রান্ত সকল কথা ইহাতে বলা হয় নাই। কোন সংবিধানেই সকল কথা বলা সম্ভব নহে। ব্রিটিশ সংবিধানের কতকগুলি প্রথাগত বিধি (conventions) ভারতবর্ষেও মানিয়া চলা হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির বহুবিধ ক্ষমতা বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে তিনি মন্ত্রি-পরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ লইবেন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ্ যে পরামর্শ দিবেন তাহাই তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইবে এরূপ কোন নির্দেশ সংবিধানে স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। এখানে ইংলণ্ডের প্রথাগত বিধির উপর নির্ভর করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি যদি মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া কোন কাজ করেন, তাহা হইলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহারা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সুতরাং রাষ্ট্রপতির পক্ষে অন্য মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া কাজ চালানো সম্ভব নহে। কেননা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদল তাঁহাদের সকল প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়া এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারেন। সেইজন্য রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ মন্ত্রীদের পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করেন না। রাজনৈতিক দলের কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হয় নাই, উহা প্রথাগত বিধির উপর নির্ভর করে।

প্রথাগত বিধির স্থান

আমাদের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হইয়াছে (secular state)। ব্রিটেনের সরকার প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টীয় ধর্ম এবং পাকিস্তানের সরকার ইসলাম ধর্ম সমর্থন করেন এবং সেই জন্য সরকারী অর্থ খরচ করেন। কিন্তু ভারতের সরকার কোন ধর্মের পোষণ ও প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করেন না। সরকারী বিদ্যালয় প্রভৃতিতে এবং সরকার হইতে সাহায্য-প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন বিশেষ ধর্মমত শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি ও সম্প্রদায় নিজ নিজ রুচি ও ঐতিহ্য অনুসারে যে কোন ধর্ম যজনযাজন করিতে পারেন; তাহাতে সরকার হইতে কোন বাধা দেওয়া হয় না; যদি অপর কেহ বাধা দিতে আসেন, সরকার তাহাকে নিবারণ করেন। যদিও ভারতবর্ষে শতকরা ৮৬ ভাগ লোক হিন্দু তথাপি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মনে আস্থা উৎপাদনের জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র

ধর্ম ছাড়া বর্ণ (castes) ও জনজাতি (tribes) এবং ভাষার ভিত্তিতে গঠিত বা কল্পিত সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা সংবিধানে করা হইয়াছে। সংখ্যালঘুদের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা অন্য কোন সংবিধানে নাই। সোভিয়েট রাশিয়াতে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি প্রভৃতির ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাকার সংবিধানে সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুবিধাদানের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ভারতের তপশিলী বর্ণ ও জনজাতিদের জন্য সরকারী চাকুরির একটা মোটা অংশ সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। সাধারণ প্রার্থীদের অপেক্ষা কিছু কম যোগ্যতা, বেশি বয়স প্রভৃতি সত্ত্বেও তাঁহারা ঐসব চাকুরি পান। সংসদে ও রাজ্যগুলির আইনসভায় ঐসব সংখ্যালঘুদের জন্য যথাক্রমে ৭৬টি ও ৪৭০টি আসন সংরক্ষিত। সংবিধানে প্রথমে মাত্র দশ বৎসরের জন্য এই সব সুবিধা দিবার কথা ছিল; কিন্তু ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সংবিধান সংশোধন করিয়া উহার মেয়াদ বিশ বৎসর করা হইয়াছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারেও ইঁহাদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে লোকসভায় ও কোন কোন রাজ্যের আইনসভায় মনোনীত করিবার ব্যবস্থাও সংবিধানে করা হইয়াছে। এই সব ব্যবস্থার উল্লেখ করিতে যাইয়া সংবিধান বিশালকায় হইয়াছে।

সংখ্যালঘুদের স্বার্থ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা

ভারতীয় সংবিধানে প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতিকে জাতির মুখপাত্ররূপে উপস্থিত করিলেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আমাদের শাসনপ্রণালী প্রেসিডেণ্ট শাসিত নহে। আমাদের সংবিধানে সংসদীয় শাসনপদ্ধতি (Parliamentary government) অবলম্বিত হইয়াছে। তবে সংসদ শাসনবিভাগের নেতৃস্বরূপ মন্ত্রীদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হন। শাসনবিভাগ অর্ডিনান্স জারি করিয়া আইন তৈয়ারি করিতে পারেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে কুম্ভমেলার যাত্রীদের উপর Terminal tax বসানো হইয়াছিল।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থা

আমাদের সংবিধানের সংশোধন প্রণালীও বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথমতঃ নূতন রাজ্য সৃষ্টি করা বা পুরাতন রাজ্যকে ভাঙিয়া গড়ার ব্যাপারে এবং

রাজ্যের আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ স্থাপন বা বিলোপ করার বিষয়ে সংসদ সাধারণ আইন পাস করিবার পদ্ধতিতে উহা বিধিবদ্ধ করিতে পারেন। ঐরূপ আইন প্রকৃত পক্ষে সংবিধানের সংশোধনমূলক হইলেও উহাকে সংবিধানে সংশোধন সম্পর্কিত বলিয়া বিবেচনা করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ সংবিধানের অধিকাংশ ধারাই সংসদের প্রত্যেক কক্ষের সমগ্র সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং সভায় বাস্তবিক পক্ষে উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা সত্যসত্যই ভোট দিতেছেন তাঁহাদের দুই তৃতীয়াংশের মত অনুসারে পরিবর্তিত হইতে পারে। প্রথম প্রকার অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকারের সংশোধনরীতি একটু বেশি অনমণীয় বা কঠিন (rigid)। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, কেন্দ্র ও আঙ্গিক রাজ্যের শাসনক্ষমতা, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের ক্ষমতাদি, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও আঙ্গিক রাজ্যের মধ্যে আইন করিবার ক্ষমতা বণ্টন এবং সংসদে বিভিন্ন আঙ্গিক রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব—এই পাঁচটি বিষয়ে কোন পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে প্রথমে সংসদের উভয় কক্ষের সংখ্যাধিক্য এবং উপস্থিত সভ্যদের দুই-তৃতীয়াংশের মত লইয়া উহা পাস হওয়া প্রয়োজন এবং পরে আঙ্গিক রাজ্যসমূহের মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেকগুলির আইনসভায় উহা গৃহীত (ratified) হওয়া দরকার। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে আঙ্গিক রাজ্যগুলির তিন-চতুর্থাংশের সম্মতির প্রয়োজন হয়। সুতরাং ঐ পাঁচটি বিষয়েও আমাদের সংশোধন প্রণালী আমেরিকার প্রণালী অপেক্ষা অনেক বেশি সুপবিবর্তনীয়। মোটের উপর বলা যায় যে ভারতের সংবিধান কিছুটা সুপরিবর্তনীয় (Flexible) এবং কিছুটা দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid)। তবে যতদিন কেন্দ্রে এবং আঙ্গিক রাজ্যসমূহে একই রাজনৈতিকদলের প্রাধান্য বজায় থাকিবে ততদিন অতি সহজেই সংবিধান সংশোধিত হইতে পারিবে।

সংবিধান কতকটা নমনীয় ও কতকটা দুষ্পরিবর্তনীয়

ভারতীয় সংবিধানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সংঘাত্মকরূপের মধ্যে এককেন্দ্রিকতার প্রভাব। এই বিষয়টি পরের অনুচ্ছেদে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Indian Federation): ভারতীয় সংবিধানের কোথাও সংঘ বা Federation

শব্দটি ব্যবহার করা হয় নাই। সব সময়েই কেন্দ্রের সহিত আঙ্গিক রাজ্যগুলির সম্বন্ধ ইউনিয়ন (Union) বা ঐক্যবদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তথাপি ঐ সম্বন্ধের মধ্যে সংঘাত্মক প্রণালীর কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন দেখা যায়। কতকগুলি বিষয়ে আইন তৈয়ারি করিবার এক্তিয়ার কেন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছে, কতকগুলি বিষয়ে আবার আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ কেন্দ্র যাহাতে আঙ্গিক রাজ্যের অধিকারে এবং রাজ্যগুলি যাহাতে কেন্দ্রের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে তাহা দেখিবার ভার সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংসদকে এবং রাষ্ট্রপতিকে আঙ্গিক রাজ্যের অধিকার লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। আঙ্গিক রাজ্যগুলি কেন্দ্রের তুলনায় নিতান্ত হীনপ্রভ মনে হয়। সেইজন্য অনেকে বলেন যে ভারতবর্ষে প্রকৃত সংঘশাসনবিধি প্রবর্তিত হয় নাই।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য কিছুটা বর্তমান

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত আদিম তেরটি রাজ্য অথবা সুইট্জারল্যাণ্ডের ক্যান্টনগুলি যেমন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিবার পূর্বে প্রায় স্বাধীন ছিল, ভারতের আঙ্গিক রাজ্যগুলি সেরূপ স্বাধীন ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের সময়ে একদিকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশগুলি যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশক্রমে পরিচালিত হইত, তেমনি অন্যদিকে মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যগুলিও ভারতের গবর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়ের পদানত ছিল। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সময় প্রদেশগুলির আইনসভার সম্মতি লওয়া হয় নাই। সুতরাং কোন আঙ্গিক রাজ্য দাবি করিতে পারে না যে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে সে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ছিল। নূতন স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই যে কি করিয়া ঐ স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। আঙ্গিক রাজ্যগুলির সার্বভৌমিকতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করিলে পাছে ভারতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার হানি ঘটে এই ভয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রভূত শক্তিশালী করার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমেরিকার সংবিধানে আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন (secede) হইবার ক্ষমতা

ভারতের আঙ্গিক রাজ্য কোন দিন সার্বভৌম ছিল না

আছে কিনা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার সংবিধানে ঐ অধিকার স্পষ্টত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে কোন আঙ্গিক রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না।

আঙ্গিক রাজ্যের সীমা ও নাম পরিবর্তন

আঙ্গিক রাজ্যগুলির সীমানার হ্রাসবৃদ্ধি ও নাম পরিবর্তন করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় সংসদকে দেওয়া হইয়াছে। ঐরূপ কোন আইন পেশ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট আঙ্গিক রাজ্যগুলির মত কি জানিয়া লইবেন, কিন্তু তাঁহাদের অমত থাকিলেও ঐ প্রকার আইন পাস করনো যাইতে পারে। মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদের অংশ লইয়া অন্ধ্ররাজ্য গঠনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আসাম হইতে বিচ্যুত করিয়া নাগাল্যাণ্ড গঠন পর্যন্ত বহুবার অনেকগুলি রাজ্য এইভাবে ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে। প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র থাকিলে এরূপ করা এত সহজ হইত না।

সংসদীয় দ্বিতীয় সদনে অসমান প্রতিনিধিত্ব

যুক্তরাষ্ট্রের সংসদের দ্বিতীয় সদনে প্রত্যেক আঙ্গিক রাজ্য হইতে সমান-সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া আসেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্কের মতন ধনজনে বৃহৎ রাজ্য সেনেটে দুইজন মাত্র প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারী, আবার আলাস্কার মতন ছোট রাজ্যও দুইজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ব বৃহৎ রাজ্য উত্তরপ্রদেশ রাজ্যসভায় ৩৪ জন এবং আসাম ৭ জন মাত্র প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী। কেবলমাত্র রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি লইয়াই রাজ্যসভা সংগঠিত হয় নাই। উহাতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১২ জন সদস্যও স্থান পাইয়াছেন। অথচ এই রাজ্যসভাকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহার ফলে সাময়িকভাবে রাজ্যসমূহের যে কোন বিষয়ে আইন তৈয়ারি করিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। রাজ্যসভা যদি দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতানুসারে কোন প্রস্তাব পাস করিয়া বলেন যে রাজ্যের এক্তিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতা জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য সংসদের (পার্লামেণ্টের) হাতে দেওয়া কর্তব্য তাহা হইলে প্রথমতঃ এক বৎসরের জন্য এবং পরে উহার মেয়াদ বাড়াইয়া পুনরায় আর এক বৎসরের জন্য উহা বলবৎ হইবে। সংবিধানে যে ক্ষমতা রাজ্যের

রাজ্যের আইনসভাকে দেওয়া হইয়াছে। তাহার উপর কেন্দ্রের আইনসভার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদের দ্বিতীয় সদনের এরূপ হস্তক্ষেপ অন্যত্র দেখা যায় না।

জনস্বাস্থ্য, কৃষি, বন, মৎস্যউৎপাদন প্রভৃতি বহু বিষয় আঙ্গিক রাজ্যগুলির এক্তিয়ারে রাখা হইয়াছে। কিন্তু দুইটি বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা যদি এমন প্রস্তাব পাস করে যে ঐরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে ইউনিয়নের সংসদ আইন করিলে ভাল হয় তাহা হইলে ঐ বিষয়ে সংসদ আইন করিতে পারিবেন (২৫২ ধারা)। এইভাবে কয়েকটি আঙ্গিক রাজ্যের আইনসভার অনুরোধে সংসদ যে বিষয়ে আইন করিবেন সে বিষয়ের উপর আর ঐসব রাজ্যের আইনসভার আইন করিবার অধিকার থাকিবে না। এই উপায়েও আঙ্গিক রাজ্যের অধিকার হ্রাস পাইতে পারে, তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই ক্ষেত্রে সংসদ নিজে হইতে কিছু করিতে অগ্রসর হন নাই। আঙ্গিক রাজ্যের অনুরোধে নূতন ক্ষমতা নিজের হাতে লইয়াছেন।

দুইটি রাজ্যের অনুরোধে কেন্দ্রের ক্ষমতা গ্রহণ

আর একটি ব্যাপারে সংসদ আঙ্গিক রাজ্যের অধিকারভুক্ত বিষয়ের উপর আইন করিতে পারেন। সেটি হইতেছে যে ভারত সরকার বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি বা চুক্তি করিলে উহার সর্ত পালন করিবার জন্য সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন কোন বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন (২৫৩ ধারা)। ঐসব বিষয়ে সংসদ যে আইন করিবেন তাহাই প্রতিপালিত হইবে; আঙ্গিক রাজ্যের আইন গ্রাহ্য হইবে না।

সন্ধি পালনের জন্য রাজ্য তালিকার বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন

যে সব বিষয়ে তিনটি তালিকার কোনটিতেই উল্লেখ করা হয় নাই সেই সব বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে থাকিবে বলিয়া সংবিধানে (২৪৮ ধারা) ঘোষণা করা হইয়াছে। এইভাবে কেন্দ্রের হাতে Residuary power বা অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত করায় আঙ্গিক রাজ্যের অধিকার অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। কানাডার শাসনতন্ত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

কেন্দ্রের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা

ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রণালী অপেক্ষা এককেন্দ্রীক শাসনপদ্ধতিকে যে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহার কয়েকটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ দ্বি-নাগরিকতা বর্তমান। একই ব্যক্তি কোন রাজ্যের নাগরিক এবং

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হন। ভারতের ঐক্য বস্তুতঃ সুদৃঢ় করিবার জন্য একমাত্র ভারতীয় নাগরিকতা স্বীকার করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কেহ পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতির নাগরিক বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিতে পারেন না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিনাগরিকতা বর্তমান আছে। দ্বিতীয়তঃ ঐসব রাষ্ট্রের রাজ্যগুলির নিজ নিজ স্বতন্ত্র বিচারালয় আছে, আবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র আদালত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সকল বিচারালয় সুপ্রিম কোর্টের অধীন ; সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত সকল আদালত মানিতে বাধ্য। হাইকোর্টগুলি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানিয়া চলেন। তৃতীয়ত : অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন ও কার্যবিধি আলাদা আলাদা রকমের ; কিন্তু ভারতবর্ষে উহা একই ধরনের। কেন্দ্র ও আঙ্গিক রাজ্যে উভয়েরই যৌথ এক্তিয়ার (concurrent jurisdiction) থাকায় উহা সম্ভবপর হইয়াছে। চতুর্থতঃ প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির নিজ নিজ কর্মচারী নিযুক্ত করিবার, দণ্ড দিবার ও বরখাস্ত করিবার অধিকার আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের আঙ্গিক রাজ্যগুলিতে প্রশাসনিক ও পুলিস বিভাগের উচ্চপদে (I. A. S., I. P. S.) যাঁহারা অধিষ্ঠিত তাঁহারা ইউনিয়নের পাবলিক সার্ভিস কমিসনের দ্বারা নিযুক্ত হন এবং উহার সম্মতি ছাড়া কাহাকেও কোনও প্রকার দণ্ড দেওয়া যায় না এবং পদচ্যুত করা চলে না। পঞ্চমতঃ নির্বাচন সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অধিকারও আঙ্গিক রাজ্যগুলির নাই। নিখিল ভারতীয় নির্বাচন কমিসন যে ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহাই প্রত্যেক রাজ্যকে মানিয়া লইতে হয়।

এক নাগরিকতা

এক আইন

উচ্চকর্মচারীরা কেন্দ্রের দ্বারা নিযুক্ত

প্রকৃত যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ গবর্ণর বা রাজ্যপাল নিযুক্ত করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতের কোন রাজ্যের সেরূপ অধিকার নাই। মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ লইয়া রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের গবর্ণর নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাদিগকে যে কোন সময়ে ঐ পদ হইতে অপসারিত করিতে পারেন। সেই জন্য গবর্ণর কেন্দ্রের অনুগত হইয়া চলেন এবং যে কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হন। রাজ্যের আইনসভা যে বিল পাস করিয়াছেন তাহাতে সম্মতি অথবা

রাজ্যপাল কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত

অসম্মতি কিছুই না জানাইয়া তিনি উহা রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে উহা নাকচ করিয়া দিতে পারেন। ইহার ফলে রাজ্যের অধিকার যে বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রধান প্রধান বিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে (৬৫টি বিষয়ে; ৬৬টি ছিল, কিন্তু ৩৬ সংখ্যক বিষয়টি বাদ দেওয়ায় ৬৫টি হইয়াছে) ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহার মধ্যে ৩০টি বিষয় এত গৌণ যে উহাদিগকে চৌকিদারি ক্ষমতা মাত্র বলা যায়। যেমন তীর্থযাত্রার, মৃতদেহ সংকারের, হাটবাজারের, সরাইয়ে'র, জুয়াখেলার, গুপ্তধনপ্রাপ্তি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণের অধিকার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ২২টি বিষয় করসংক্রান্ত। বাকী ১৩টি বিষয় রাজ্যের বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রাজ্যসরকারের নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য ছাড়া ঐসব কার্য সম্পাদন করা কঠিন। কেন্দ্রসরকার শুধু টাকাই জোগান না, সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশও দেন। সে নির্দেশ না মানিলে শুধু যে সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবে তাহা নহে, রাজ্যের আত্মকর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইবারও আশঙ্কা আছে। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ভার রাজ্যের উপর। কিন্তু পার্লামেণ্ট যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়গুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলে উহার উপর এক্তিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারে বর্তাইবে। উচ্চশিক্ষার, গবেষণার ও শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও তাহাদের শিক্ষার উচ্চ মান বজায় রাখিবার ব্যবস্থার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। ইহা ছাড়া শ্রমিকদিগকে শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উভয়েরই আছে। সংবিধানের এইসব ধারা ব্যবহার করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের স্বাধীনতাকে অনেকটা ব্যাহত করিতে পারেন। শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ কোন নীতি অবলম্বন না করিলে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হইবে না এই ভয় দেখাইয়াও শিক্ষা সম্বন্ধে রাজ্যের কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। এইভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহা জোর করিয়া রাজ্যগুলির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষমতা বণ্টন ও কেন্দ্রীয় নির্দেশ

উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দ তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জোর করিয়া নিজেদের মত মানিতে বাধ্য করেন। আর্থিক যোজনা সার্থক করিতে হইলে কেন্দ্র হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়; সেই সুযোগে কেন্দ্র রাজ্যের উপরে চাপ দিয়া থাকে।

রাজ্যের উপর কেন্দ্রের চাপ

সংবিধানে রাজ্যগুলিকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার উপরেও কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করিতেছে। উহার ফলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীত্ব হারাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে রাজ্যের মন্ত্রীরা তাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন যে সংবিধানকে উল্টাইয়া দিয়া এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিলেই চলে (Indian Nation ২০।২।৬২)। ইহার মধ্যে অনেকটা অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনিক ব্যাপারে (administrative matters) রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারেন। রাজ্যসরকার যদি ঐ নির্দেশ পালন না করেন তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে লইতে পারেন।

সংবিধানে রাজ্যগুলিকে যে ক্ষমতাই দেওয়া হউক না কেন কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে একই রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য সুদীর্ঘকাল থাকার জন্য সর্বত্র একই নীতি প্রবর্তন করিবার সুবিধা হইয়াছে। দলের নেতৃবৃন্দ যখন যেরূপ নীতি অবলম্বন করেন তখন আঙ্গিক রাজ্যগুলি তাহা অনুসরণ করিয়া থাকে।

সাধারণ অবস্থায় আঙ্গিক রাজ্যগুলির যতটুকু ক্ষমতা থাকে, রাষ্ট্রপতি

আপৎকালীন জরুরি অবস্থায় সংবিধান প্রায় এককেন্দ্রিক হয়

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিলে তাহাও হ্রাস পায়। রাজ্য-তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জরুরি অবস্থায় আইন করিতে পারেন। সে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোন আদেশ রাজ্যসরকার প্রতিপালন করিতে বাধ্য। সংবিধান অনুসারে কোন রাজ্যে কাজকর্ম চলিতেছে কিনা তাহা বিচার করিবার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করেন যে একটি কোন রাজ্যে সংবিধান অনুসারে কাজ চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইলে রাজ্য সরকারের হাত হইতে সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ছিনাইয়া লইতে পারেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে কার্য করেন।

এই সব নানাকারণে জেনিংস সাহেব বলেন যে ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্র হইলেও

ইহাতে এককেন্দ্রীয়তার প্রবণতা প্রবল (a federation with strong centralising tendency)। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কে, সি, হুইয়ার লিখিয়াছিলেন যে ভারতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া তাহার সহিত কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংযোজন করা হইয়াছে ("a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal State with subsidiary unitary features")। কিন্তু তাঁহার Federal Government নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এই মত পরিবর্তন করিয়া ভারতবর্ষকে আধা-যুক্তরাষ্ট্র (quasi federation) বলিয়াছেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের আঙ্গিক রাজ্যগুলি সংবিধানের নিকট হইতে তাহাদের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, কেন্দ্রের অনুগ্রহে নহে। যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রধান বৈশিষ্ট্য ভারতে বর্তমান।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এককেন্দ্রীয়তার ভাব প্রবল

ভারতীয় সংবিধানে এককেন্দ্রিক ভাব প্রবল বলিয়া আমাদের লজ্জা পাইবার কারণ নাই। নবলব্ধ স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমরা জানিয়া বুঝিয়া ঐরূপ সংবিধান তৈয়ারি করিয়াছি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্যও ক্ষমতাশালী কেন্দ্রের দরকার। প্রত্যেক জাতি নিজ প্রয়োজন অনুসারে সংবিধান প্রস্তুত করে। সকলকেই যে আমেরিকার অথবা সোভিয়েট রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুকরণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উহা প্রয়োজন

কোন দেশে কিরূপ শাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা কেবলমাত্র লিখিত সংবিধান অধ্যয়ন করিলেই জানা যায় না। ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর স্বরূপ জানিতে হইলে শুধু লিখিত সংবিধানটি পাঠ করিলে চলিবে না। লিখিত সংবিধান অবশ্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সর্বপ্রধান উৎস। ইহা ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নবেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি হইতে কার্যকরী হইয়াছে। সেই দিন হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন এবং উহার নানাবিধ সংশোধনী আইন পরিত্যক্ত হয়।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উৎস (Sources of the Indian constitution):

সংবিধানের পরই ভারতীয় সংসদের আইনকে শাসনতন্ত্রের উৎসরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংবিধানেই লিখিত আছে যে সংসদ নাগরিকতালাভ ও

পরিত্যাগের বিধি, যে আঞ্চিক রাজ্যে দ্বিতীয় সদন নাই সেখানে উহা স্থাপনের আইন, সুপ্রিম কোর্টের অধিকতর এক্তিয়ার বিষয়ক আইন ও তাহার বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচনসংক্রান্ত আইনকানুন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনবিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাই সংসদ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের Indian Citizenship Act, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের Legislative Councils Act, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের The Supreme Court (Number of Judges) Act, ১৯৫০ ও ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের The Representation of People Act, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে The Salaries and Allowances of Ministers Act, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের The States Reorganisation Act প্রভৃতি আইন পাস করিয়াছেন। এই সব আইন আমাদের শাসনতন্ত্রের উৎসস্বরূপ।

সংসদের আইন

তৃতীয়তঃ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রায়ও সংবিধানের উৎসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের গোপালন মোকদ্দমার ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের চিরঞ্জিত লালের মোকদ্দমার রায় প্রভৃতি নজিরে পরিণত হইয়াছে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ইম্যুনিটির মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত করেন যে উহার পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার অধিকার উহার বিচারকগণের আছে। সংবিধানের যে ধারার যেরূপ ব্যাখ্যা সুপ্রিম কোর্ট করেন তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়।

প্রধান অদালতের রায়

চতুর্থতঃ প্রথা বা Conventions যে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্যতম উৎস সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সংবিধানে এমন কথা নাই যে কোন রাজ্যপালকে নিযুক্ত করিবার পূর্বে তথাকার মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি লইতে হইবে, কিন্তু এখন সেইরূপ করাই প্রথা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ মাথা পাতিয়া লইবেন এমন কোন কথা সংবিধানে লিখিত নাই, কিন্তু গত বার বৎসর কালের মধ্যে সেই প্রথাই দাঁড়াইয়াছে। ভবিষ্যতে উহা পরিবর্তিত হইবে কিনা বলা যায় না।

প্রথা

এই সব উৎস ছাড়া প্রয়োজন মত ইংলণ্ডের সংবিধান, ভারতের ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধান, সাংবিধানিক আইনের প্রামাণ্য বিদ্বানদের অভিমত, এবং Constituent Assemblyর বিচারবিতর্ক প্রভৃতি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble to our Constitution) : লিখিত সংবিধানের প্রস্তাবনায় উহার লক্ষ্য ও আদর্শ ঘোষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে ও আমেরিকার সংবিধান প্রণয়নের সময় ঐরূপ আদর্শের ঘোষণা করা হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া আমাদের সংবিধানে বলা হইয়াছে যে—আমরা ভারতের জনগণ এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়সংকল্প লইয়া ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক **সুবিচার** ; চিন্তায়, বাক্যে, বিশ্বাসে, ধর্মে ও উপাসনায় **স্বাধীনতা** ; অবস্থা ও সুযোগের **সমতা** এবং তাহাদের সকলের মধ্যে **সৌভ্রাত্র** বৃদ্ধি করিয়া ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতির সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের সংবিধান-রচনার সভায় এই সংবিধান আজ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে নভেম্বর তারিখে গ্রহণ, ও প্রণয়ন করিয়া নিজদিগকে অর্পণ করিতেছি।

এই প্রস্তাবনায় (Justice, Liberty, Equality এবং Fraternity) (সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র) এই চারটি মহান আদর্শ স্বীকার করা হইয়াছে। আমাদের শাসনপ্রণালী এমন ভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ঐ আদর্শ দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত হইতে পারে। সামাজিক জীবনে অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া, যুগ যুগান্তের পদদলিত হরিজনদিগকে মন্দিরাদি সকল স্থানে প্রবেশের অধিকার দিয়া এবং জমিদারি ও সীমান্ত রাজ্য উচ্ছেদ করিয়া আমরা সুবিচার, সাম্য, স্বাধীনতা, ও সৌভ্রাত্রের পথে অগ্রসর হইতেছি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অবলম্বন করার ফলে আশা করা যায় যে কিছুকালের মধ্যে আমাদের ভিতর যেটুকু অসাম্য আছে তাহাও বিদূরিত হইবে।

সাম্যের আদর্শ

আমাদের রাষ্ট্রকে সার্বভৌম বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের সদস্য বলিয়া তাহার সার্বভৌমিকতার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। কেহ জোরজবরদস্তি করিয়া আমাদের উপর ঐ সদস্যপদ চাপাইয়া দেয় নাই। আমরা স্বেচ্ছায় উহা গ্রহণ করিয়াছি। তাহার ফলে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে আমাদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে সাধারণতন্ত্র শব্দের সহিত আবার গণতন্ত্র শব্দ যোগ করিবার প্রয়োজন ছিল না। সাধারণতন্ত্র মানে যেখানে রাজা বা রানীর শাসন নাই। কাজেই উহাতে জনসাধারণের প্রাধান্য থাকিবেই। কিন্তু সাধারণতন্ত্রে একজনের বা কতিপয় ব্যক্তির শাসন চলিতে পারে। ভারতবর্ষ ঐরূপ শাসন চাহে না বলিয়া গণতন্ত্র শব্দটি পৃথকভাবে যোগ করিয়াছে।

সার্বভৌমিকতা

রাষ্ট্রের নীতি-নির্দেশক তত্ত্ব (Directive principles of State Policy) : আয়ারের বা আয়ারলণ্ডের সংবিধানের অনুসরণ করিয়া ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ ভাগে (৩৬ হইতে ৫১ ধারায়) কতকগুলি আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ ঘোষণা করা হইয়াছে। এগুলি নিছক আদর্শ; ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে প্রতিকারের জন্য কেহ আদালতের সাহায্য পাইবেন না। কিন্তু সরকার ও জনগণের সমক্ষে এইরূপ আদর্শ উপস্থিত থাকিলে আমাদের রাজনৈতিক জীবনের মানদণ্ড উচ্চ হইবে বলিয়া ইহা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রের আদর্শ

রাষ্ট্রের সমক্ষে নিম্নলিখিত আদর্শগুলি স্থাপন করা হইয়াছে। যথা— রাষ্ট্রে এমন ভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় এবং সকলে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সুবিচার লাভ করিতে পারে (৩৮ ধারা)। সরকার চেষ্টা করিবেন যাহাতে প্রত্যেক শ্রমিক উপযুক্ত বেতন পান, ভাল ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধা পান (৪৩ ধারা)। সরকার সকলের জীবনের স্তর ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য সচেষ্ট হইবেন (৪৭ ধারা)। রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে (৫১ ধারা)। রাষ্ট্র এমন ভাবে কাজ করিবে যাহাতে ধনসম্পদের বণ্টনে সমতা থাকে এবং ধন উৎপাদনের উপাদান ও ধনসম্পত্তি মুষ্টিমেয় কয়েক জন ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত না হয় (৩৯ ধারা)। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আর্থিক কমিটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন যে দেশের শতকরা কুড়িভাগ লোক মাত্র উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ যাহাতে জনগণের এবং সরকারের সমক্ষে সব সময়ে উপস্থিত থাকে সেইজন্য কয়েকটি নীতি ঘোষিত হইয়াছে। মদ্য ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার একমাত্র ঔষধার্থ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে বর্জন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে (৪৭ ধারা)। দুধ দেয় বা ভারবহন করে এমন গবাদিপশুর হত্যা বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে। স্বায়ত্তশাসনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। সংবিধান আরম্ভ হইবার দশবৎসরের মধ্যে চৌদ্দবৎসর বয়স পর্যন্ত সকল বালকবালিকাকে বিনামূল্যে বাধ্যতা মূলক শিক্ষা-দানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা সম্ভব হয় নাই। কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে

উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করিতে হইবে। তপশিলী জাতির লোকেরা যাহাতে শিক্ষায় ও আর্থিক বিষয়ে উন্নত হইতে পারেন তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর এই সব আদর্শ ছাড়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ঘোষিত শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে স্বতন্ত্র করিবার চেষ্টা করার কথাও বলা হইয়াছে। ঐতিহাসিক বা শিল্প উৎকর্ষের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান বা বস্তুর সংরক্ষণের চেষ্টাও অন্যতম আদর্শ।

জনগণের অধিকার

সংবিধানের নির্দেশক নীতির মধ্যে জনগণের কয়েকটি অধিকারের আদর্শও স্থাপন করা হইয়াছে। যথা, প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ পাইবার অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার, বেকারি, বার্ধক্য, রোগভোগ প্রভৃতি দৈব দুর্দশায় সরকারী সাহায্যে লাভের অধিকার, জীবন ধারণের উপযুক্ত আয় লাভের অধিকার, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমান কাজের জন্য সমান বেতন লাভের অধিকার, অপরের দ্বারা শোষিত হইবার বিরুদ্ধে প্রতিকার ব্যবস্থা প্রভৃতি। এই আদর্শগুলি সামনে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। তাহা হইলে যখন ভারতের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে তখন এগুলিকে কার্যকরী করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মৌলিক অধিকারকের সহিত পার্থক্য

নির্দেশক নীতির সহিত নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পার্থক্য আছে। সাধারণ সময়ে (আপদকালে বা জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় নহে) মৌলিক অধিকারকে কেহ ক্ষুণ্ন করিলে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় এবং প্রতিকার পাওয়া যায়। কিন্তু কোন নির্দেশক নীতি অনাদৃত হইয়াছে বলিয়া নালিশ করা চলে না। মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিতেছে এমন কোন আইনকে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। কিন্তু মদ্যপান বন্ধ না করিয়া তাহা হইতে অর্থলাভ করিবার জন্য যদি কোন আইন তৈয়ারি করা হয় তাহা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইবে না।

কিন্তু নির্দেশক নীতিকে সেইজন্য নিরর্থক বলা চলে না। যাঁহাদিগকে জনসাধারণ শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা যদি এই সব নীতিকে কার্যকরী করিবার কোন চেষ্টাই না করেন, তাহা হইলে আগামী নির্বাচনে তাঁহাদের পরাজয়ের আশঙ্কা থাকতে পারে। আমাদের সরকারের সাফল্যের পরিমাণ কতটা তাহা নিরূপণ করিতে হইলে এই নির্দেশক নীতিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় নাগরিক ও তাহার মৌলিক অধিকার

ভারতের নাগরিকতা: ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকতা সম্বন্ধে অতি সামান্য কথাই আছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সংবিধান কার্যকরী হইবার সময় কোন্ কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক রূপে গণ্য হইবেন শুধু সেই বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে কোন কোন যোগ্যতা থাকিলে কাহাকে নাগরিক বলিয়া ধরা হইবে, কি ভাবে নাগরিকতা লাভ করা যাইবে কিংবা কি জন্য লোকে ভারতীয় নাগরিকতা হারাইবে সে সব বিষয়ে সংসদকে আইন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ ব্যবস্থার কারণ এই যে দুইবৎসর ধরিয়া বিচার বিতর্ক করিয়াও Constituent Assembly নাগরিকতা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। লক্ষ লক্ষ লোক নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাঁহাদিগকে যেমন ভারতীয় নাগরিক বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল তেমনি যাঁহারা ভারত ছাড়িয়া পাকিস্তানে বসবাস করিতে গেলেন তাঁহাদিগকে ভারতীয় নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করা দরকার ছিল। এমন পরিস্থিতি ঘটিয়াছিল এবং আজও তাহা বর্তমান আছে যে পিতা ভারতের নাগরিক, পুত্র পাকিস্তানে চাকুরি করিয়া সেখানকার নাগরিক হইয়াছেন। আবার স্ত্রী ভারতে বাস করিতেছেন, স্বামী পাকিস্তানের নাগরিক হইয়া গিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও হাজার হাজার দেখা যায়। এইরূপ জটিল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ভার সংসদের উপর দিয়া আমাদের সংবিধানের রচয়িতারা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। সংসদ তাড়াতাড়ি আইন করিতে পারেন নাই। পাঁচবৎসর বিচারবিবেচনার পর ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে নাগরিকতা সম্বন্ধে আইন লিপিবদ্ধ হয়।

নাগরিকতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার বিঘ্ন

সংবিধানে বলা হইয়াছে যে সংবিধান প্রচলিত হইবার সময় অর্থাৎ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে যে ব্যক্তি ভারতের অধিবাসী ছিলেন এবং (ক) যিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (খ) যাঁহার জনকজননীর মধ্যে কেহ ভারতে জন্মিয়াছিলেন (গ) যিনি ইহার অন্ততঃ পাঁচবৎসর পূর্বে হইতে সাধারণতঃ ভারতে বাস করিতেছেন তিনি ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন। শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তির পিতা-মাতা

অন্যদেশীয় হইলে কোন ক্ষতি নাই। এই তিন শ্রেণী ছাড়া পাকিস্থান হইতে যিনি চলিয়া আসিয়াছেন এবং যিনি বা যাঁহার পিতা বা মাতা, পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি ভারতবিভাগের আগেকার ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি (ক) যদি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই হইতে ভারতে বাস করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বিনা রেজেস্টারিতে নাগরিক হওয়া সম্ভব হইবে (খ) ঐ তারিখের পর যিনি ভারতে আসিয়াছেন তাঁহার রেজেস্টারিভুক্ত হইতে হইত, তবে উহার জন্য দরখাস্ত করিবার পূর্বে অন্ততঃ ছয়মাস কাল তাহারপক্ষে ভারতে বাস করার প্রয়োজন। (গ) দেশবিভাগের পর যাঁহারা পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

সংবিধানে নাগরিকতার উল্লেখ

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সংসদ যে আইন পাস করিয়াছেন তাহার দ্বারা নিম্নলিখিত ছয় শ্রেণীর লোক ভারতীয় নাগরিকতা পাইতে পারেন।—(১) ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারীর পর যাঁহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা (২) ঐ তারিখের পর যাঁহারা ভারতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের পিতা যদি ঐ সময়ে ভারতীয় নাগরিক থাকেন (৩) যাঁহারা সাধারণতঃ ভারতে বসবাস করেন তাঁহারা যদি রেজেস্টারীভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিবার ছয় মাস পূর্বে এখানে বাস করেন (৪) ভারতীয় নাগরিকদের সহিত যে সব বিদেশীয় নারীর বিবাহ হইয়াছে তাঁহারাও দরখাস্ত করিয়া নাম রেজেস্টারী করাইয়া ভারতীয় নাগরিক হইতে পারেন। (৫) বিদেশীয় ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে এবং ভারত সরকার তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করিতে পারেন। (৬) যদি কোন নূতন অঞ্চল ভারতের অধিকারভুক্ত হয় তাহা হইলে উহার কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন তাহা ভারত সরকার স্থির করিবেন। পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা এইভাবে ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিয়াছেন।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে নাগরিক

বিদেশীয় ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিকতা প্রদানের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়—(ক) তিনি যে দেশের প্রজা বা নাগরিক সে দেশে ভারতীয়গণ তথাকার নাগরিক হইবার সুযোগ পান কিনা (খ) তিনি পূর্বে যে

দেশের নাগরিক ছিলেন সেই নাগরিকতা ত্যাগ করিয়াছেন কিনা (গ) দরখাস্ত করিবার বার মাস পূর্বে হইতে তিনি ভারতে বাস করিতেছেন বা ভারত সরকারের অধীনে চাকুরি করিয়াছেন কিনা (ঘ) ঐ বার মাসের পূর্বে সাত বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চার বৎসর তিনি এ দেশে বাস করিয়াছেন বা ভারত সরকারের অধীনে চাকুরি করিতেছেন কিনা (৭) তিনি সচ্চরিত্র এবং ভারতের ১৪টি প্রধান ভাষার যে কোন একটি জানেন কিনা (৮) তাঁহার ভারতবর্ষে বসবাস করিবার অভিপ্রায় থাকা প্রয়োজন।

বিদেশীয় ব্যক্তির নাগরিকতা লাভ

কখনও কখনও কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা ভোগ করেন। তিনি যদি প্রাপ্তবয়স্ক হন তাহা হইলে নিয়মমত ঘোষণা করিয়া ভারতীয় নাগরিকতা ত্যাগ করিতে পারেন। ভারতের কোন নাগরিক যদি অন্যকোন দেশের নাগরিকতা গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি আর ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন না। ভারতে যাঁহারা জন্মিয়াছেন বা যাঁহাদের পিতামাতা বা পিতামহ পিতামহী ভারতীয়, তাঁহাদিগকে ভারতীয় নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করা যায় না। কিন্তু যে সব বিদেশীয় ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে কয়েকটি কারণের জন্য উহা হইতে বঞ্চিত করা যায়। তাঁহারা যদি নাগরিকতা গ্রহণের সময় কোন ছলচাতুরি বা প্রবঞ্চনা করিয়া থাকেন কিংবা পরে সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হন কিংবা যুদ্ধের সময় ভারতের হানিকর কোন ব্যবসায় লিপ্ত থাকেন কিংবা দুই বৎসরের অধিককালের জন্য বিদেশে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তাহা হইলে তাঁহার নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইবে। অবশ্য এরূপ করিবার পূর্বে তাঁহাদিগকে জানানো হইবে এবং কি কারণে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ঐরূপ নীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহাও বলিয়া দিতে হইবে।

ব্যক্তি বিশেষের ভারতীয় নাগরিকতার বিলুপ্তি

কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের নাগরিকদিগকে ভারতে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

নাগরিকের মৌলিক অধিকার : ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার ঘোষণার রেওয়াজ চলিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার পর তাহাতে দশটি সংশোধনী ধারা সংযোজন করিয়া মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হয়। ইংলণ্ডের সংবিধানে পৃথক ভাবে মৌলিক

অধিকারের কথা নাই, কেননা সেখানকার সংবিধান মূলতঃ অলিখিত কিন্তু এখন প্রায় সকল লিখিত সংবিধানেই মৌলিক অধিকারের কথা সন্নিবিষ্ট থাকে।

মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা

মৌলিক অধিকার বলিতে সাধারণ ভাবে এমন অধিকার বুঝায় যাহার সাহায্যে মানবের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের পরিস্ফুরণ ঘটিতে পারে। যে সকল অধিকারকে সংবিধান রক্ষা করে তাহাকে মৌলিক অধিকার বলা যায়।

ভারতের সংবিধানে মৌলিকঅধিকার অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে

ভারতবর্ষের সংবিধানে মৌলিক অধিকার যেমন ব্যাপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে তেমন আর অন্য কোন দেশের সংবিধানে হয় নাই। আমেরিকার সংবিধানে দশটি মাত্র ধারায় উহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রথমে ২৪টি ধারা করা হইয়াছিল, তাহার সহিত আবার ৩১ এ এবং ৩১ বি যোগ করিয়া এখন ২৬টি ধারা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫টি ধারায় সাম্য, ৪টি ধারায় স্বাধীনতার ২টি ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার, ৪টি ধারায় ধর্ম বিষয়ক স্বাধীনতা, ২টি ধারায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার, ৩টি ধারায় সম্পত্তির অধিকার এবং ১টি ধারায় অধিকারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে। সাম্য বলিতে আইনের সমান অধিকার বুঝায়; ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের জন্য কাহাকেও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে না; সরকারী চাকুরিতে সকলের সমান সুযোগ; অস্পৃশ্যতা এবং উপাধি দেওয়া ও ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্বাধীনতার মধ্যে বাক্যের ও লেখার, সভা করিবার, সংঘবদ্ধ হইবার, যাতায়াত করিবার, কোন স্থানে বসবাস করিবার, জীবনরক্ষার ও গ্রেপ্তার ও বন্দী হইবার বিরুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য বুঝায়। সম্পত্তির অধিকার

বিভিন্ন প্রকারের অধিকার

মানে শাসকগণ আইনের অনুমোদন ছাড়া কাহাকেও সম্পত্তি চ্যুত করিতে পারিবেন না এবং সাধারণের কল্যাণের জন্য যদি কাহারও সম্পত্তি সরকার অধিকার করিয়া লন তাহা হইলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের মধ্যে বেগার লওয়া, মানুষ লইয়া ব্যবসা করা এবং অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে কারখানায় বা কোন বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করা নিষেধ করা হইয়াছে। ধার্মিক স্বাতন্ত্র্য বলিতে বুঝায় যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের রুচি অনুযায়ী যে কোন ধর্ম অবলম্বন করিতে উপাসনা করিতে এবং উহা প্রচার করিতে অবাধ সুযোগ পাইবে,

বিশেষ কোন ধর্মের প্রতিপালনের জন্য কোন কর দিতে বাধ্য করা হইবে না এবং কোন ধর্মবিষয়ক শিক্ষা বা উপাসনায় কাহাকেও উপস্থিত হইতে বাধ্য করা হইবে না। শিক্ষা ও সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার অধিকার এবং স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

সবগুলিকে মৌলিক বলা চলে না

এই অধিকারগুলির মধ্যে কতকগুলিকে মাত্র মৌলিক অধিকার বলা চলে—সকলগুলিকে নহে। কেহ যদি কোন উপাধি পায় তাহা হইলে তাহাতে অন্যের ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিঘ্ন ঘটে বলা যায় না। তবে আমাদের দেশে রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি প্রদান ও ব্যবহার করা নিষেধ করিয়া সকল নাগরিকের সামাজিক সাম্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপনের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। বরং সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া ধনী ও বিত্তহীনদের পার্থক্য চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব

সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করিরার জন্য ত্রয়োদশ ধারায় বলা হইয়াছে যে কোন পূর্বপ্রচলিত প্রথা, নিয়ম বা আইনকানুন অথবা হালের তৈয়ারি আইন যদি মৌলিক অধিকারের প্রতিকূল হয় তাহা হইলে সেই আইন বা প্রথা নাকচ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা না বলিলেও চলিত, কেননা সংবিধানের বিরুদ্ধে কোন আইনই টিকিতে পারে না। তবে সরকার ও আইনসভাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য জোর দিয়া ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে। জেনিংস বলেন যে ইহা a measure of abundant caution মাত্র।

ইহা সরকারের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য

নাগরিকগণকে সরকারের যথেচ্ছাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য মৌলিক অধিকার ঘোষিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি অথবা যৌথ কোম্পানী যদি কাহারও প্রতি অসমান ব্যবহার করেন তাহা হইলে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করিবার অভিযোগ আনিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। যদি কোন থিয়েটারে বা হোটেলে কোন হরিজনকে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই হরিজন নালিশ করিতে পারেন বটে, কিন্তু উহা সংবিধানে ৩২ ধারা অনুসারে মৌলিক অধিকারের মামলার

মধ্যে পড়িবে না ; ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের Untouchability offences Act ভঙ্গ করার জন্য ঐ থিয়েটার বা হোটেল দণ্ডনীয় হইবে।

কিন্তু মৌলিক অধিকার কেবলমাত্র সরকারের অত্যাচার হইতে ব্যক্তিকে বাঁচাইবার জন্য ঘোষিত হয় নাই। আইনসভার খেয়াল খুসির হাত হইতেও ব্যক্তিকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্যও ইহা তৈয়ারি করা হইয়াছে। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতানুসারে কাজ হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠগণ কখনও কখনও সংখ্যা লঘুদের ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হন। তাঁহারা যাহাতে এরূপ না করিতে পারেন সেইজন্য সংবিধানে বলা হইয়াছে যে কেন্দ্রের কিংবা রাজ্যের আইনসভা যদি কখন কোন আইন তৈয়ারি করেন যাহার দ্বারা নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতেছে তাহা হইলে ঐ আইন বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠদল এতই প্রবল যে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। তাঁহারা সমগ্র সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে যে কোন মুহূর্তে সংবিধানে লিখিত মৌলিক অধিকারের হ্রাসবৃদ্ধি করা মোটেই কঠিন নহে। কয়েক-বার এরূপ করাও হইয়াছে। কিন্তু কখনও আজ পর্যন্ত তাঁহারা সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়ের কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে অগ্রসর হন নাই।

আইনসভার যথেচ্ছাচার হইতে অধিকার রক্ষা

মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন অধিকার নিরঙ্কুশ নহে। স্থান, কাল ও পাত্রের উপর অধিকারের প্রয়োগ নির্ভর করে। কোন রাষ্ট্রই তাহার নাগরিককে সব সময়ে যাহা খুসি বলিবার বা করিবার অধিকার দিতে পারে না। সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা সরকারের অবশ্য কর্তব্য। সেইজন্য আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাহা কোন কোন বাধা-নিষেধের সহিত প্রযুক্ত হইবে তাহা বলা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে যাহা খুসি বলিবার বা লিখিবার অধিকারকে সীমিত করা হইয়াছে এই বলিয়া যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীভাব, নীতি ও শালীনতা ক্ষুণ্ণ হয় অথবা অন্য লোকের মানহানি ঘটে অথবা লোককে অবৈধ কার্যে প্ররোচিত করা হয় কিম্বা আদালতের অবমাননা হয় এমন কিছু বলিবার বা প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

অধিকার অবাধ হইতে পারে না

অনেকে বলেন যে আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে যে সব বাধা-নিষেধের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মাত্রা কিছু বেশি। আমেরিকার সংবিধানে বাধা-নিষেধের উল্লেখ নাই, আদালতের উপর উহা প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। আমাদের সংবিধানে ঐগুলি স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। কেন না দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে আমাদের সংবিধান রচিত হইয়াছে এবং সেইজন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যাহাতে বিপন্ন না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন ছিল এবং আছে। আমাদের শিশুরাষ্ট্রকে যত রকমের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এতটা আর অন্য কোন রাষ্ট্রকে হইতে হয় নাই। বিশুদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়া দেখিলে হয়তো আমাদের মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে বাধা-নিষেধের সংখ্যা কিছু বেশি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আর উহা অযৌক্তিক বলা যায় না। শান্তির সময় নিবর্তন-মূলক আটকের (Preventive detention) ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন কোন গণতান্ত্রিক দেশ উপলব্ধি করে নাই; কিন্তু ভারতের সংবিধানে উহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিস্টদিগকে রাজনৈতিক দল গঠন করিতে দেয় না, ভারতে তাঁহাদিগকে দল গঠনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অনুরোধে কখনও কখনও শান্তির সময়েও দুই চারিজন ব্যক্তিকে অনিষ্টকর কার্য হইতে বিরত রাখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

বাধা-নিষেধের বাহুল্য ও তাহার কারণ

যুদ্ধের সময়ে অথবা যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে যখন আপৎকালীন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় তখন নাগরিকদের বক্তৃতা, সংঘস্থাপন, অবাধ চলাফেরা প্রভৃতি অনেক মৌলিক অধিকারই নাকচ হইয়া যায়। কেহ ঐসব অধিকার হারাইয়া আদালতের নিকট প্রতিকার প্রার্থী হইতে পারেন না। আর একটি ক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকার লুপ্ত হইতে পারে। যদি কোন স্থানে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং সৈন্যগণ কিংবা তাঁহাদের অধিনায়কেরা কাহারও মৌলিক অধিকার হরণ করেন তাহা হইলে সংসদ পরবর্তীকালে আইন পাস করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ অপরাধে দণ্ড হইতে মুক্তি দিতে পারেন। ঐরূপ আইনকে Indemnity Act বলে। সামরিক আইন জারি করিয়া যেখানে শান্তিরক্ষা করিতে হয় সেখানে নাগরিকদের অধিকারের

আপৎকালীন অবস্থা ও সামরিক আইন জারি

চুলচেরা বিচার করিয়া কাজ করিতে গেলে মূল উদ্দেশ্য বিফল হইতে পারে। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষও যে কখনও কখনও কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না।

আমাদের মৌলিক অধিকার অবাধ নহে, ত্রুটিহীনও নহে। কিন্তু বহুকালের পরাধীনতার পর যে দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহাকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত সেই স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে হয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যাহাতে বিপন্ন না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাই প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্র না থাকিলে কাহারও কোন অধিকার থাকিতে পারে না।

সমতার অধিকার ঃ ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে আইনের সামনে সমতা এবং আইনসমূহের সমান সংরক্ষণ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না (১৪ ধারা)।

আইনের চোখে সকলে সমান

আইনের সমতা একটি নিষেধাত্মক বিধি। কেহই আইনের ঊর্ধ্বে নহে, সকলকেই সাধারণ আইন ও সাধারণ আদালতের এক্তিয়ার মানিয়া চলিতে হইবে ইহাই এই নীতির মর্মার্থ। কিন্তু ইংলণ্ডে যেমন রাজার (বা রানী) বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পেশ করা যায় না, তেমনি ভারতে রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপালের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা আনা যায় না এবং তাঁহাদের সরকারী কাজের জন্য কোন দেওয়ানি মামলাও দায়ের করা যায় না। এই নীতিটি ইংলণ্ডের সংবিধান হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু আইনসমূহের সমান সংরক্ষণ নীতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ এই যে সমঅবস্থাযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আইন সমান হইবে এবং সমানভাবে প্রয়োগ করা হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন আইনের সমান সুবিধা পায় এবং একই অবস্থায় কাহাকেও যেন বেশি কোন ভার বহন করিতে না হয়।

সকলে সমানভাবে সুরক্ষিত হইবে

ভারতবর্ষে ইহাকে এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যাহাতে কোন ব্যক্তিকে বা শ্রেণীকে কোন আইনের দরুণ অথবা কোন শাসকের আজ্ঞাবলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়। সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে যেন আইনের কোন ভেদ না থাকে। কিন্তু আইন বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন হইতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি এরূপ সুস্পষ্ট হওয়া দরকার যাহাতে সহজেই যাহাদের জন্য আইন হইতেছে তাহাদের সহিত অন্যদের পার্থক্য বোঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যে জন্য আইন করা হইতেছে সেই উদ্দেশ্যের সহিত ঐ পার্থক্যের যুক্তিসংগত সম্পর্ক থাকা

প্রয়োজন। মোটকথা খেয়ালখুসি মতন শ্রেণীবিশেষকে পৃথক ভাবা চলিবে না। দুই একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

যে সব রাজ্যে মাদক বর্জননীতি গৃহীত হইয়াছে সেখানে সামরিক ব্যক্তিদিগকে বা বিদেশীয় ব্যক্তিগণকে মদ্য ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোন বড় বে-সামরিক কর্মচারীকে বা লক্ষপতিকে অনুরূপ সুবিধা দেওয়া বে-আইনি। বিভিন্ন ধরনের পেশা ও কারবারের উপর বিভিন্ন হারে কর ধার্য করা যাইতে পারে, কিন্তু চোখের ডাক্তারের উপর বেশি হারে এবং দাঁতের ডাক্তারের উপর কম হারে কর বসানো চলিবে না।

বিভেদের নমুনা

সংবিধানে (১৫.ধারা) বলা হইয়াছে যে কেবলমাত্র ধর্ম, মূলবংশ (race), জাতি, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, জন্মস্থান অথবা ইহার যে কোন একটির জন্য কাহাকেও পার্থক্য করা চলিবে না এবং কাহাকেও দোকান, হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ নিষেধ করা যাইবে না এবং যে সমস্ত কূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট, রাস্তা অথবা সাধারণের সমাগমের স্থান রাষ্ট্রের খরচে পূর্ণ বা আংশিকভাবে নির্মিত অথবা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সমর্পিত সেগুলিতে প্রবেশে কোনরূপ বাধা দেওয়া চলিবে না। ইহাতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সংবিধানের সপ্তদশ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে অস্পৃশ্যতা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইল।

অস্পৃশ্যতা নিবারণ

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আইনের দ্বারা কোনরূপ পার্থক্য রাখা সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ হইলেও শিশু ও স্ত্রীজাতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুন্নত শ্রেণীদের বিশেষ করিয়া তপশীলী জাতি এবং তপশীলী জনজাতিদের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিবার নীতি অনুমোদন করা হইয়াছে (১৫।৪ ধারা)। এই ধারাটি প্রথমে সংবিধানে সন্নিবিষ্ট ছিল না, কিন্তু মাদ্রাজ হাইকোর্ট যখন মাদ্রাজ রাজ্য বনাম চম্পকম মামলায় বলিলেন যে সরকার তপশীলী জাতি প্রভৃতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আসনাদি সংরক্ষণ করিতে পারেন না তখন ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সংবিধান সংশোধন করিয়া ইহা বসানো হইয়াছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের সরকার এমন এক নিয়ম করেন যাহাতে ঐ রাজ্যের শতকরা নব্বই জন ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দিবার ব্যবস্থা হয়। তাহার ফলে বাকী শতকরা দশজন ঐ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হন। তাই সুপ্রিম কোর্ট

সিদ্ধান্ত করেন যে ইহা শুধু অন্যায় নহে, ইহা সংবিধানের উপর জুয়াচুরি (a fraud on the constitution)।

সরকারী চাকুরির ব্যাপারে সকল নাগরিককে সমান সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। কাহাকেও কেবল মাত্র ধর্ম, জাতি, জন্মস্থান, স্ত্রী পুরুষে ভেদ প্রভৃতির জন্য সরকারী চাকুরি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু সংসদ আইন করিয়া স্থির করিতে পারেন যে নির্দিষ্ট কালের জন্য কোন রাজ্যে যাঁহারা বসবাস করিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই সেই রাজ্যের চাকুরিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। যে সব শ্রেণীর লোক অনুন্নত এবং যাঁহাদের মধ্যে খুব কম লোকই চাকুরি পাইয়াছে তাঁহাদের জন্য কিছু সংখ্যক চাকুরি সংরক্ষিত রাখা চলিবে। কোন ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে সেই ধর্মের বা সম্প্রদায়ের লোককে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা থাকিতে পারে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সংসদ Public Employment (Requirement as to Residence) Act পাস করিয়া স্থির করেন যে কোন রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যে চাকুরি সীমাবদ্ধ রাখা চলিবে না। এক সময়ে Domiciled না হইলে কেহ কোন কোন প্রদেশের চাকুরি পাইতে পারিতেন না। তাহাতে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উহার নিবারণকল্পে ঐ আইন পাস করা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য উপাধি প্রদান ও ব্যবহার করা বর্জিত হইয়াছে, তবে বিদ্যা ও সামরিক ব্যাপারে ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদশ্রী প্রভৃতিকে উপাধি বলিয়া গণ্য করা হয় না। ডক্টরেট, মেজর প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হয়, উহা নিষিদ্ধ হয় নাই।

সরকারী চাকুরিতে অধিকার

স্বাতন্ত্র্যের অধিকার : সংবিধানের ১৯, ২০, ২১ ও ২২ ধারায় নাগরিকদের স্বাতন্ত্র্যের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে স্বাভাবিক সময়ে নাগরিকেরা (ক) বাক্যের ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করিবেন (খ) নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সমবেত হইতে পারিবেন (গ) সংঘ ও সমিতি গঠন করিতে পারিবেন (ঘ) ভারতের সর্বত্র অবাধে যাতায়াত করিতে পারিবেন (ঙ) ভারতের যে কোন স্থানে, বাস করিতে ও বাসস্থান স্থাপন করিতে পারিবেন (চ) সম্পত্তি অর্জন, অধিকার ও হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং (ছ) যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে রত হইতে পারিবেন। এই সাতটি অধিকার এক ধরনের না হইলেও সংবিধানে ঐগুলিকে একসঙ্গে রাখা হইয়াছে।

বিভিন্ন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য

এই সব অধিকারকে কতকগুলি বাধানিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। সংবিধানের প্রথমে বলা হইয়াছিল যে কুৎসা, মানহানি, আদালতের অবমাননা যাহাতে না হয়, শ্লীলতা ও নৈতিকতার হানি না হয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিঘ্ন না ঘটে এমন কিছু বলার, লেখার এবং প্রকাশ করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা চলিবে। কিন্তু কেহ যদি বক্তৃতা করিয়া লোককে হত্যা করিতে প্ররোচিত করি, তবে তাহার বাক্ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাইত না। রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্যের মামলায় রায়দান প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এইরূপ মত প্রকাশ করেন। তাই ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইল যে বাক্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে (ক) রাষ্ট্রের নিরপত্তা রাখার জন্য (খ) বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য (গ) শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য (ঘ) শ্লীলতা ও সদাচার রক্ষার জন্য (ঙ) আদালতের অবমাননা নিবারণের জন্য (চ) মানহানি বাঁচাইবার জন্য এবং (ছ) অপরাধে প্ররোচনাদান নিবারণের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করা যাইবে, কিন্তু সরকার বাক্-স্বাতন্ত্র্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর যে সকল বাধানিষেধ আরোপ করিবেন তাহা কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার করিবার ভার আদালতের উপর। যদি আদালতের বিচারের সময় প্রমাণিত হয় যে সরকার অনর্থক নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন আদেশ জারি করিয়াছেন বা আইন পাস করিয়াছেন তাহা হইলে উহা বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাতন্ত্র্যের নিয়ন্ত্রণ

মত প্রকাশের স্বাধীনতা শব্দটি খুব ব্যাপক বলিয়া আর আলাদাভাবে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার কথা মৌলিক অধিকারের মধ্যে ধরা হয় নাই। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে **The Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Act,** পাস করিয়া বলা হইয়াছে যে সংসদের কার্য-বিবরণ যদি কেহ যথাযথরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন তাহা হইলে সেইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি অথবা দেওয়ানি মামলা আনা চলিবে না। তবে জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় নহে এমন কোন সংবাদ প্রকাশ করা চলিবে না এবং বিদ্বেষ-প্রসূত মনোবৃত্তি লইয়া কিছু ছাপা চলিবে না। আকাশবাণীতে সংসদীয় সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতাও ঐ আইনের দ্বারা দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অমুল্লেখ

ভারতের নাগরিকেরা অস্ত্র-শস্ত্র না লইয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে সমবেত হইতে পারেন। কিন্তু কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সভা করা বে-আইনী।

নাগরিকেরা নিজেদের মধ্যে সংঘ ও সমিতি স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু সরকার নীতি ও শৃঙ্খলার (Public Order) অনুরোধে যুক্তিসঙ্গত নিরোধ প্রয়োগ করিতে পারেন। কোন বাধা-নিষেধ যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা বিচার করিবেন আদালত। মাদ্রাজের ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে একটি আইন করিয়া সরকারকে শান্তিরক্ষার নামে যে কোন সংঘকে বে-আইনী ঘোষণা করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ রাজ্য বনাম জি, রাও মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে ঐভাবে শাসনবিভাগের উপর নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা অন্যায়।

সংঘ স্থাপন

ভারতের মধ্যে চলাফেরার স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের আছে বটে, কিন্তু কোন তপশীলী জন-জাতির (Scheduled Tribes) কিম্বা সাধারণের মঙ্গলের জন্য সরকার উহার উপর যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারেন। এই জন্য পাছে হাঙ্গামা বাধে এই ভয়ে কখনও কখনও কোন ব্যক্তিকে একটি অঞ্চলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন ও বসবাস স্থাপন করিতে পারেন। এই অধিকারও জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অথবা কোন তপশীলী জনজাতির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্কুচিত করা যাইতে পারে। সরকার কোন নাগরিককে ভারত হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারেন না; কিন্তু তাহার বাড়িতে অথবা জেলায় প্রবেশ করা নিষেধ করিতে পারেন।

যে কোন নাগরিক যে কোন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করিতে পারেন এবং যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু সরকার জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নিয়ম করিতে পারেন যে কেহ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা উকীল হইতে পারিবেন না। মাদকদ্রব্যের বিক্রয়ও সরকার নিষেধ করিতে পারেন। কিন্তু মধ্য প্রদেশের সরকার কয়েকটি গ্রামে যে বিড়ি তৈয়ারি করা নিষেধ করিয়াছিলেন তাহা অযৌক্তিক বলিয়া সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়াছেন। সরকার যে ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইবেন তাহা হইতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে সাধারণ নাগরিককে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। সরকার যদি কোন পথে বাস চালাইতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ঐ পথে বাস চালাইতে

পেশা ও ব্যবসায়ে স্বাধীনতা

পারিবেন না। এলাহাবাদের পৌরসভা গো-হত্যা নিষেধ করিয়াছে, সেইজন্য কেহ দাবি করিতে পারিবে না যে সে ঐস্থানে গোমাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে। সরকার যদি কোন পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করেন তাহা হইলে কোন গ্রন্থকার বা প্রকাশক ঐরূপ পুস্তক ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

আইন তৈয়ারির পূর্বের অপরাধ দণ্ডনীয় নহে

ইংলণ্ডের Rule of Law অনুসরণ করিয়া আমাদের সংবিধানে (২০ ধারা) লিখিত হইয়াছে, যে সময়ের কাজকে অপরাধজনক বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে সেই সময়ে যে আইন প্রচলিত ছিল তাহা ভঙ্গ না করিলে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইবে না। এক পত্নীর জীবনকালে অন্য নারীকে বিবাহ করা যখন নিষিদ্ধ ছিল না সেই সময়ে কেহ যদি দুই স্ত্রীর সঙ্গে ঘর-সংসার করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে এখন তাহাকে অপরাধী হিসাবে দণ্ড দেওয়া চলিবে না। অপরাধ করিবার কালে এই অপরাধের জন্য যে দণ্ড দেওয়া যাইত তাহার অধিক দণ্ড দেওয়া যাইবে না। একই অপরাধের জন্য এক ব্যক্তিকে একবারের বেশি অভিযুক্ত করা বা দণ্ড দেওয়া চলিবে না। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হইবে না।

আইন বিহিত পদ্ধতি

আইনবিহিত পদ্ধতি ছাড়া (Procedure established by law) কাহাকেও তাহার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে না—এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি সংবিধানের ২১ ধারায় লিখিত হইয়াছে। যদি ভারতীয় সংসদ অথবা কোন রাজ্যের আইনসভা কোন অসঙ্গত আইন পাস করেন এবং তাহার ফলে কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দী করা হয় কিংবা তাহাকে প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে আদালত বলিতে পারিবেন না যে ঐ আইন অযৌক্তিক কিংবা বে-আইনী। আইনে যে অপরাধের জন্য যে দণ্ড নির্দিষ্ট হইয়াছে আদালত সেই দণ্ড প্রয়োগ করিতে বাধ্য ; আইন ভাল কি মন্দ এক্ষেত্রে সে বিচারের অধিকার আদালতকে দেওয়া হয় নাই। এটি বিস্ময়কর ব্যাপার, কেননা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতির উপর যদি আইন কোন অযৌক্তিক বিধিনিষেধ রাখে তাহা হইলে আদালত সেই আইনকে বে-আইনী বলিবার অধিকারী, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে বন্দী করিবার বা

প্রাণদণ্ড দিবার কথা যে আইনে থাকিবে সে আইন সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার এক্তিয়ার আদালতের নাই। প্রথমে এই ধারাটি মুসবিদা করিবার সময় Procedure established by law শব্দটির পরিবর্তে আমেরিকার সংবিধানে প্রযুক্ত Due Process of law শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট Due Process of law শব্দটি বিভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের সংবিধানের রচয়িতাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি উহা গ্রহণ করেন নাই। উহা গ্রহণ করিলে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও প্রাণদণ্ড বিষয়ক আইন কতকটা যুক্তিসঙ্গত তাহা বিচার করিবার অধিকার পাইতেন বলিয়া মনে হয়।

হেবিয়াস কর্পাস আইন

কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখিলে তাঁহাকে যতশীঘ্র সম্ভব জানাইতে হইবে যে কি কারণে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে তাঁহার পছন্দমত আইন ব্যবসায়ীর পরামর্শ ও সাহায্য লইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়া কাহাকেও চব্বিশ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা যাইবে না। এই নিয়মের কিন্তু অনেকগুলি ব্যতিক্রম আছে। ইহা কোন শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীর বেলায় অথবা নিবর্তনমূলক আটক আইনে যাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহার বেলায় প্রযুক্ত হইবে না।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বলা হয় যে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার চেয়ে রোগ যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে সেই উপায় অবলম্বন করাই ভাল (Prevention is better than cure)। কিন্তু এই নীতির অনুসরণ করিয়া বলা যায় না যে কেহ অপরাধ করিলে তাহাকে দণ্ড দেওয়ার চেয়ে সে যাহাতে অপরাধ করিতে না পারে সেই রকম ব্যবস্থা করাই ভাল।

নিবর্তনমূলক আইন

এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কাজ করিলে কোন ব্যক্তিরই কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। সরকারী শাসকগণ যাহাকে যখন সন্দেহ করিবেন তাহাকে কেবলমাত্র সন্দেহের বশে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। ভারতের সংবিধানে Prevention Detention বা নিবর্তন মূলক আটক করিবার ব্যবস্থা কয়েকটি গুরুতর কারণে করা হইয়াছে। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে সংসদ দেশ রক্ষার জন্য, পররাষ্ট্র নীতি ও দেশের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কারণের জন্য নিবর্তনমূলক

আটক বিষয়ক আইন পাস করিতে পারেন। উপরন্তু সংসদ এবং রাজ্যের আইন-সভা সমূহ কোন আঙ্গিক রাজ্যের নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, যাতায়াত ও সংবাদাদি প্রেরণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঐ প্রকার আইন পাস করিতে পারেন। সাধারণতঃ কোন ব্যক্তিকে ঐ আইন বলে এক সঙ্গে তিন মাসের বেশি আটক রাখা যায় না। যদি তিন মাসের চেয়ে বেশি সময়ের জন্য কাহাকেও আটক রাখিতে হয় তাহা হইলে হাইকোর্টের বিচারপতির যোগ্যতাসম্পন্ন তিনজন ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত এক পরামর্শ সমিতির সম্মতি প্রয়োজন হয়। ঐ সমিতি যদি রায় দেন যে আটকের উপযুক্ত কারণ নাই, তাহা হইলে বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সংসদ এমন আইন পাস করিতে পারেন যাহাতে প্রয়োজন হইলে পরামর্শ সমিতিকে জিজ্ঞাসা না করিয়াও কাহাকেও তিন মাসের বেশিও আটক রাখা যায়। কি কারণে কাহাকে আটক রাখা হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ জানাইয়া দেওয়া হয়, তবে কর্তৃপক্ষ যেখানে মনে করিবেন যে ঐ কারণ জানানো জনস্বার্থের বিরোধী সেখানে সব কথা খুলিয়া না বলিতে পারেন। কেহ ঐ ধরনের মামলায় বিচারপ্রার্থী হইলে সুপ্রিম কোর্ট শুধু দেখিবেন যে কারণটি অপ্রাসঙ্গিক বা অনির্দিষ্ট কিনা, ঐ কারণ যথার্থ কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে শিবনলাল বনাম উত্তর প্রদেশ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেন যে আটক করিবার কারণস্বরূপ যে ঘটনার উল্লেখ করা হয় তাহা সত্য কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকার আদালতের নাই। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ অনেকস্থলে বলিয়াছেন যে নিবর্তনমূলক আটক গণতন্ত্র বিরোধী এবং শান্তির সময়ে কোন গণতান্ত্রিক দেশে ইহার প্রচলন নাই। কোন দেশের সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটকের সমর্থনসূচক উল্লেখ করা হয় নাই।

সরকারের পক্ষ হইতে বলা হয় যে নিবর্তনমূলক আটকের প্রয়োগ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রায় এগার হাজার ব্যক্তিকে ঐভাবে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল ; কিন্তু ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মাত্র ২০৫ জন আটক ছিলেন ; তাহার মধ্যে পাঞ্জাবেরই শতাধিক ব্যক্তি ছিলেন।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation) : সংবিধানে (২৩ ধারা) মানুষ লইয়া ব্যবসা করা এবং বেগার নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোন কোন দুষ্ট লোক ছেলেমেয়েকে চুরি করিয়া বিক্রয় করে। কোথাও কোথাও অসহায় নারীদিগকে চালান দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে অসৎ কার্যে নিয়োজিত

করিয়া তাহাদের উপার্জিত অর্থে ভাগ বসানো হয়। এই ধরনের কাজ নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও সরকার উহা একেবারে বন্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। পূর্বে জমিদারেরা তাঁহাদের গরিব প্রজাদের দ্বারা বিনা পয়সায় কাজ করাইয়া লইতেন। উহাকে বেগার বলে। আজকাল উহা উঠিয়া গিয়াছে। তবে সরকার সাধারণের হিতকর কোন কার্যের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু উহা লইবার সময় কাহাকেও জাতি, শ্রেণী, ধর্ম প্রভৃতির জন্য রেহাই দেওয়া হইবে না, সকলের প্রতি একই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

বেগার দেওয়া বন্ধ

আর একটি ধারায় (২৪) বলা হইয়াছে যে চৌদ্দবৎসরের কম বয়স্ক কোন বালকবালিকাকে কোন কারখানায়, খণিতে বা অন্য কোন বিপদজনক কাজে নিযুক্ত করা চলিবে না। এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের খণি আইনে পনের বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েকে খণিতে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অল্প বয়সের ছেলেমেয়েকে কাজে নিযুক্ত করা চলিবে না

ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা (Right to Freedon of Religion): ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, যুরথস্ত্র মতাবলম্বী পার্শি, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বাস করেন। এই সব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে শান্তি ও মৈত্রী থাকে সেই জন্য সংবিধানে ভারতীয় রাষ্ট্রকে ধর্ম নিরপেক্ষ বলা হইয়াছে। সরকার কোন ধর্মকে বিশেষ কোন সুবিধা দিবেন না; প্রত্যেক ধর্মের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন। ইংলণ্ডে যেমন Anglican Church কে সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে রক্ষা করা হয় কিংবা পাকিস্তানে যেমন ইসলামকে সরকারী ধর্মরূপে ঘোষণা করা হইয়াছে ভারতবর্ষে সেরূপ কোন ধর্মবিশেষকে রাষ্ট্র কর্তৃক পোষণ করিবার ব্যবস্থা নাই। কোন ধর্মকেই ভারতের সরকারী ধর্ম বলা চলে না। কোন ধর্মের প্রচার বা প্রতিপালনের জন্য কোন নাগরিকের নিকট হইতে কোন প্রকার কর লওয়া হইবে না। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে সরকারী খরচে চলে সেখানে কোন ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া চলে না। কোন ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত কোন বিদ্যালয়ে যদি ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় এবং ঐ বিদ্যালয়ে যদি সরকার হইতে স্বীকৃতি বা সাহায্য পায় তাহা হইলে সেখানে যাহারা পড়িবে

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র

তাহাদের মধ্যে কাহাকেও তাহার বা তাহার অভিভাবকবর্গের বিনা সম্মতিতে ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে যে কোন ধর্ম গ্রহণ করিতে, অনুষ্ঠান করিতে ও প্রচার করিতে পারিবেন। এদেশে খৃস্ট্রীয় মিশনারীরা ধর্ম প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐ স্বাধীনতা সংবিধান কর্তৃক অব্যাহত রহিয়াছে। ধর্ম অনুষ্ঠানের নামে কিন্তু কেহ জনশৃঙ্খলা, সুনীতি ও স্বাস্থ্যের হানিকর কিছু করিতে পারিবেন না। ধর্মের নামে কেহ নরবলি দিতে পারেন না, শ্লীলতাহানিকর কোন কার্য করিতে পারেন না এবং কোন স্থানকে নোংরা করিতে পারেন না। ধর্মের দোহাই দিয়া কেহ টাকা লইতে অস্বীকার করিতে পারেন না। কোন সমাজসংস্কারমূলক ব্যবস্থাকে ধর্মের নামে অমান্য করা চলিবে না। আইন করিয়া হিন্দুদের মধ্যে একাধিক বিবাহ নিষেধ করা হইয়াছে। সেই জন্য কোন হিন্দু বলিতে পারিবেন না যে তাঁহার প্রথমা পত্নীর কোন পুত্রসন্তান হয় নাই বলিয়া তিনি আবার ধর্মরক্ষার্থ দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিবেন। ঐরূপ ক্ষেত্রে তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা

ধর্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা কেবলমাত্র ব্যক্তিকেই দেওয়া হয় নাই, প্রত্যেক ধর্মের সংঘ ও সমিতিকেও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা উহার ধর্মবিষয়ক কার্যাদির নিজেরাই তত্ত্বাবধান করিবেন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও অধিকার করিতে পারিবেন। এই ভাবে ধর্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়াও ভারতীয় রাষ্ট্র প্রত্যেককে ধর্ম বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার: ভারতবর্ষে চৌদ্দটি ভাষাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও আরও অনেকগুলি ভাষা আছে। বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রত্যেক ভাষা ও সংস্কৃতি যাহাতে সুরক্ষিত ও বিকশিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে করা হইয়াছে। ভারতের যে কোন স্থানের যে কোন ব্যক্তি তাহার ব্যবহৃত ভাষা, লিপি ও নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকারী (২৯ ধারা)। ধর্ম, জাতি বা ভাষার দরুণ কাহাকেও কোন

ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি হওয়া বন্ধ করা যাইবে না এবং কোন প্রতিষ্ঠানকে সরকারী অর্থ সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না।

সংস্কৃতি-সম্পর্কিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি যাহাতে সরকারী চাপে বিনিষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা এখানে করা হইয়াছে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই ধারায় ধর্ম, জাতি, ভাষা ছাড়া অন্যান্য কারণে ব্যক্তি বিশেষকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা বন্ধ করা যাইতে পারে। উপযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা না থাকিলে কেহ কলেজে ভর্তি হইতে পারেন না। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য, কারিগরী যোগ্যতা, হানিকর কোন সমিতির সহিত সংশ্রবের দরুণ যে কোন ব্যক্তিকে ভর্তি করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা আলিগড়ের মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই ভর্তি হইবার অধিকার আছে। বোম্বাইয়ের সরকার ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দী ভাষা প্রচারের জন্য নিয়ম করিয়াছিলেন যে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় এমন প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং এশিয়া-বহির্ভূ, কোন জাতির ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর কাহাকেও ভর্তি করা চলিবে না। বোম্বাইয়ের নাসিক জেলার দেওলালি নামক স্থানের বার্ণেস হাই স্কুল ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইংরাজীতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন। উহা Education Society of Bombay কর্তৃক পরিচালিত হইত এবং সরকারী সাহায্য পাইত। অনেক ভারতীয় অভিভাবক তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিকে ঐ বিদ্যালয়ে পড়াইতেন। কিন্তু ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে বিদ্যালয়েরও খুব ক্ষতি হইতে লাগিল। তাই উহার পরিচালক Education Society হাইকোর্টের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। হাই কোর্ট সরকারের আদেশ নাকচ করিয়া দিলে বোম্বাই সরকার সুপ্রিম কোর্টের নিকট আপিল করিলেন। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেন যে ঐ আদেশ নাগরিকের মৌলিক অধিকারের (ধারা ২৯।২) বিরুদ্ধে যায় সুতরাং উহা বে-আইনী। প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন বিদ্যালয়ে পড়িবার অধিকার আছে অথচ ঐ আদেশ বলে বার্ণেস্ বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ ও এশিয়া-বহির্ভূত জাতির সন্তানেরা ভর্তি হইতে পারে বলা হইয়াছে।

সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি

শিক্ষালাভ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য

ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বর্তমানে আছে তাহাদের প্রত্যেকের পছন্দমত নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিবার অধিকার আছে। সরকারী সাহায্য বণ্টন করিবার সময় এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করা চলিবেনা (ধারা ৩০)। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কেরালার সরকার খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের নানাবিধ অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া Kerala Education Bill পাস করাইয়াছিলেন। উহা যখন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইল তখন তিনি সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ চাহিলেন। সুপ্রিম কোর্টের অধিকাংশ বিচারক বলিলেন যে উহাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজেদের পছন্দমত বিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে, সুতরাং উহা অবৈধ।

সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ

সম্পত্তির অধিকার: ভারতীয় সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার লইয়া দুই ধরনের কথা আছে। ১৯ ধারায় ধনতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জন, অধিকার ও হস্তান্তরের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু নির্দেশক নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য যখন সরকার জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া ধনসম্পত্তির অধিকারে সমতা স্থাপনে অগ্রসর হইলেন তখন কায়েমী স্বার্থের নিকট হইতে তাঁহারা প্রচুর বাধা পাইতে লাগিলেন। সেই বাধা দূর করিবার জন্য একবার ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে, পুনরায় ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সংবিধান সংশোধন করিতে হইল। শেষোক্ত সংশোধনের ফলে ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই যে সরকার কাহারও সম্পত্তি অধিকার করিয়া যাহা কিছু ক্ষতিপূরণ বাবদ দিবেন তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে; ঐ সম্বন্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না। সেই জন্য সম্পত্তির অধিকারকে ভারতে একটি মৌলিক অধিকার বলা যায় কিনা সন্দেহ। কেন না যে অধিকার ভঙ্গ হইলে প্রতিকারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় না তাহাকে মৌলিক অধিকার বলা নিরর্থক।

সম্পত্তি অধিকার সম্বন্ধে ধনতন্ত্রের ও সমাজতান্ত্রিক নীতি

কোন অধিকারই অবাধ বা নিরাঙ্কুশ নহে। প্রত্যেক অধিকারই কোন না কোন বাধানিষেধের দ্বারা সীমিত। সম্পত্তির অধিকারকেও অবাধ মনে করিবার কোন ন্যায্য কারণ নাই। জনস্বার্থের সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক দেশের সরকারই ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি অর্জন, উপভোগ ও হস্তান্তরের উপর কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ

করিয়া থাকেন। অবশ্য উহা আইনের সাহায্য লইয়া করিতে হয়। শাসন-বিভাগের কর্মচারীদের খেয়ালখুসি মত নাগরিকদের সম্পত্তি ছিনাইয়া লওয়া চলে না। যেখানে জুয়াখেলা বে-আইনী সেখানে যদি কেহ কোন বাড়িতে জুয়া খেলে তাহা হইলে সাময়িকভাবে ঐ বাড়ি সরকার অধিকার করিয়া লইতে পারেন। কেহ যদি জরাজীর্ণ বাড়ী মেরামত না করিয়া তাহাতে ভাড়াটিয়া বসান তাহা হইলে জনস্বার্থের অনুরোধে সরকার ঐ বাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন। কেহ যদি তৈল বা ঘৃতে এমন ভেজাল মেশান যাহা ব্যবহার করিলে লোকের জীবন বিপন্ন হইতে পারে তাহা হইলে সরকার ভেজাল প্রতিরোধ আইনের বলে তাঁহার গুদামের সব তেল ও ঘির টিনগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারেন। এই গুলিকে পুলিশী ক্ষমতা বলে এবং সব দেশেই সরকার এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তা ছাড়া সরকারের যে কর স্থাপনের অধিকার আছে তাহা প্রয়োগ করিয়াও ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপভোগকে ব্যাহত করা হয়। কোন ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকারসূত্রে লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি পান তাহা হইলে সরকার আইন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পঁচিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা উত্তরাধিকার কর বাবদ লইতে পারেন। এইরূপ নানা প্রকার কর বসাইয়া প্রগতিশীল ধনতান্ত্রিকদেশগুলিও আর্থিক সাম্য আনিবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং কায়েমী স্বার্থের সমর্থকেরা যদি ধুয়া তুলেন যে ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি বিপন্ন, তাহা হইলে উহার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করিবার প্রয়োজন নাই।

সম্পত্তির অধিকার নিরঙ্কুশ হইতে পারে না

আমাদের সংবিধানে [১৯ (১) এফ ধারা] বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, অধিকার ও হস্তান্তরের অধিকার আছে। এখানে সম্পত্তি বলিতে শুধু জমিজমা, ঘরবাড়ি, খনি, কারখানা প্রভৃতি বুঝাইতেছে না; পেটেন্ট, কপি রাইট প্রভৃতি যাহা কিছু কেনাবেচা যায় তাহাও বুঝাইতেছে। কিন্তু সরকার জনস্বার্থের খাতিরে ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, চাষের জমির খাজনা হ্রাস করিতে পারেন, কর্জ দেওয়া টাকার সুদ ও আসলের পরিমাণ কম করিয়া দিতে পারেন, যৌথ কারবার অংশীদারদের অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া উহাতে উপযুক্ত ডিরেক্টরবর্গ নিযুক্ত করিতে পারেন; জমি যাহাতে টুকরা টুকরা ভাগে বিভক্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ভারতবর্ষে সম্পত্তি ছাড়িয়া যাঁহারা পাকিস্তানে চলিয়া

সম্পত্তির অধিকারের সীমা

গিয়াছেন তাঁহাদের সম্পত্তির উপর **Administration of Evacuee Property Act** অনুসারে বাধানিষেধ আরোপ করা অন্যায় নহে। ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে কোন বাড়ি খানাতাল্লাসি করিয়া সেখান হইতে দলিলপত্র লইয়া যাওয়াকেও সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া আদালত মনে করেন না।

সংবিধানে (৩১ ধারায়) বলা হইয়াছে যে আইনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু সার্বজনীন উদ্দেশ্যে (**public purpose**) কোন সম্পত্তি সরকার দখল করিতে পারেন, তবে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা চাই। ঐ ক্ষতিপূরণ যে নগদ টাকা দিয়াই করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কত হইবে বা কি নীতিতে উহা প্রদত্ত হইবে সে সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গণ্য হইবে, কোন আদালতে ঐ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা চলিবে না। সার্বজনীন উদ্দেশ্য কি তাহা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই। তবে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন, ভূসম্পর্কিত আইন সংশোধন, বেকার সমস্যার দূরীকরণ, সরকারী কর্মচারী বা মন্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা প্রভৃতিকে আদালত সার্বজনীন উদ্দেশ্যে বলিয়া ধরিয়াছেন। আইনের বলে কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া যদি রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর না করা হয় তবে উহাকে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পত্তি গ্রহণ বলা হইবে না। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সংসদে একটি বিলে যৌথকারবারের কারখানার জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসের অনেক সদস্যই ইহার প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বড় বড় কারখানার মালিকদের সুবিধার খাতিরে জনসাধারণকে তাঁহাদের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে রাজী হইলেন না। কাজেই মন্ত্রীমহোদয় বিলটি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন।

সার্বজনীন উদ্দেশ্য ও ক্ষতিপূরণ

কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করিয়া বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের আইন সভা জমিদারি প্রথা লোপ করিলে জমিদারেরা আদালতের সাহায্যে ঐআইন বে-আইনী প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। পাটনা হাইকোর্ট রায় দিলেন যে ঐ আইন সংবিধানের ১৪ ধারায় উল্লিখিত সমতার অধিকার লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া উহা অসিদ্ধ। কিন্তু এলাহাবাদ ও নাগপুরের হাইকোর্ট

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের সংশোধনী

জমিদারি প্রথা বিলোপের আইন সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ বলিয়া রায় দিলেন। মামলা যখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন ছিল তখন অর্থাৎ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সংবিধান সংশোধন করিয়া বলা হইল যে রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ভূসম্পত্তির অধিকার অর্জন অথবা ঐরূপ কোন অধিকারের বিলোপ কিংবা পরিবর্তনের জন্য কোন আইন তৈয়ারি করিলে উহাকে মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া বাতিল করা হইবে না ("Not withstanding anything in the foregoing provisions of this part, no law providing for the acquisition by the State of any estate or of any right therein or for the extinguishment or modification of any such right shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this part.")

জমিদারি প্রথা বিলোপের পর কংগ্রেস জনহিতকর কারবারকে (জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি public utility undertakings) এবং খণিজ ও তৈল সম্পদকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার জন্য, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে, কোন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ভালো পরিচালনার জন্য কিংবা জনস্বার্থ নিয়োজিত করিবার জন্য সাময়িকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে আইন করিবার কথা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সংবিধানে উল্লখিত মৌলিক অধিকারের দোহাই দিয়া যাহাতে ঐ ধরনের আইন নাকচ করিয়া না দেওয়া হয় সেই জন্য ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সম্পত্তিঘটিত অধিকার বিষয়ক ধারাটির সংশোধন করা হইল। এই সংশোধনীতেই ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আদালতের এক্তিয়ার লোপ করা হইল। ইহাতে আরও বলা হইল যে নিম্নলিখিত বিষয়ে কোন আইনকে মৌলিক অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে বাতিল করা হইবে না—(১) জনস্বার্থে বা পরিচালনার উন্নতি বিধানের জন্য কোন সম্পত্তির সাময়িক পরিচালনাভার গ্রহণ কিংবা দুই বা ততোধিক কোম্পানীকে একত্রীকরণ (২) কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিরেক্টর, ম্যানেজার, এবং অংশীদারদের স্বত্বের বিলোপ বা পরিবর্তন (৩) খনি বা খনিজ তৈল প্রভৃতি সম্পর্কে চুক্তি বা লাইসেন্সের দ্বারা প্রদত্ত অধিকারসমূহের লোপ বা পরিবর্তন। কিন্তু এইসব সম্পর্কে কোন আইন পাস করিতে হইলে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা আবশ্যক।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের সংশোধনী

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে সরকার জমিদারি বিলোপের জন্য যেরূপ তৎপরতা দেখাইয়াছেন, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার জন্য সেরূপ দেখান নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও জীবন বীমা কোম্পানীগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐসব প্রতিষ্ঠানের অংশীদারেরা জমীদারদের অপেক্ষা অনেক বেশি উদার ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন।

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (The Right to constitutional Remedies) : সংবিধানে কেবলমাত্র কতকগুলি অধিকার ঘোষণা করিলেই চলে না ; নাগরিকেরা যাহাতে ঐ অধিকারগুলি নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারেন এবং উহার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিলে তাহার প্রতিকারের জন্য আদালতের আশ্রয় লইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সংবিধানে (৩২ ধারা) সেই ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে মৌলিক অধিকার বলবৎ করিবার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নিকট আবেদন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

সুপ্রিম কোর্টে এই সব অধিকার বলবৎ করিবার জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশ-গুলির মধ্যে যে কোনটি বা অন্যান্য নির্দেশ দিতে পারিবেন—(১) বন্দীকে আদালতের সমক্ষে উপস্থিত করা (Habeas Corpus) (২) চরম আদেশ (mandamus) (৩) প্রতিষেধ (Prohibition) (৪) অধিকার-পৃচ্ছা (Quo Warranto) (৫) উৎপ্রেষণ (Certiori)। যদি কোন ব্যক্তিকে অন্যায় বা আইনবহির্ভূত কারণে বন্দী করা হয় তাহা হইলে তাঁহাকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে হেবিয়াস্ কর্পাস্ নির্দেশ জারি করা হয়। কেবলমাত্র সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্ট ইহা জারি করিতে পারেন। যাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে তিনি অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি ইহার জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন। কিন্তু অন্য ব্যক্তি যখন ইহার জন্য প্রার্থনা করিবেন তখন বন্দীর বা তাহার আত্মীয়দের সম্মতি লওয়া দরকার—ইহাই সুপ্রিম কোর্টের রায় (বিদ্যা বর্মা বনাম শিব নারায়ণ—১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ)। হেবিয়াস্ কার্পাস্ নির্দেশ কেবল যে সরকারের বিরুদ্ধে জারি করা যায় তাহা নহে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ইহা দেওয়া যাইতে পারে। ইহা জারি হইলে বন্দীকে আদালতের সামনে উপস্থিত করিতে হয় এবং কি কারণে ঐ ব্যক্তিকে আটক রাখা হইয়াছে তাহা বলিতে হয়। আদালত যদি বোঝেন যে

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

হেবিয়াস্-কার্পাস্ জারি

আইন সঙ্গত কারণে বন্দী করা হয় নাই, তাহা হইলে বন্দীকে মুক্তি দিবার নির্দেশ দেন। আদালতে তখনই আটককারীকে শাস্তি দেন না। বন্দী যদি মুক্তি পাইবার পর তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করেন তাহা হইলে আদালত ঐ অভিযোগ বিচার করিয়া যথোপযুক্ত দণ্ড দেন।

লাতিন ভাষায় Mandamus শব্দটির অর্থ হইতেছে 'আমরা আদেশ করি'।

ম্যাণ্ডামাস

উচ্চতন কোন আদালত নিম্নতন আদালতকে, কোন সরকারী কর্মচারীকে অথবা কোন করপোরেশনকে আদেশ দিতে পারেন যে তাঁহাদের দায়িত্ব বা কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত কোন কাজ যেন তাঁহারা করেন। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ৩২ ধারা অনুসারে এবং হাইকোর্ট ২২৬ ধারা অনুসারে এই আদেশ দিতে পারেন। একজন কোন ব্যবসা করিবার জন্য বা গাড়ি চালাইবার জন্য লাইসেন্স প্রার্থনা করিলে তাঁহার লাইসেন্স পাইবার উপযোগী যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও লাইসেন্স না দেওয়া হইলে সে হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিমকোর্টের নিকট Mandamus বা পরমাদেশ প্রার্থনা করিতে পারে। কিন্তু প্রার্থনা করিলেই যে উহা দেওয়া হইবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

প্রতিষেধ বা Prohibition উচ্চতন আদালত কর্তৃক নিম্নতন আদালতের প্রতি প্রযুক্ত হয়। নিম্ন আদালত যদি এমন কোন বিষয় মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন

প্রতিষেধ

যাহা তাঁহার এক্তিয়ারের বাহিরে তাহা হইলে যাঁহার স্বার্থহানি হইতেছে তিনি উচ্চতন আদালতের নিকট প্রতিষেধের জন্য প্রার্থনা জানাইতে পারেন। উচ্চতন আদালত প্রতিষেধ জারি করিয়া নিম্নতন আদালতকে নিজের ঘোষাধিকার বা এক্তিয়ারের (jurisdiction) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারেন। শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা প্রয়োগ করা হয় না।

কোন মামলার প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিষেধ জারি করা হয়, কিন্তু নিম্ন আদালত যদি শুনানির পর রায় দিয়া ফেলেন তাহা হইলে প্রতিকারের জন্য উৎপ্রেষণ (certiorari) প্রার্থনা করিতে হয়। ঐ আদেশ জারি হইলে উক্ত রায় আর কার্যকরী হইতে পারে না। যে আদালতের যে ধরনের মামলা বিচার করিবার এক্তিয়ার নাই সেই আদালতের রায় ইহার দ্বারা

উৎপ্রেষণ

নাকচ হইয়া যায়। স্বাভাবিক ন্যায়ধর্ম লঙ্ঘিত হইলেও ইহার জন্য প্রার্থনা করা যায়।

অধিকার পৃচ্ছার বা quo warranto-র দ্বারা কোন ব্যক্তির কোন সরকারী পদ অধিকার করিবার যোগ্যতা আছে কিনা বিচার করিবার জন্য জারি করা হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে তাঁহার উপযুক্ত যোগ্যতা ও আইনসঙ্গত অধিকার আছে তাহা হইলে আদালত উহা জারি করেন না। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে একব্যক্তিকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানপরিষদে সভ্যরূপে মনোনীত করা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা হাইকোর্টের নিকট অধিকার পৃচ্ছা প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঐ মনোনীত সদস্য যখন তাঁহার নাম সরকারী গেজেটে মুদ্রিত হইয়াছে দেখাইলেন তখন হাইকোর্ট তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন এবং অধিকার পৃচ্ছা জারি করিলেন না। যেখানে কোন ব্যক্তির সরকারী পদগ্রহণের যোগ্যতা প্রমাণিত না হয় সেখানে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। বে-সরকারী পদ সম্পর্কে অধিকার-পৃচ্ছা জারি হইতে পারে না।

অধিকারপৃচ্ছা

এই সব আদেশ বা নির্দেশ দিবার অধিকার সুপ্রিমকোর্টের ন্যায় হাইকোর্টেরও আছে। সংসদ আইন করিয়া অন্য যে কোন আদালতকে তাঁহার নিজস্ব এলাকার মধ্যে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার দিতে পারেন। তবে এরূপ আইন এখন পর্যন্ত পাস করানো হয় নাই।

জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকার : রাষ্ট্রপতি যখন মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে আপৎ কালীন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন তখন নাগরিকদের অধিকাংশ মৌলিক অধিকারই ক্ষুণ্ন হয়। সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুসারে যখন জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় তখন ১৯ ধারায় বর্ণিত বাক্য ও মতের স্বাতন্ত্র্য, সংঘ সংগঠন, সভা করা বা মিছিল বাহির করা, অবাধে যাতায়াত করা ও বসবাস করা, সম্পত্তি অর্জন ও দখল করা এবং যে কোন ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি চালাইবার অধিকার আইনের দ্বারা কিংবা শাসনবিভাগীয় আদেশের দ্বারা সাময়িক ভাবে বিলোপ করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রপতিও আদেশ ঘোষণা করিয়া সাধারণ ভাবে সকল মৌলিক অধিকার মুলতুবি রাখিতে পারেন। যতদিন জরুরি অবস্থা থাকিবে ততদিন সুপ্রিমকোর্ট অথবা হাইকোর্টের মৌলিক অধিকার ভঙ্গের অভিযোগের প্রতিকার করা রাষ্ট্রপতির আদেশে স্থগিত থাকিতে পারে।

মৌলিক অধিকারের হানি

চীনা আক্রমণের ফলে যে জরুরি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে শাসন-বিভাগকে সংবাদপত্র, শিল্পের উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে মৌলিক অধিকারের স্বরূপ : পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে ভারতে মৌলিক অধিকারগুলি নানারূপে বাধানিষেধের দ্বারা ব্যাহত। ইংলণ্ড বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এত বেশি বাধানিষেধ দেখা যায় না। ঐ সব দেশে শান্তির সময়ে কোন নাগরিককে নিবর্তনমূলক আটকে বন্দী করা চলে না। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুব্বা রাও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতীয় সংবিধানে আইনসভার হাত হইতে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইবার কোন কার্যকরী উপায় নাই ("There is practically no fundamental right of liberty of person and life against legislative action")। সংবিধানের ২১ ধারায় আইন বিহিত পদ্ধতি ছাড়া কাহাকেও জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে না বলায় সংসদ ঐসম্বন্ধে যে আইন করিবেন বিচারালয়কে তাহাই নির্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট এরূপ আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারেন ; ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট তাহা পারেন না। সেইজন্য শ্রীযুক্ত সুব্বা রাওয়ের ঐ আক্ষেপ।

তিনি আরও বলেন যে নাগরিকের সম্পত্তির উপর অধিকারও আইনসভার হস্তক্ষেপ হইতে সুরক্ষিত নহে। সরকার কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়া যে কোন জমি অধিকার করিতে পারেন, কিন্তু যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা ন্যায্য নহে এই মর্মে আদালতে কোন অভিযোগ করা চলে না। সরকার কোন ব্যবসাবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া নাগরিকদের ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন অথবা তাহাদের ঐসব ব্যবসা করা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। এই ভাবে প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলি ও জীবনবীমা ছাড়া অন্যান্য বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকদের সম্পত্তি হইতে জাতীয় সম্পত্তি রূপে পরিণত হইতে পারে।

সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ ধারায় সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে যেখানেই তাঁহারা অবিচার দেখিতে পাইবেন সেইখানেই তাহার প্রতিকার করিবেন ; কিন্তু ঐ ক্ষমতাকে এমন ভাবে সীমিত করা হইয়াছে যে তাঁহারা কেবলমাত্র ছোটখাট দোষ সংশোধন করিতে পারেন, কিন্তু গুরুতর

ব্যাধির মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন না। (Articles 32 and 226 conferring extensive jurisdiction on the Supreme Court and the High Courts to reach injustice wherever it was found, was so limited by construction that they ceased to be effective instruments for eradicating super maladies, but only were useful as palliatives to correct superficial defects). কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভারত ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক অধিকার নাই বলিলেই চলে। এরূপক্ষেত্রে নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।

চতুর্থ অধ্যায়

ইউনিয়ন ও আঙ্গিক রাজ্যের মধ্যে সম্বন্ধ

আইন বিষয়ক ক্ষমতার বণ্টন: সংবিধানের দ্বারা কেন্দ্র ও আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতাকে বণ্টন করিয়া দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সংবিধানে ৯৭টি বিষয়কে ইউনিয়নের, ৬৬টি বিষয়কে আঙ্গিক রাজ্যের এবং ৪৭টি বিষয়কে উভয়েরই কর্তৃত্বে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসনবিধিকে অনুসরণ করিয়া এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিধিতে বলা হইয়াছিল যে, যেসব বিষয় রাজ্য কিংবা ইউনিয়ন কাহাকেও দেওয়া হয় নাই সেগুলি গবর্ণর জেনারেলের হাতে থাকিবে। এই নিয়মের পরিবর্তে ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে ঐরূপ অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary power) ইউনিয়নে বর্তিবে। ইউনিয়নের সংসদ কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির জন্যও আইন করিতে পারিবেন। তা'ছাড়া (১) কোন সন্ধি বা বৈদেশিক চুক্তি পূরণ করিবার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলেও ইউনিয়ন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। (২) দুই বা ততোধিক রাজ্য মিলিতভাবে অনুরোধ করিলে ইউনিয়ন কোন একটি রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে আইন করিয়া ঐসব রাজ্যে প্রয়োগ করিতে পারিবেন। অন্য কোন রাজ্যও ইচ্ছা করিলে ঐ বিষয়ে ইউনিয়নের তৈয়ারি আইন গ্রহণ করিতে পারেন। (৩) রাজ্য পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি এমন প্রস্তাব পাস করেন যে রাজ্য-তালিকাভুক্ত কোন বিষয় জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সংসদের হাতে আইন করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত তাহা হইলে ঐ বিষয়ে, একসঙ্গে একবৎসরকালের জন্য সংসদ আইন করিতে পারিবেন। (৪) ইহা ছাড়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষিত হইলে সংসদ রাজ্য-তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন করিতে পারিবেন। ক্ষমতা বণ্টন করা হইলেও এই চারটি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন করিতে পারেন।

অবশিষ্ট ক্ষমতা

ইউনিয়নের অন্যান্য বিশেষ ক্ষমতা

যে সকল বিষয় ইউনিয়নের হাতে দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—প্রতিরক্ষা ও তৎসম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপার, নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনী, অস্ত্রশস্ত্রাদি, আণবিক শক্তি, বৈদেশিক ও রাষ্ট্রনীতি, দূতাদি প্রেরণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, কেন্দ্রীয় গুপ্তবার্তা ও অনুসন্ধান বিভাগ, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি ও যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি স্থাপন, নাগরিকতা, বহিষ্কার, রেলপথ, সমুদ্রগামী জাহাজ, বিমান পথ, ডাক ও তারবিভাগ, টেলিফোন, বেতারবার্তা ও বেতারযন্ত্র, মুদ্রা ও নোট প্রচলন, বিদেশ হইতে ঋণগ্রহণ, রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক, বহির্বাণিজ্য, অন্তর্দেশীয় ব্যবসাবাণিজ্য, যৌথ কারবার গঠন, লটারি, ব্যাঙ্কিং, বীমা, ফটকা বাজার, পেটেণ্ট, কপিরাইট, একই প্রকার মাপ ও ওজন প্রবর্তন, শিল্প, খণি, খণিজতৈল প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ, মিউজিয়াম ও জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনা, পুরাতত্ত্ব বিভাগ, ভারতীয় জরিপ বিভাগ, লোক গণনা, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিসের কর্মচারী ও কমিসন, সংসদীয় অধিকার (Parliamentary privileges), সরকারী হিসাব পরীক্ষা, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট প্রভৃতি। কর ধার্য বিষয়ে আয়কর, বৈদেশিক জিনিস আমদানির ও রপ্তানির উপর কর, কর্পোরেশন ট্যাক্স, সম্পত্তি কর, টারমিনাল ট্যাক্স, সংবাদপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর ইত্যাদি ইউনিয়নকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যে সব বিষয়ে সমগ্র ভারতের স্বার্থ জড়িত এবং যাহাতে দেশের সর্বত্র একই নিয়মকানুন হওয়া প্রয়োজন সেগুলি ইউনিয়নের হাতে দেওয়া হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যদি বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা চালিত হইত কিংবা পৃথক্ পৃথক ব্যাঙ্কের আইন থাকিত তাহা হইলে ভারতীয় ঐক্য সংশাধিত হইতে পারিত না।

কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়

ইউনিয়নের হাতে প্রদত্ত বিষয়গুলির তুলনায় আঙ্গিকরাজ্যের অধিকারভুক্ত বিষয়সমূহের সংখ্যা এবং গুরুত্ব উভয়ই অল্প। যে সব বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পৃথক পৃথক আইন হইলে কোন ক্ষতি নাই, অথচ প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে আইন করিবার সুবিধা ঘটিবে সেইরকম বিষয় আঙ্গিক রাজ্যের হাতে দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও বৈচিত্র্যের উৎসাহ দেওয়াও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। রাজ্যের হাতে প্রদত্ত বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—শান্তিরক্ষা, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা, জেল, স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাজ্যের সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পাঠাগার ও যাদুঘর, কৃষি, পশুপালন, পূর্তবিভাগ, বন, মৎস্য উৎপাদন, মাদকদ্রব্য ব্যবহার, জল

সরবরাহ, জমির উপর অধিকার, শ্মশান ও কবর, হাটবাজার ও মেলা, মহাজনী ব্যবসা, থিয়েটার, জুয়াখেলা, স্থানীয় নির্বাচন, রাজ্যের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিসন, গুপ্তধন প্রভৃতি। রাজ্যের আয় হইতে পারে এরূপ বিষয়ের মধ্যে ভূমিরাজস্ব, কৃষিসম্পর্কিত আয়ের উপর কর, জমি ও ইমারতের উপর কর, চাষের জমির উত্তরাধিকারের উপর কর, মাদকদ্রব্যের উপর কর, কোন অঞ্চলে জিনিসপত্র প্রবেশ করিলে তাহার উপর কর, বিদ্যুৎশক্তির উপর কর, সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্রের উপর কর, সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ছাড়া অন্যপ্রকার বিজ্ঞাপনের উপর কর, গাড়ি, নৌকা ও জানোয়ারের উপর কর, পেশা ও উপজীবিকার উপর কর, মাথাপিছু কর, বিলাস দ্রব্যের উপর কর, স্থলপথে বা রাজ্যের নদীপথে বাহিত যাত্রী ও জিনিসপত্রের উপর কর ধার্য করিবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অধিকার সত্ত্বেও জনপ্রিয়তা হারাইবার ভয়ে কোন কোন রাজ্য সরকার সবগুলি বিষয়ে কর বসাইবার সুযোগ গ্রহণ করে নাই।

আঙ্গিক রাজ্যের এক্তিয়ারের তালিকা

কতকগুলি এমন বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে একই প্রকার আইন হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অপরিহার্য নহে। এই ধরনের বিষয়গুলি ইউনিয়ন ও আঙ্গিক রাজ্য উভয়েরই হাতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, চাষের জমি ছাড়া অন্য প্রকারের সম্পত্তির হস্তান্তর, চুক্তি, দেউলিয়া, ন্যাস ও ন্যাসী এবং দেওয়ানি কার্যবিধি, আদালতের অবমাননা, পেশাদার ভিক্ষুক, পাগল, খাদ্য-দ্রব্যের ভেজাল, ঔষধ ও বিষ, আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, শিল্প ও বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার, শ্রমিকসংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিকের উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা; আইন, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশা, জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কারখানা, বিদ্যুৎ, সংবাদপত্র, পুস্তক ও মুদ্রণযন্ত্র, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নিবর্তনমূলক আটক প্রভৃতি। যতক্ষণ পর্যন্ত না এইসব বিষয়ে সংসদ কোন আইন তৈয়ারি করিতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্য ইহাদের উপর যে কোন আইন পাস করিতে পারেন। কিন্তু সংসদ যখন আইন করিবেন তখন রাজ্যের প্রণীত আইনের স্থানে তাহাই গৃহীত হইবে। কিন্তু যদি কোন বিষয়ে কোন রাজ্য সেই বিষয়ে সংসদের আইন পাস হইবার পর আইন করিতে অগ্রসর হন এবং রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য

কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগপৎ ক্ষমতা

উহা পাঠাইয়া তাহাতে তাঁহার সম্মতিলাভ করেন তাহা হইলে ঐ আইন সংসদীয় আইনের উপর বলবৎ হইবে। রাজ্যকে এই অধিকার দেওয়ার ফলে কোন রাজ্য ইচ্ছা করিলে সংসদ অপেক্ষা অধিক প্রগতিশীল আইন পাস করিতে পারেন, যদি অবশ্য রাষ্ট্রপতি তাহাতে অনুমতি দেন।

অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানেও কতকগুলি বিষয়কে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চিক রাজ্যের ক্ষমতার অধীনে দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে যে ভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করা হইয়াছে নিশ্চয়। ঐরূপ না করিলে দেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির বাধা উপস্থিত হইত। আপলবির মতন সুপণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন যে মহামারী রাজ্যের সীমানার মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলে না। এক রাজ্যে কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিলে যদি সেই রাজ্য উহা নিরোধ করিবার জন্য সর্বপ্রকার প্রযত্ন না করেন তবে পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি একেবারে রাজ্যের এক্তিয়ারের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু পরিকল্পনার পূর্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাদ্য সরবরাহ। কৃষির উপরই খাদ্য সরবরাহ নির্ভর করে। কৃষিকে রাজ্যের হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলে কোন পরিকল্পনা সার্থক হইতে পারে কিনা বিবেচ্য।

কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু অন্যদিকে আবার ভারতবর্ষের মতন বিশাল দেশের সমগ্র ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রে ন্যস্ত করিলে এক জবরদস্ত কেন্দ্রীয় শক্তির উদ্ভবের আশঙ্কা আছে। মহাত্মা গান্ধী বারংবার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন তাই ভারতীয় ইউনিয়নের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা যাহাতে ন্যস্ত না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল।

ইউনিয়ন ও রাষ্ট্রের মধ্যে শাসন-সম্পর্কিত ক্ষমতা বণ্টন : সাধারণতঃ সংসদ যে সব বিষয়ে আইন তৈয়ারি করিবার অধিকার পাইয়াছেন সেই সব বিষয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা ভারত সরকারের হাতেই দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যে যাহাতে সংবিধান অনুসারে কার্য চলে তাহা দেখিবার ভারও ভারত সরকারের উপর (৩৫৫ ধারা)। ভারত সরকার প্রত্যেক রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

আভ্যন্তরীণ গোলযোগ (disturbance) হইতে রক্ষা করিতে বাধ্য। সন্ধি বা চুক্তি পালনের জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন তাহাও ইউনিয়ন সরকার করিবেন, রাজ্য সরকার সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিবেন না। রাজ্যের আইনসভার যে সব বিষয়ে আইন করিবার এক্তিয়ার আছে এবং সাধারণ ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ে সংসদ ও রাজ্য আইনসভা উভয়েই আইন করিতে পারেন সে বিষয়ের-প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যুগ্মতালিকাভুক্ত (Concurrent List) বিষয়ে সংসদ আইন পাস করিবার সময় যদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে উহা ইউনিয়ন সরকারের দ্বারা কার্যকরী হইবে তাহা হইলে রাজ্য সরকার উহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

ইউনিয়ন সরকার সংসদীয় আইন কার্যকরী করা বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও লক্ষ্য রাখেন যে রাজ্যসরকারের কোন কাজের বা নীতির দরুণ ইউনিয়ন সরকারের এক্তিয়ারের কোন ক্ষমতার ব্যবহার যাহাতে ব্যাহত না হয়। রাজ্যসরকার যদি ইউনিয়নের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিতে পারেন যে ঐ রাজ্যে সংবিধান অনুসারে শাসন চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্য তিনি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে উহার ক্ষমতা নিজের হাতে লইতে পারেন। এই শাস্তির ভয়ে রাজ্য সরকার ইউনিয়নের বশবর্তী হইয়া চলেন। রাজ্য সরকার যাহাতে জাতীয় প্রয়োজন এবং সামরিক কার্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট প্রভৃতি তৈয়ার ও সংরক্ষণ করেন তাহার জন্য ইউনিয়ন সরকার নির্দেশ দিবার অধিকারী। রাজ্যের মধ্য দিয়া যে রেল লাইন গিয়াছে তাহার নিরাপত্তা বিধান বিষয়েও ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেন। তপশিলী জন-জাতিদের কল্যাণমূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য, সংখ্যালঘুদের সন্তানদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা-দানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য ও হিন্দীভাষার উন্নতির জন্যও ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারেন। কোন রাজ্য সরকারের সম্মতি লইয়া রাষ্ট্রপতি ইউনিয়নের আয়ত্তের অন্তর্গত যে কোন বিষয়ে কার্যকরী করিবার ভার রাজ্য সরকারের উপর দিতে পারেন। আবার যে কোন রাজ্য সরকার ভারত সরকারের অনুমতি লইয়া নিজের এক্তিয়ারের কোন বিষয়ের প্রশাসনিক ভার ভারত সরকারের উপর দিতে পারেন। দুইটি রাজ্যের মধ্যে নদীর জল বণ্টন

কেন্দ্রের নির্দেশ

লইয়া বিবাদ মীমাংসার জন্য সংসদ আইন তৈয়ারি করিতে পারেন ; এইরূপ করিলে সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য কোন আদালতে ঐ বিবাদের আর কোন বিচার চলিবেনা, সংসদ এইরূপ আইন করিয়া দিতে পারেন।

নিখিল ভারতীয় প্রশাসনিক পদ গুলি (I. A. S., I. P. S প্রভৃতি) ভারতসরকারের অধীন। তা' ছাড়া সংসদ আইন করিয়া অন্যান্য বিষয়ের জন্যও অনুরূপ নিখিল ভারতীয় পদ সৃষ্টি করিতে পারেন। এই সব পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে ভারত সরকার রাজ্য সরকারের উপর বেশ কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।

নিখিল ভারতীয় চাকুরি

রাজ্য সরকারকে নিজের ইচ্ছা মত পরিচালিত করিবার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে ভারত সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যের জন্য অর্থসাহায্য (grants-in aid) প্রদান। সাধারণতঃ ঐরূপ সাহায্য দিবার সময় কতকগুলি সর্ত আরোপ করা হয়। উহার দ্বারা রাজ্য সরকারের খরচের উপর ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।

আর্থিক সহায়তা

কিন্তু রাজ্য সরকারের স্বতন্ত্র সত্তা সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্য সরকার তাঁহার নিজ নিজ এলাকার উন্নতি বিধানের জন্য স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বন করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা কোনবিষয়ে বেশি উদ্যোগী, কেহ বা কম। জুড়িগাড়ির একটি ঘোড়া যদি জোরে চলে আর একটি পিছনে পড়িয়া থাকে তাহা হইলে যেমন বিসদৃশ অবস্থা হয় তেমনি বিভিন্ন রাজ্য সরকারের তৎপরতার বৈষম্য ভারত সরকারের সামনে খুব কঠিন সমস্যা উপস্থিত করে। সকলে সমভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার নানাবিধ যোজনা প্রস্তুত করেন, তাঁহাদের নীতি ও উদ্দেশ্য কি তাহা জানাইয়া দেন এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মেলন আহ্বান করেন। যতদিন বিভিন্ন রাজ্যসরকার একই রাজনৈতিক দলভুক্ত রহিবেন ততদিন দলের চাপ দিয়া একই প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কতকটা সহজ রহিবে। কিন্তু ভারতসরকারের মন্ত্রিমণ্ডলী একদলভুক্ত এবং রাজ্যসরকারের মন্ত্রীরা অন্য দলভুক্ত হইলে পদে পদে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। অধ্যাপক পল আপলবি (Paul Appleby) বলেন —"No other large and important national government, I believe, is so dependent as India on theoretically subordinate but actually rather distinct units responsible to a different

সংঘর্ষের সম্ভাবনা

political control, for so much of the administration of what are recognized as national programs of great importance to the nation"। এদিকে কিন্তু উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দের ন্যায় অনেকেই অভিযোগ করেন যে ভারত সরকারের চাপে রাজ্য সরকারের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। এমন কি ভারত সরকারের মন্ত্রী শ্রী এম. এম. শাহও বলিয়াছেন, "The Centre is becoming a steam roller and the states appear to be in a pitiable position."

রাষ্ট্রপতি যখন ভারতের কোন অংশে আর্থিক সংকট ঘোষণা করেন, ভারত সরকার তখন আর্থিক ব্যাপারে যে কোনপ্রকার নির্দেশ দিতে পারেন এবং রাজ্য সরকার উহা মানিতে বাধ্য। ঐ সময়ে রাজ্যের আইনসভার অর্থসংক্রান্ত বিলগুলি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠাইতে হয়।

যুদ্ধের আশঙ্কায় বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ভয়ে যখন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় তখন রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে ভারত সরকার নির্দেশ দিতে পারেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি এককেন্দ্রিক শাসনে পরিবর্তিত হইতে পারে।

ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন: সংবিধানে ভারত সরকারের কার্যনির্বাহের জন্য কতকগুলি কর হইতে সংগৃহীত রাজস্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং কতকগুলি রাজস্ব রাজ্যসমূহের কাজ চালাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকারের উপর দেশ রক্ষার এবং দেশের আর্থিক উন্নতি-বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে বলিয়া যে সব কর হইতে মোটা আয় হয় সেগুলি ইউনিয়নকে দেওয়া হইয়াছে।(১) কৃষিকর্মের আয় ছাড়া সকল প্রকার আয়ের উপর

ইউনিয়নের আয়ের উৎস

কর ভারত সরকারকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ভারত সরকার উহার কিয়দংশ ফিনান্স কমিসনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্য সরকারকে দিয়া থাকেন। (২) যৌথ কারবারের আয়ের উপর যে কর বসান হয় তাহাকে করপোরেশন আয় বলে; উহা ভারত সরকারের প্রাপ্য। কোন কর হইতে কতটা আয় হয় বুঝাইবার জন্য আমরা ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের হিসাব (Accounts) হইতে উহার পরিমাণ দিতেছি। আয়কর হইতে ১৬৭ কোটি এবং করপোরেশন কর হইতে ১১১ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। (৩) ভারত সরকারের সবচেয়ে বড় আয়ের উপায় হইতেছে উৎপাদন কর (Excise Duties) কিন্তু মদ, আফিং, গাঁজা এবং অন্যা মাদকদ্রব্য-

দ্রব্যের উপর কর রাজ্যসরকারের প্রাপ্য। উৎপাদন কর হইতে ভারতসরকারের ৩১৬ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। (৪) বিদেশ হইতে যে সব জিনিসের আমদানির জন্য শুল্ক বসানো হয় (Customs duty) তাহাও ভারত সরকার পান। উহা হইতে ১৭০ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। (৫) রেলের ভাঁড়ার উপর কর বসাইয়া ভারত সরকার প্রায় ১৬ কোটি টাকা পাইয়াছিলেন কিন্তু প্রায় ১৪ কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে দিয়াছিলেন। (৬) সম্পত্তির উপর কর (Estate duty) ও (৭) ধনসম্পদের উপর কর (Taxes on wealth) ভারতসরকার পান; এই দুই কর হইতে যথাক্রমে ৩ কোটি ও ৮ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল। সম্পত্তির উপর করের আয় প্রায় সবটা রাষ্ট্রসমূহকে দেওয়া হয়। (৮) টাকশাল ও নোট ছাপার আয় ভারত সরকারের প্রাপ্য। উহা হইতে ৫৮ কোটি টাকা আয় এবং ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। (৯) ডাক ও তারবিভাগের উদ্বৃত্ত আয়ও ভারত সরকার পান। ১৯৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা হইতে পাঁচ কোটির অধিক আয় হইয়াছিল কিন্তু ক্রমে আয় কমিয়া আধ কোটির মতন দাঁড়াইয়াছে।

রাজ্য সরকারকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আয় প্রদত্ত হইয়াছে—ভূমি রাজস্ব, কৃষিকর্মের উপর আয়কর, চাষের জমির উত্তরাধিকারের উপর কর, কৃষির জমি সম্পর্কে সম্পত্তি কর, জমি ও ইমারতের উপর কর, খনিসম্পর্কিত অধিকারের উপর কর, মানুষের পান করিবার উপযোগী মদ্য, আফিং, গাঁজা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের উপর কর, কোন অঞ্চলে প্রবেশ করিবার জন্য জিনিসের উপর কর, বিদ্যুৎশক্তি বিক্রয় ও ভোগের উপর কর, সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য জিনিসের বেচাকেনার উপর কর (কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কোন বেচাকেনা হইলে সেই কর নহে), সংবাদপত্র ছাড়া অন্যত্র প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর কর, রাজ্যের ভিতরকার জল বা স্থলপথে বাহিত যাত্রী ও জিনিসের উপর কর, গাড়ির উপর কর, পেশা, চাকুরি ও ব্যবসার উপর কর, বিলাস দ্রব্যের উপর কর, থিয়েটার, সিনেমা, সার্কাস প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের উপর কর, জুয়া ও বাজি রাখার উপর কর, স্ট্যাম্প কর প্রভৃতি। যতগুলি বিষয়ের উপর কর বসাইবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হইয়াছে তত বিষয়ে রাজ্য সরকার কর বসান না। পশ্চিমবঙ্গের সরকার ১৯৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দের বাজেটে ভূমিরাজস্ব হইতে সাতকোটি আবগারী হইতে ৬ কোটি, স্ট্যাম্প হইতে ৭কোটি, বন হইতে দেড় কোটি, গাড়ির উপর কর হইতে ২ কোটি, এবং বিক্রয় কর হইতে ২১ কোটির উপর টাকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়

পাইবেন বলিয়া আশা করেন। এইসব ছাড়া তাঁহারা ভারত সরকার কর্তৃক ধার্য উৎপাদন কর হইতে ৭ কোটির উপর এবং আয়করের হিস্যা হিসাবে সাড়ে এগার কোটি টাকা পাইবেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর কর ধার্য করিবার অধিকার ভারতসরকারের কিন্তু উহা রাজ্য সরকার আদায় করিবেন এবং নিজেরা ভোগ করিবেন—চেক্, বীমাপত্র, হুণ্ডি, শেয়ার হস্তান্তর প্রভৃতির উপর কর, (কিন্তু চেকের উপর কোন কর নাই); মদ্য, অহিফেন, গঞ্জিকা প্রভৃতি দিয়া যে সব ঔষধ ও প্রসাধনদ্রব্য তৈয়ারি হয় তাহার উপর কর। ভারতসরকার নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর কর ধার্য করিয়া নিজেরাই উহা উশুল করিবেন, কিন্তু আয়ের সবটাই সংসদকৃত আইন অনুসারে রাজ্য সরকারকে বণ্টন করিয়া দিবেন—চাষের জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উপর কর ও সম্পত্তি কর, জলস্থল বা বিমানপথে বাহিত জিনিস ও যাত্রীর উপর স্থাপিত টার্মিনাল ট্যাক্স, রেলের ভাড়া ও মাশুলের উপর কর, হুণ্ডি ও ফটকা বাজারের উপর ষ্ট্যাম্প ডিউটি ছাড়া অন্য কর, সংবাদপত্র ও তাহার বিজ্ঞাপনের উপর কর। আয় কর ভারত সরকার আদায় করিবেন, কিন্তু উহার একাংশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুসারে রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে। রাষ্ট্রপতি অবশ্য ফিনান্স কমিসনের সুপারিশ বিবেচনা করিয়া ঐ নীতি নির্ধারণ করিবেন। রাজ্যসমূহের ১৯৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে মোট আয় ছিল ১৬৩৪ কোটি টাকা, তন্মধ্যে তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন ৮৬৭ কোটি টাকা। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে রাজ্য সরকারগুলি ভারত সরকারের সাহায্যের উপর কতটা নির্ভর করেন।

রাজ্য সরকারের অন্যান্য আয়

ফিনান্স কমিসন ও উহার সুপারিশঃ সংবিধানে লিখিত আছে যে সংবিধান বহাল করিবার দুই বৎসরের মধ্যে প্রথমটি ও পরে প্রতি পাঁচবৎসর বা তাহা অপেক্ষা কম সময় অন্তর রাষ্ট্রপতি এক-একটি ফিনান্স কমিসন নিয়োগ করিবেন। উহার একজন সভাপতি ও চারজন অন্য সদস্য থাকিবেন। সংসদ তাঁহাদের যোগ্যতা ও নিযুক্তি সম্বন্ধে আইন করিতে পারেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের শেষে প্রথম, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ও ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের শেষে তৃতীয় ফিনান্স কমিসন গঠিত হইয়াছিল। এই কমিসনের কার্য হইতেছে ইউনিয়ন ও রাজ্যসমূহের মধ্যে যে সব করের আয় বিভাজ্য তাহা বিভাগ করা এবং কে কতটা পাইবেন তাহা স্থির করা। তা'ছাড়া ভারতসরকারের

বিভিন্ন ফিনান্স কমিসন

তহবিল হইতে রাজ্যগুলিকে যে অর্থসাহায্য করা হয় তাহা কোন নীতিতে করা হইবে তাহা স্থির করা।

তৃতীয় ফিনান্স কমিসন ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে ১৯৬২ হইতে চার বৎসরের জন্য আয়করের দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হইবে; পূর্বে আয়করের ৬০ ভাগ মাত্র বণ্টন করা হইত। রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা আশিভাগ ও আদায়ের পরিমাণের অনুপাতে কুড়ি ভাগ দেওয়া হইবে। পূর্বে উহা জনসংখ্যার জন্য ৯০ ভাগ ও আদায়ের জন্য ১০ ভাগ মাত্র দেওয়া হইত। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা উত্তর প্রদেশ ও বিহার অপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু এখানকার আয়কর আদায়ের পরিমাণ ঐ দুই প্রদেশ অপেক্ষা বেশি। সেইজন্য এই নূতন নীতি অবলম্বনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ কিছু বেশি টাকা পাইবেন। দেশলাই, তামাক, চিনি, দালদা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, কফি, চা, কাগজ প্রভৃতির উৎপাদন শুল্কের (Excise duty) নেট আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ পূর্বে রাজ্য সরকারকে দেওয়া হইত; এখন শতকরা কুড়ি ভাগ মাত্র দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু উৎপাদন শুল্ক গ্রহণের জিনিসের সংখ্যা ৮ হইতে বাড়াইয়া ৩৫ করা হইয়াছে। নূতন জিনিসের মধ্যে আছে কেরাসিন তৈল, ডিজেল তৈল, রং, টায়ার, টিউব, সুতা ও রেশমতন্তু, পশম ও রেয়নের বস্ত্রাদি, সিমেণ্ট, লোহা, আলুমিনিয়ম, টিন, পাখা, সাইকেল প্রভৃতি। ইহার ফলে রাজ্য সরকারগুলি কিছু বেশি টাকা পাইবেন।

তৃতীয় ফিনান্স কমিসনের সুপারিশ

ভারত সরকার কর্তৃক অর্থসাহায্যের (grants-in-aid) পরিমাণ পূর্বে ছিল ৪০ কোটি টাকার কম, এখন উহা বাড়াইয়া ১১০ কোটি টাকার বেশি করা হইয়াছে। তন্মধ্যে অন্ধ্রকে নয় কোটি, আসামকে সওয়া পাঁচ কোটি, গুজরাতকে সওয়া চার কোটি, জম্মু ও কাশ্মীরকে দেড় কোটি, কেরালাকে সাড়ে পাঁচ কোটি, মধ্য প্রদেশকে সওয়া কোটি, মাদ্রাজকে তিন কোটি, মহীশূরকে সওয়া ছয় কোটি, উড়িষ্যাকে সাড়ে এগার কোটি ও রাজস্থানকে সাড়ে বার কোটি টাকা দেওয়া হইবে। এই বাবদ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি কিছুই পাইবেন না।

কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য

আয়করের ও উৎপাদন করের শতকরা কত ভাগ কোন রাজ্যকে দেওয়া হইবে তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে—

রাজ্য	আয়করের শতকরা	উৎপাদন করের শতকরা
অন্ধ্র প্রদেশ	৭.৭১	৮.২৩
আসাম	২.৪৪	৪.৭৩
বিহার	৯.৩৬	১১.৫৬
গুজরাত	৪.৭৮	৬.৪৫
জম্মু ও কাশ্মীর	০.৭০	২.০২
কেরালা	৩.৫৫	৫.৪৬
মধ্য প্রদেশ	৬.৪১	৮.৪৬
মাদ্রাজ	৮.১৩	৬.০৮
মহারাষ্ট্র	১৩.৪১	৫.৭৩
মহীশূর	৫.১৩	৫.৮২
উড়িষ্যা	৩.৪৪	৭.০৭
পাঞ্জাব	৪.৪৯	৬.৭১
রাজস্থান	৩.৯৭	৫.৯৩
উত্তর প্রদেশ	১৪.৪২	১০.৬৮
পশ্চিমবঙ্গ	১২.০৯	৫.০৭
	১০০.০০	১০০.০০

আয়কর ও উৎপাদন করের বণ্টন

আয়করের দরুণ যে টাকা আদায় হইয়াছিল তাহা হইতে ভারত সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে ২৭৮ কোটি, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা কালে ৩৭৪ কোটি এবং ১৯৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে ৯৩ কোটি টাকা আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে দিয়াছেন। ঐ সময়ে উৎপাদন কর বাবদ সংগৃহীত অর্থের মধ্যে যথাক্রমে ৪৬ কোটি, ১৫৩ কোটি ও ৪১ কোটি টাকা রাজ্যসমূহকে দেওয়া হইয়াছে।

আঞ্চলিক পরিষদ (Zonal Councils) : সংবিধানে (২৬৩ ধারা) লিখিত আছে যে রাষ্ট্রপতি যদি কোন সময়ে বিবেচনা করেন যে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে

বিবাদের কারণ অনুসন্ধান ও মিটমাট করিবার জন্য এবং তাঁহাদের সকলের স্বার্থ নিহিত আছে এমন বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করিবার জন্য একটি পরিষদ স্থাপন করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি তাহা করিবেন। ঠিক এই ধরনের পরিষদ স্থাপিত না হইলেও ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্ল্যানিং কমিসন একটি জাতীয় বিকাশ পরিষদ (National Development Council) স্থাপন করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ইহার সদস্যদের মধ্যে আছেন এবং প্রধানমন্ত্রী ইহার সভাপতি। ইহার কার্য হইতেছে জাতীয় বিকাশ সম্পর্কে আর্থিক ও সামাজিক প্রশ্নসমূহের আলোচনা করিয়া জাতীয় পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য সুপারিশ করা। ইউনিয়ন ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর করিবার জন্য ইহা স্থাপিত হয় নাই।

জাতীয় বিকাশপরিষদ

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন আইনের দ্বারা আঞ্চলিক পরিষদ নামে (Zonal Councils) পাঁচটি পরামর্শদলে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। উত্তর অঞ্চলের পরিষদের সদস্য হইতেছেন পাঞ্জাব, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ। মধ্য অঞ্চলের পরিষদ উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ লইয়া গঠিত পূর্ব অঞ্চলের পরিষদে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম এবং কেন্দ্রশাসিত মণিপুর ও ত্রিপুরা আছে। পশ্চিম অঞ্চলের পরিষদে গুজরাত ও মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ অঞ্চলের পরিষদে অন্ধ্র প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও কেরালা সদস্য আছেন।

পাঁচটি আঞ্চলিক পরিষদ

প্রত্যেক আঞ্চলিক পরিষদে সভাপতিত্ব করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন করিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে মনোনীত করিবেন। অঞ্চলভুক্ত প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী ও অন্য দুইজন করিয়া মন্ত্রী সদস্য হইবেন। ঐ মন্ত্রীদ্বয়কে রাজ্যপাল মনোনীত করিবেন। যেখানে কেন্দ্রশাসিত কোন অঞ্চল সদস্য আছেন। সেখানকার দুই জনের অনধিক সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করিবেন। সদস্যবৃন্দ ছাড়া পরিষদের কয়েকজন পরামর্শদাতা আছেন। প্রত্যেক রাজ্যের চিফ্ সেক্রেটারি, ডেভেলপমেণ্ট কমিসনার এবং প্ল্যানিং কমিসন দ্বারা মনোনীত একজন সদস্য পরামর্শ দান করিবেন।

উহার সংগঠন

আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য রাজ্যগুলির মধ্যে সীমান্ত লইয়া বিবাদ, আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যানবাহনের সমস্যা এবং নিজেদের যাহাতে সামূহিক স্বার্থ আছে এমন বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। কিন্তু ইঁহাদের কোন কার্যকরী ক্ষমতা নাই; ইঁহারা মাত্র পরামর্শ দিতে পারেন।

উহার কার্য

যাহা হউক এরূপ আলোচনার ফলে একদিকে যেমন সদস্য রাজ্যগুলির মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি দেখা যাইবে, অন্যদিকে তেমনি ভারত সরকারের মন্ত্রিমহোদয় ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করিয়া বিভিন্ন রাজ্যকে একই প্রকার নীতি অবলম্বন করিতে অনুপ্রাণিত করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিমণ্ডলী

ভারতে সংসদীয় শাসনপ্রণালী প্রবর্তন (Adoption of Parliamentary form of Government in India) : ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হইয়া ব্রিটেনের রাজার অধীনতা পরিত্যাগ করিল তখন রাষ্ট্রের মধ্যে এক ব্যক্তিকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করার প্রয়োজন দেখা দিল। আমরা ভারতবর্ষে সাধারণতন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠা করা স্থির করিলাম, কাজেই এইখানে কেহ রাজা হইতে পারেন না, বংশানুক্রমিক রাজার পরিবর্তে আমরা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক্ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি নামটি ব্যবহার করিলেও আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতন রাষ্ট্রপতিশাসিতপদ্ধতি (Presidential form of Government) অবলম্বন করিলাম না। তাহার প্রধান কারণ এই যে আমরা বহুদিন হইতে ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনপ্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। সেই ধরনের শাসন আমাদের দেশে স্থাপন করিবার জন্য আমরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সুরু হইতে আন্দোলন করিতেছিলাম।

সংসদীয় শাসনপ্রণালী গ্রহণ করিবার কারণ

তাই আমাদের সংবিধান রচনায় যাঁহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে আমাদের দেশে সংসদীয় শাসনবিধি স্থাপিত হইবে। ডাঃ আম্বেদকার ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে সংবিধানের খসড়া উপস্থিত করিবার সময় বলেন—"খসড়া সংবিধানে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধানরূপে যাঁহাকে স্থাপন করা হইল তাঁহাকে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বলা হইতেছে। শব্দটি দেখিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কথা মনে পড়ে। কিন্তু শুধু নামের সমতা ছাড়া আর আমেরিকার শাসনপদ্ধতির সহিত খসড়ার প্রস্তাবিত শাসন প্রণালীর কোন সাদৃশ্য নাই। আমেরিকার শাসনপ্রণালীকে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন বলে। খসড়া সংবিধানে যাহা প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা হইতেছে সংসদীয় শাসন-প্রথা। দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান।" ডাঃ আম্বেদকার আরও বলেন যে রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের শীর্ষে থাকিবেন বটে, কিন্তু তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হইবেন এবং সংবিধানে তাঁহাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে

তাহার সকলগুলিই তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে ব্যবহার করিবেন। (While the President is to be the head of the executive, he is to be guided by a Council of Ministers whose advice shall be binding upon him in all actions that he is supposed to take under the power given him by the Constitution.—Constituent Assembly Debates, vol vii, p 974).

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নবেম্বর Constituent Assembly-র সভাপতিরূপে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবিধানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলেন—"আমেরিকান আদর্শ কিংবা ব্রিটিশ আদর্শ গ্রহণ করিব সে সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম। ব্রিটেনে বংশানুক্রমিক রাজাকে সমস্ত ক্ষমতা ও সম্মানের উৎস বলা হয়, কিন্তু তিনি কার্যতঃ কোন ক্ষমতাই ভোগ করেন না। আইনসভা সমস্ত ক্ষমতার আধার এবং তাহার নিকট মন্ত্রীরা দায়িত্বশীল। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পদের সহিত নির্বাচিত আইনসভার ক্ষমতার সামঞ্জস্য বিধান করিতে যাইয়া আমরা মোটামুটি রাষ্ট্রপতিকে ব্রিটিশ রাজার তুল্য করিয়াছি। তিনি সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি হইবেন। ইহার পর আমরা মন্ত্রীদের কথায় আসি। তাঁহারা অবশ্য আইনসভার নিকট উত্তরদায়িত্বশীল এবং রাষ্ট্রপতিকে যে পরামর্শ দিবেন সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য। আমি যতদূর জানি সংবিধানে এমন কোন বিশেষ বিধি নাই যাহার দরুণ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্তু আশা করা যায় যে ইংলণ্ডে যেমন রাজা সব সময়েই মন্ত্রীদের পরামর্শমত কাজ করেন সেইরূপ প্রথাগত বিধি (Convention) এ দেশেও স্থাপিত হইবে।"

রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ রাজের তুল্য

কোন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি যদি মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে সংবিধান ভঙ্গের অপরাধে Impeach (মহাঅভিযোগ) করা যাইবে কিনা এই প্রশ্ন যখন একজন সদস্য Constituent Assembly-তে তুলিয়াছিলেন তখন ডাঃ আম্বেদকর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়াছিলেন—"সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং কে. সান্তানমের ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও অনুরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে সংবিধান রচয়িতাদের মত

সংবিধান রচনা করিবার সময় আমাদের সামনে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসনবিধি উপস্থিত ছিল। উহাতে গবর্ণর জেনারেলের যেমন আইন নাকচ, স্থগিত রাখা ও অনুমোদন করার ক্ষমতা ছিল রাষ্ট্রপতিতে তাহা আরোপ করিতে যাইয়া গোলযোগ বাধিয়াছে। একদিকে আমাদের সংবিধানের রচয়িতারা ভাবিতেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজার মতন মন্ত্রিমণ্ডলীর সকল পরামর্শ মানিয়া চলিবেন, কোন ক্ষেত্রে তাহা অমান্য করিবেন না, অন্যদিকে আবার গবর্ণর জেনারেলের মতন তাঁহাকে সংসদের কাছে পুনরায় বিবেচনার জন্য কোন বিল ফেরত পাঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ব্রিটেনে রাজার ঐরূপ ক্ষমতা নাই।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসন বিধির প্রভাব

মন্ত্রীদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া কোন আইন আজকাল কোন সংসদে পাস হওয়া অসম্ভব। মন্ত্রীদের নেতৃত্বে অথবা সহায়তায় যে বিল সংসদে পাস হইয়াছে তাহা যদি রাষ্ট্রপতি স্থগিত বা নাকচ করিতে পারেন তাহা হইলে কি করিয়া বলা যায় যে তাঁহার স্বাধীনভাবে কাজ করিবার কোন ক্ষমতা নাই; মন্ত্রীরা যাহা বলিবেন তাহাই তাঁহাকে করিতে হইবে। আয়ার এবং বর্মার সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে তথাকার আইনসভা হইতে যে আইন পাস হইবে রাষ্ট্রপতি তাহাই আইন বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য। আমাদের সংবিধানে সে ধরনের কোন কথা নাই। অন্যান্য বহুবিধ কারণের মধ্যে এই কারণে কোন কোন রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক মনে করেন যে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ রাজা বা রানীর ন্যায় কেবল নামে মাত্র রাষ্ট্রের মুখপাত্র নহেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে।

তাঁহাদের এই মত কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সমর্থন করেন না। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে রায় সাহেব রাম জয়য়া কাপুর এবং অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায়ের মধ্যে বলেন,—"ভারতীয় রাষ্ট্রপতির পদ ইংলণ্ডের রাজার অনুরূপ এবং ঐরূপ করাই সংবিধানের রচয়িতাদের অভিপ্রায় ছিল।" (**"The position of the Indian President is, and was really intended by the authors of the Constitution to be analogous to that of the Crown by the English Constitution."**)। ঐ সিদ্ধান্ত বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন —"ইংলণ্ডের মতন ভারতবর্ষেও শাসনবিভাগ আইনবিভাগের নিয়ন্ত্রণের অধীনে

কাজ করিতে বাধ্য; কিন্তু আইনবিভাগ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবেন? আমাদের সংবিধানের ৫৩ (১) ধারায় ইউনিয়নের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু ৭৫ ধারায় একটি মন্ত্রিমণ্ডলীর সাহায্য ও পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন বলা হইয়াছে। এইভাবে রাষ্ট্রপতিকে কেবল নামে মাত্র অথবা শাসনবিভাগের সাংবিধানিক প্রধানমাত্র করা হইয়াছে, যথার্থ শাসনক্ষমতা মন্ত্রীদের বা কেবিনেটের হাতে ন্যস্ত আছে (**"The President has thus been made a formal or the constitutional head of the executive and the real executive powers are vested in the Ministers or the Cabinet".**)।

সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত

সুপ্রিম কোর্টই সংবিধানের প্রকৃত ব্যাখ্যাকর্তা। সেইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা যে মতই পোষণ করুন না কেন রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ মানিতেই হইবে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে রাজ্যসভায় শ্রীযুক্ত ভূপেশ চন্দ্র গুপ্ত সংবিধান সংশোধন করিবার প্রস্তাব তুলিয়া স্পষ্টভাবে সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ মানিতে বাধ্য। কিন্তু সরকারী পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলা হয় যে এখনও রাষ্ট্রপতি ঐরূপ বাধ্য আছেন, সুতরাং সংশোধনের কোন প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ মন্ত্রিমণ্ডলী সাহায্য ও পরামর্শ (aid and advise) দিবার কথাটি কানাডার সংবিধান হইতে লওয়া হইয়াছে এবং কানাডায় সংসদীয় শাসন প্রচলিত আছে। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে শুধু পরামর্শ দানের কথা আছে। ঐ দুই রাষ্ট্রেও সংসদীয় শাসন প্রচলিত। সুতরাং রাষ্ট্রপতি অমুক কার্য করেন, অমুক আদেশ দেন বা অর্ডিনান্স জারি করেন বলিলে আমরা বুঝিব যে তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শক্রমে ঐরূপ করিয়াছেন।

কানাডার সংবিধানের প্রভাব

রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন: ভারতের রাষ্ট্রপতি সরাসরি ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন না, পরোক্ষভাবে ভোটারগণের দ্বারা নির্বাচিত ইউনিয়ন ও রাজ্যের আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এখন নামে না হইলেও কাজে প্রেসিডেন্ট প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন বলিয়া তাঁহার ক্ষমতা তত্রত্য কংগ্রেসের অপেক্ষা কম নহে। ফ্রান্সের পঞ্চম রিপাবলিকে রাষ্ট্রপতিকে

অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের শেষে জনভোট লইয়া স্থির করা হইয়াছে যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করা হইবে। ইহার ফলে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের সংবিধানের রচয়িতারা রাষ্ট্রপতিকে সংসদের অথবা মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখিতে চাহেন নাই বলিয়া তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নির্বাচকমণ্ডলী

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে সংসদের উভয় সদনের নির্বাচিত সদস্যেরা অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, মনোনীত সদস্যেরা পারেন না। তেমনি রাজ্যের বিধানসভাগুলির সদস্যোরা ভোট দিতে পারেন, কিন্তু বিধানপরিষদের সদস্যোরা ভোট দিতে পারেন না। নির্বাচকের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৩৬৯৭ ছিল। রাষ্ট্রপতি যদি কেবলমাত্র সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন তাহা হইলে তাঁহার গুরুত্ব হ্রাস পাইত। কেননা সংসদে যে দল সংখ্যাধিক সেই দল রাজ্যগুলিতে সংখ্যাধিক নাও হইতে পারে। সেইজন্য সমগ্র ভারতের মধ্যে যে দল প্রবল তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে গুপ্ত ব্যালটের সাহায্যে, সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা হইবে। আয়ারের সংবিধানেও ঐরূপ নিয়ম আছে। উহার ফলে রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে মোট ভোটসংখ্যার অর্ধেকের বেশি পাইতে হয়। ঐ পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথমভাগে (পৃঃ ৩৯১) বর্ণিত হইয়াছে। যতগুলি গ্রহণযোগ্য ভোট প্রদত্ত হইবে তাহাকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের

কত ভোট পাইলে নির্বাচিত হইবেন

সহিত এক যোগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে, সেই সংখ্যাকে কোটা (quota) বলে। উহা না পাইলে কেহ নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। প্রথমবার গুণিয়া যদি দেখা যায় যে কেহই কোটার উপযুক্ত ভোট পান নাই, তাহা হইলে যে প্রার্থী সবচেয়ে কমসংখ্যক "প্রথম পছন্দর" ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে বাদ দিয়া তাঁহাকে প্রদত্ত "দ্বিতীয় ও তৃতীয় পছন্দ" প্রভৃতি ভোট অন্যান্য প্রার্থীর মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। এই ভাবে যতক্ষণ না কোন প্রার্থী কোটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় না পৌছান ততক্ষণ পর্যন্ত গণনা চালাইতে হইবে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কোটা হইয়াছিল ২,৩,১,৫৭৮, কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৪,৫৯,৬৯৮ ভোট পাইয়া প্রথম গণনাতেই নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে যাহাতে বিভিন্ন রাজ্যের সদস্যাদের ভোটের মূল্যের তারতম্য না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে আসামের নব্বই লক্ষ লোক ১০৮ জন সদস্য এবং উত্তর প্রদেশে উহার সাতগুণ বেশি লোক মাত্র চারগুণ বেশি সদস্য অর্থাৎ ৪৩০ জন নির্বাচিত করেন। এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য সংবিধানে নিয়ম করা হইয়াছে যে বিধানসভার সদস্যসংখ্যা দিয়া রাজ্যের জনসংখ্যাকে ভাগ দিতে হইবে। ঐ ভাগফলকে অবার হাজার দিয়া ভাগ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে তাহাই প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটের সংখ্যা বলিয়া ধরা হইবে। ধরা যাক, উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ছিল ৬৩, ২১৫, ৭৪২ এবং বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ছিল ৪৩০। তাহা হইলে প্রত্যেক সদস্যের ভোটের সংখ্যা হইবে

বিভিন্ন নিবাচকের ভোটের ক্ষমতা

$$\frac{৬৩, ২১৫, ৭৪২}{৪৩০ \times ১০০০} = ১৪৭$$

ভগ্নাংশে পাঁচশতের কমকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং উহার বেশিকে এক বলিয়া ধরিতে হইবে।

এইরূপ নিয়মানুসারে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতির যে নির্বাচন হইয়াছিল তাহাতে অন্ধ্রপ্রদেশের বিধানসভার প্রত্যেক সদস্যের ভোটের সংখ্যা হইয়াছিল ১০৪, আসামের ৮৪, বিহারের ১২২, বোম্বাইয়ের ১২২, কেরালার ১০৮, মধ্যপ্রদেশের ৯১, মাদ্রাজের ১৪৬, মহীশূরের ৯৩, উড়িষ্যার ১০৫, পাঞ্জাবের ১০৫ রাজস্থানের ৯১, উত্তর প্রদেশের ১৪৭, পশ্চিম বঙ্গের ১০৪ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ৫৯।

নির্বাচকদের ভোটের সংখ্যা

সংসদের প্রত্যেক সদস্যের ভোটের সংখ্যা হইয়াছিল ৪৯৬। বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যসংখ্যাকে সংসদের উভয় সদনের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যাদ্বারা ভাগ দিয়া এই সংখ্যায় উপনীত হওয়া গিয়াছিল। এরূপ করার উদ্দেশ্য হইতেছে রাজ্যসমূহের সমষ্টিগত ভোটের এবং ইউনিয়নের সংসদের ভোটের মূল্য বা সংখ্যা যাহাতে সমান হয়। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ইউনিয়নের যতটা হাত আছে রাজ্যগুলিরও ততটা হাত আছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ এই ভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু যতদিন তাঁহার উত্তরাধিকারী পদগ্রহণ না করেন ততদিন তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন।

কার্যকাল

সংবিধানে (৫৭ ধারা) বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু তিনি একবার, দুইবার বা ততোধিকবার নির্বাচিত হইতে পারেন সে কথা লেখা নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দুইবারের পর আর নির্বাচনপ্রার্থী হন নাই। ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্রপতি যে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের মতন চতুর্থবার নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন না তাহা বলা যায় না। সংসদে একজন বে-সরকারী সদস্য একটি বিল উপস্থিত করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে দুইবারের বেশি কেহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে এ বিষয়ে কোন বাঁধাধরা নিয়ম করা উচিত নহে, তাই ঐ বিল প্রত্যাহার করা হয়।

রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীর জন্য মাত্র তিনটি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। তাঁহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে, তাঁহার বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই এবং তাঁহার লোকসভায় নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।

পদের যোগ্যতা

তিনি ভারত সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের বা তদধীন কোন স্থানীয় বা অন্য প্রতিষ্ঠানের অধীনে কোন চাকুরিতে নিযুক্ত হইলে চলিবে না। তবে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও মন্ত্রীর বা উপমন্ত্রীর পদকে চাকুরির মধ্যে ধরা হইবে না; অর্থাৎ ঐ সব পদে যিনি নিযুক্ত আছেন তিনি রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি সংসদের বা রাজ্যের কোন আইনসভার সদস্য হইবেন না, যদি হন তাহা হইলে যে দিন তিনি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিবেন সেই দিন হইতে ঐ সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন ধরিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি অন্য কোন লাভজনক পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

রাষ্ট্রপতি মাসিক দশহাজার টাকা করিয়া বেতন পান। ভারত যখন ডোমিনিয়ন হইয়াছিল, তখন বড়লাট যে সব ভাতা ইত্যাদি পাইতেন তাহা তিনি ভোগ করেন। তাঁহার কার্যকালের মধ্যে তাঁহার বেতন ও ভাতা কম করা চলে না। আমাদের প্রাক্তন ও

বেতনাদি

বর্তমান রাষ্ট্রপতি মাসিক সাড়ে সাত হাজার টাকা সরকারী কোষে দান করেন ও প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় মাত্র আড়াই হাজার টাকা বেতন স্বরূপ গ্রহণ করেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে মাসিক একহাজার টাকা পেন্সন ও এক হাজার টাকা তাঁহার

অফিসের খরচা বাবদ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি-ভবন তৈয়ারি করিতে দেড় কোটি টাকা ও বার বৎসর সময় লাগিয়াছিল। উহাতে ৩৩০ একর জমি আছে এবং উহার সুপ্রসিদ্ধ বাগানটি ১২ একর জমির উপর অবস্থিত।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার পর যেদিন পদ গ্রহণ করেন সেদিন সংসদগৃহের মধ্যবর্তী হলঘরে একটি অনুষ্ঠানে বড় বড় সামরিক, বে-সামরিক ও বিচারবিভাগের পদস্থ ব্যক্তিদের সমক্ষে ভারতের প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করান—

শপথ গ্রহণ

"আমি…অমুক…ভগবানের নাম লইয়া শপথ করিতেছি যে আমি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদের কার্য বিশ্বস্তভাবে সম্পাদন করিব এবং আমার যথাশক্তি সংবিধান ও আইনরক্ষা ও সংরক্ষণ করিব এবং আমি ভারতের জনসমূহের কার্যে ও কল্যাণের জন্য নিজেকে নিযুক্ত রাখিব।" তিনি শপথ লইতে অনিচ্ছুক হইলে আনুষ্ঠানিকরূপে স্বীকার করিতে পারেন। তাঁহার শপথ গ্রহণের পর তাঁহাকে ৩১ বার কামান দাগিয়া অভিবাদন জানানো হয়। তারপর তিনি একটি ঘোষণা করেন যে তিনি নির্বাচিত হইয়া পদগ্রহণ করিলেন। ঐ ঘোষণা ভারত সরকারের ও আঙ্গিক রাজ্যের সকল মন্ত্রীর নিকট এবং সামরিক কেন্দ্রসমূহে প্রেরিত হয়।

রাষ্ট্রপতির পদ তিনভাবে শূন্য হইতে পারে। তিনি যে কোন সময়ে উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিত পদত্যাগপত্র দাখিল করিতে পারেন। উপ-রাষ্ট্রপতি আবার লোকসভার স্পীকার বা সভাপতিকে উহা জানান। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রপতিপদ শূন্য হয়। তৃতীয়তঃ সংবিধান অমান্য করিবার অপরাধে মহা-অভিযোগে অভিযুক্ত (Impeachment) ও দোষী প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারে।

পদ শূন্য হয় কি ভাবে

মহা-অভিযোগ আনিতে হইলে প্রথমে কোন সদনে অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ সদস্য সহি করিয়া চৌদ্দ দিন পূর্বে জানাইবেন যে তাঁহারা ঐ সদনের সমক্ষে মহা-অভিযোগ করিবার প্রস্তাব আনিবেন। যখন সদনে প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে তখন উহার সমগ্র সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে উহা পাস হওয়া দরকার। তারপর ঐ সদন অপর সদনের সমক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করিবেন। সেখানে বিচারের সময় রাষ্ট্রপতি নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন

ইমপিচমেণ্ট বা মহাঅভিযোগ

অথবা কোন ব্যবহারজীবী নিযুক্ত করিয়া পক্ষ সমর্থন করাইতে পারেন। ঐ সদন ইচ্ছা করিলে নিজেরা অভিযোগের বিচার না করিয়া কোন আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের উপর বিচারের ভার দিতে পারেন। কিন্তু বিচারের পর ঐ সদনে সদস্যদের ভোট লইয়া সিদ্ধান্তে পৌছানো প্রয়োজন। যদি সদনের সমগ্র সদস্য-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্রিটেনে হাউস অব কমন্স হাউস অব লর্ডসের সামনে মহা-অভিযোগ উপস্থিত করেন, কিন্তু ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাজ্যসভা অথবা লোকসভা প্রথমে অভিযোগ আনিতে পারেন এবং অন্য সদন তাহা বিচার করিতে পারেন। তবে মহা-অভিযোগের কথা শুধু ভয় দেখানোর জন্যই সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে মনে হয়। ইংলণ্ডে গত দুই শত বৎসরের অধিক কালের মধ্যে কেহ ঐভাবে অভিযুক্ত হন নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে একজন মাত্র অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও একটি ভোটে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের কোন ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতি যদি কোন দিন মহাঅভিযোগের দায়ে পড়েন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইবে না; কেননা সংসদের যে কোন সদনের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট জোগাড় করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব না হইতে পারে।

উপ-রাষ্ট্রপতিঃ রাষ্ট্রপতির মতন উপ-রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং একাধিক বার নির্বাচিত হইতে পারেন। তবে রাষ্ট্রপতি যেমন সংসদের এবং রাজ্যের আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন, উপরাষ্ট্রপতি সেরূপভাবে নির্বাচিত হন না। কেবলমাত্র সংসদের সদস্যরাই গোপন ব্যালেট দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রথায় তাহাকে নির্বাচিত করেন।

নির্বাচনের পদ্ধতি

রাজ্যসভার মনোনীত সদস্যরাও তাঁহার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। সংবিধানে (৬৬ ধারা) লিখিত ছিল যে উভয় সদনের সম্মিলিত এক অধিবেশন করিয়া উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করিবেন। কিন্তু ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের একাদশ সংশোধনীর দ্বারা সম্মিলিত অধিবেশন করিবার নিয়ম রদ করা হইয়াছে। দুই সদনে পৃথক পৃথক রূপে ভোট লইয়া তাঁহাকে নির্বাচন করা যাইতে পারে।

৩৫ বৎসরের অধিক বয়সের যে কোন নাগরিক উপ-রাষ্ট্রপতির পদে প্রার্থী হইতে পারেন, তবে তাঁহার রাজ্যসভার সদস্য হইবার অনুরূপ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। তিনি সংসদের কোন সদনের অথবা কোন রাজ্যের আইনসভার

সদস্য থাকিতে পারিবেন না। যদি তিনি পূর্বে সদস্য থাকেন তাহা হইলে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ যেদিন হইতে গ্রহণ করিবেন সেইদিন হইতে ঐ সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন ধরিতে হইবে। উপরাষ্ট্রপতি পদগ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট সংবিধানের রক্ষার জন্য শপথ বা প্রতিজ্ঞা করেন। উপ-রাষ্ট্রপতির প্রধান কার্য হইল রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করা। তবে যখন রাষ্ট্রপতি অসুস্থ থাকেন বা অন্য কোন কারণে যখন রাষ্ট্রপতি নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিতে না পারেন তখন উপ-রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্য করেন। সেই সময়ে তিনি রাষ্ট্রপতির বেতন ও মর্যাদা লাভ করেন।

তাঁহার যোগ্যতা

উপ-রাষ্ট্রপতি যে কোন সময়ে লিখিত ভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করিতে পারেন। তাঁহাকে স্বপদ হইতে অপসারিত করিতে হইলে মহাঅভিযোগ আনিবার প্রয়োজন হয় না। রাজ্যসভায় অধিকাংশ সদস্যের সম্মতি লইয়া যদি অপসারণের প্রস্তাব পাস হয় এবং উহা যদি লোকসভায় অনুমোদিত হয় তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ পদ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

পদত্যাগ

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও প্রভাব: রাষ্ট্রপতির নামে শাসনসম্পর্কিত সকল কার্য নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু তিনি যে নিজে প্রত্যেক বিষয়ে নির্দেশ দেন তাহা নহে। তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডলীর সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে প্রায় সকল ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে হয়। মন্ত্রীরা সংসদের নিকট দায়িত্বশীল। রাষ্ট্রপতি যদি মন্ত্রীদের কথা না শুনিয়া কাজ করেন তাহা হইলে মন্ত্রীরা সংসদের নিকট কি করিয়া জবাবদিহি করিবেন? মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রত্যেকটি পরামর্শই রাষ্ট্রপতিকে মানিতে হইবে এমন কোন কথা স্পষ্ট করিয়া সংবিধানে লিখিত নাই, কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলী ছাড়া তাঁহার এক মুহূর্তও থাকিবার উপায় নাই এরূপ কথা সংবিধানে আছে (There shall be a Council of Ministers—৭৪ ধারা)। রাষ্ট্রপতি যদি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে তাঁহারা মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিবেন এবং যে হেতু মন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সেই হেতু রাষ্ট্রপতির পক্ষে অন্য মন্ত্রী পাওয়া কঠিন হইবে। যদি বা অল্প সময়ের জন্য তিনি কাহাকেও পান, তাঁহারা সংসদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অর্থের মঞ্জুরি জোগাড় করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে। এই সব কথা বিবেচনা করিয়া সাধারণতঃ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের বিনা পরামর্শে কোন

রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে প্রায় সকল কাজ করেন

কাজ করিতে অগ্রসর হইবেন না। তবে কোন বিষয়ে মন্ত্রীরা তাঁহাকে কি পরামর্শ দিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠাইলে উহা সুপ্রিম কোর্ট গ্রাহ্য করিবেন না।

কিন্তু কয়েকটি এমন বিষয় আছে যেখানে রাষ্ট্রপতির পক্ষে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করা কঠিন। রাষ্ট্রের প্রশাসন ও প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে খবর লইবার অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে। তিনি নিশ্চয়ই খবর চাহিবার পূর্বে মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করিবেন না যে তাঁহার খবর লওয়া উচিত কিনা। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন বিষয়ে কোন মন্ত্রী এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাইতে পারেন যে বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদে বিবেচিত হউক।

রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ বিনা কি কি করিতে পারেন ?

এইরূপ অনুরোধ জানাইবার পূর্বেও তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ লওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা তিনি ঐরূপ অনুরোধ করিয়া মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগেরই সুযোগ দিতেছেন। তৃতীয়তঃ যখন সংসদে কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে না কিংবা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া বিবাদবিসম্বাদ চলিবে তখন রাষ্ট্রপতি কাহারও পরামর্শ না লইয়া এমন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিবেন যিনি তাঁহার মতে লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন। এরূপ সংকট উপস্থিত হইলে তিনি এমন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ লইতে পারেন না যিনি লোক সভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারাইয়াছেন। ঐরূপ প্রধানমন্ত্রী যদি বলেন যে লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচন করা হউক তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি ঐরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিবেন কিনা বলা কঠিন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্রিটেনে রাজা বা রানী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া হাউস অব কমন্সের নূতন করিয়া নির্বাচন করিবার আদেশ দেন। মনে হয়, আমাদের দেশেও ঐরূপ প্রথার উদ্ভব হইবে। কিন্তু একবার নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী যদি আবার বলেন যে পুনরায় নির্বাচন হউক তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই তাঁহার কথামত লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিবেন না।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার এক বিরাট তালিকা দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে মনোনীত করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাদের কাজ করিবার নিয়মকানুন বাঁধিয়া দেন ও তাঁহাদের মধ্যে কাজ বণ্টন করিয়া দেন। তিনি রাজ্যপালগণকে, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিকে, এটর্ণি জেনারলকে,

কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলকে, ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরিত দূতগণকে (Ambassadors) ও অনুরূপ কার্যের জন্য Charged' affairs প্রভৃতি, তপশিলী জাতি, সংখ্যালঘুসম্প্রদায়, অনুন্নত সম্প্রদায় প্রভৃতির জন্য কমিসন ও ভাষাসম্বন্ধে কমিসন নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া নির্বাচন কমিসনের সদস্য, ফিনান্স কমিসনের সদস্য, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিসনের এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের পরিষদ (Inter-State Council) সদস্য ও সভাপতিকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এইসব উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিযুক্ত করিবার পত্রে তিনি স্বয়ং স্বাক্ষর করেন (by warrant under his hand and seal)। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য সকল কর্মচারীকেই রাষ্ট্রপতির নামে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাঁহাদের নিয়োগ-পত্রে তাঁহার সহি থাকে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছামত কাহাকেও নিযুক্ত করেন না। তিনি হয় মন্ত্রিপরিষদের না হয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীর কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শ মত নিযুক্ত করেন। রাজ্যপালকে নিযুক্ত করিবার পূর্বে যে রাজ্যে তাঁহাকে পাঠানো হইবে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয়। সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টে বিচারকদিগকে নিযুক্ত করার পূর্বে ভারতের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ চাওয়া হয়। অধিকাংশ প্রশাসনিক পদে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সুপারিশ অনুসারে লোক নিযুক্ত করা হয়।

নিযুক্তির অধিকার

সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা, প্রধান নির্বাচন কমিসনার ও অডিটর জেনারেল ছাড়া আর সকলেই রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা মত (pleasure) কালের জন্য নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে রাজ্যপালকে ডাকিয়া ফেরত আনিতে (recall) পারেন এবং এটর্নি জেনারেল ও বিশেষ কোন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করিতে পারেন। এধরনের ক্ষমতাও মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে তিনি প্রয়োগ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে এবং সমগ্র মন্ত্রিপরিষদকে বরখাস্ত করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না—কেননা এ বিষয়ে সংবিধানে কোন উল্লেখ নাই।

বরখাস্তের অধিকার

রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষাবাহিনী সমূহের প্রধান সেনাপতি। এতদ্দ্বারা জল, স্থল ও বিমানবাহিনীকে বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থাপন করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতিকে আইন অনুসারে ইহার পরিচালনা করিতে হয়। [The supreme command of the Defence forces of the Union shall be vested

in the President and the exercise thereof shall be regulated by law. 53 (2)] সংসদ যুদ্ধঘোষণা, শান্তিস্থাপন ও প্রতিরক্ষাবাহিনী সম্বন্ধে আইন করিবার একমাত্র অধিকারী। সেই জন্য সংসদের মতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি এসব বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন না। বিদেশীয় রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি সম্পর্কে কথাবার্তা অবশ্য রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে চালাইয়া থাকেন।

প্রধান সেনাপতি রূপে রাষ্ট্রপতি

ইংলণ্ডের রাজা বা রানীর মতন ভারতের রাষ্ট্রপতিও সংসদের একাংশ। সংসদ লোকসভা, রাজ্যসভা ও রাষ্ট্রপতি লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও ভঙ্গ করিতে এবং মুলতুবি রাখিতে পারেন। তিনি সংসদের সামনে বক্তৃতা করিতে ও বাণী পাঠাইতে পারেন। তাঁহার বক্তৃতায় অবশ্য মন্ত্রিপরিষদের অবলম্বিত নীতি ও কার্যপদ্ধতিই ব্যাখ্যাত হয়, তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত থাকে না। তিনি রাজ্যসভায় বারোজন এবং লোকসভায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে দুইজন সদস্য মনোনীত করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীই তাঁহাকে বলিয়া দেন কাহাকে কাহাকে মনোনীত করিতে হইবে। সংসদ হইতে যে কোন বিল পাস হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাভ করা প্রয়োজন। তিনি অর্থসম্বন্ধীয় বিল ছাড়া অন্যান্য বিল অনুমোদন না করিতে পারেন অথবা সংসদের কাছে পুনরায় বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক পরিমাণ বর্ণনা করিয়া যে বাজেট তৈয়ারি করা হয় তাহা রাষ্ট্রপতির আদেশে সংসদের নিকট পেশ করা হয়। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কোন প্রকার খরচা মঞ্জুরির প্রস্তাব সংসদের নিকট উপস্থিত করা যায় না।

যখন সংসদের অধিবেশন না হয় সেই সময়ে রাষ্ট্রপতি অর্ডিনান্স নামক জরুরি কাজের জন্য অস্থায়ী আইন জারি করিতে পারেন। ইহা সংসদ কর্তৃক পাস করা আইনের মতনই বলবৎ হয়। তবে সংসদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর ইহা সংসদের উভয় সদনের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। সংসদের অধিবেশনের আরম্ভের পর হইতে ছয় সপ্তাহ কালের বেশি অর্ডিনান্স বলবৎ থাকিতে পারে না। কোন্ বিষয়টি জরুরি কোন্ বিষয়টি জরুরি নহে তাহার সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির অভিমতই যথেষ্ট; আদালতে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা যাইবে না। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে ছয় সপ্তাহের পূর্বেই অর্ডিনান্স

অর্ডিনান্স জারির ক্ষমতা

খারিজ করিতে পারেন। সংবিধানে লিখিত আছে যে সংসদের দুইটি অধিবেশনের মধ্যে ছয় মাসের বেশি ব্যবধান থাকিতে পারিবে না। যদি ধরা যায় যে একটি অধিবেশন শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রপতি কোন অর্ডিনান্স জারি করিলেন, তাহা হইলে উহা অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে ছয় মাস ও আরম্ভ হইবার পর ছয় সপ্তাহ, অর্থাৎ সর্বসমেত সাড়ে সাত মাসের বেশি বলবৎ থাকিতে পারে না।

কিন্তু যে আইন তৈয়ারির ব্যাপারে সংসদের অনুমোদন লওয়া হয় নাই তাহা সাড়ে সাত মাস চলিবে এ ব্যবস্থা অনেকের নিকট গণতন্ত্রবিরোধী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সমাজবিরোধী কার্যকলাপ তাড়াতাড়ি বন্ধ করার জন্য এরূপ আইনের প্রয়োজন ঘটে। রাষ্ট্রপতি অবশ্য মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে অর্ডিনান্স জারি করেন। মন্ত্রিপরিষদ সংসদকে এড়াইয়া চলিবার জন্য অর্ডিনান্স জারি করিতে বলেন না। তাঁহারা সংসদের সদিচ্ছার ফলেই ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারেন, সুতরাং সংসদকে এড়াইয়া চলিবার কোন অভিপ্রায়ই তাঁহাদের থাকিতে পারে না। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সংসদ হইতে নিয়ম করা হইয়াছে যে যখন কোন অর্ডিনান্সকে পাকাপোক্ত আইনে পরিণত করিবার প্রস্তাব উঠিবে তখন কি কারণে অর্ডিনান্স জারি করার প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা দেখাইতে হইবে।

ইহা কি গণতন্ত্র বিরোধী?

রাষ্ট্রপতি দণ্ডিত অপরাধীর দণ্ডের প্রকৃতি বদলাইয়া কম করিতে পারেন, অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে কারাদণ্ড দিতে পারেন; এরূপ করাকে Commutation বলে; অথবা দণ্ড ভোগের কাল হ্রাস করিতে পারেন (Remission), দণ্ডদান মুলতুবি রাখিতে পারেন (Reprieve) এবং সম্পূর্ণভাবে অপরাধীকে মার্জনা (Pardon) করিতে পারেন। ব্রিটেনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপদেশ অনুসারে রানী মার্জনা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ভারতবর্ষেও ঐ প্রথা অনুসৃত হয়। সংবিধান সংক্রান্ত ও জনগণের স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের মত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

দণ্ডাদি সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি তিন প্রকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। তিনি যদি মনে করেন যে ভারতের কিংবা উহার একাংশে যুদ্ধ বাধিবার, বহিঃশত্রুর আক্রমণের অথবা অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা আছে তাহা হইলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। যুদ্ধ বাধিবার প্রয়োজন নাই। উহার

আশঙ্কা থাকিলেও রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ কোন আঙ্গিক রাজ্যে সংবিধান অনুসারে শাসন চালানো অসম্ভব হইলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইলে তিনি আর্থিক বিষয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। এই বিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে। এখানে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রপতি কেবিনেটের পরামর্শ লইয়া জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। জরুরি অবস্থা ঘোষিত হইলে আঙ্গিক রাজ্যগুলির আইন ও শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা হ্রাস পায় বটে, কিন্তু লোপ পায় না। ঐ সময় কেন্দ্রীয় সরকার যাহা আদেশ করিবেন তাহাই রাজ্যসরকার মানিতে বাধ্য। কেন্দ্রে সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকে, সুতরাং জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে রাষ্ট্রপতি Dictator বনিয়া যান এরূপ মনে করা ভুল।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা

রাষ্ট্রপতিপদে যিনি নির্বাচিত হন তিনি একজন বিচক্ষণ ও খ্যাতিমান পুরুষ। তাঁহার আইনগত ক্ষমতা যাহাই হউক না কেন, তিনি মন্ত্রীদিগকে যদি কোন পরামর্শ দেন তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই সুবিবেচনা লাভ করিবে। তবে তাঁহার সকল পরামর্শই যে মন্ত্রীরা গ্রহণ করিবেন এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

রাষ্ট্রপতির প্রভাব

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে সাম্প্রতিক মতবিরোধঃ সাধারণ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে কার্য নির্বাহ করেন। সংবিধানের রচয়িতাদের ধারণা ছিল যে তাঁহারা রাষ্ট্রপতিকে ব্রিটিশরাজের ন্যায় সাংবিধানিক শাসক অর্থাৎ নামে মাত্র প্রধান করিয়াছেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও ঐরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তারিখে তিনি Indian Law Institute-এর ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইয়া বলেন যে সংবিধানে কোথাও এমন কথা বলা হয় নাই যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মানিয়া লইতে বাধ্য; কেবলমাত্র ইংলণ্ডের সংবিধানের ব্যাখ্যাতাদের মত নির্বিচারে অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ ভারত এবং ব্রিটেনের যুক্তরাজ্যের অবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই সব কারণে তিনি Indian Law Institute-কে অনুরোধ জানান যে তাঁহারা যেন ব্রিটেনের অধীশ্বরের সহিত ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যবিষয়ে কি কি পার্থক্য আছে সে সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। তাঁহার এই

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের আধুনিকতম মত

উক্তিতে দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের মধ্যে তর্কবিতর্ক প্রবলতর হইল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংঘের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীরামশর্মা লেখেন (Modern Review, জুলাই ১৯৫০) যে রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সের তৃতীয় ও চতুর্থ রিপাবলিকের সভাপতির মতন সাক্ষীগোপাল মাত্র। বর্তমান লেখক যখন ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের **হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতেছিলেন তখন ডাঃ বি. এম. শর্মা লেখেন যে,** যেহেতু সংবিধানের ৫৩ ধারায় আছে যে রাষ্ট্রপতি সরাসরি নিজে অথবা তাঁহার অধীন কর্মাধ্যক্ষদের মাধ্যমে ইউনিয়নের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন, সেই হেতু তিনি মন্ত্রীদের সাহায্য না লইয়া নিজেও স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন—("This leaves a clear scope to the President to become a real ruler and not a mere nominal executive of the union".—Indian Journal of Palitical Science Oct-Dec., 1951)। অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীও লেখেন যে রাষ্ট্রপতি সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পরামর্শ মানিয়া লইতে বাধ্য নহেন (Modern Review Dec., 1950)। সম্প্রতি ডাঃ কে. ভি. রাও (Parliamentary Democracy of India, পৃ ৫৭) মন্তব্য করিয়াছেন যে রাষ্ট্রপতির অর্ডিনান্স জারির ক্ষমতা, জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং তাহার ফলে নাগরিকের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা এবং আঙ্গিক রাজ্যের অধিকার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা হইতে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় সংবিধানে সম্ভবতঃ রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী কার্যকর্তা সৃষ্টি করিয়াছে ("Our survey of the powers of the President shows clearly that our Constitution creates a very powerful executive, perhaps the most powerful in the world, excepting probably that of Russia whose real working is different from what it is on paper.)। কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে কাগজে কলমেই ঐ সব ক্ষমতার কথা রহিয়াছে, বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যবহৃত হইতেছে না।

প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত

ডাঃ শ্রীরামচন্দ্র দাস সংবিধানের ১১১ ধারাটি বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে রাষ্ট্রপতি অর্থসংক্রান্ত বিল (Money Bill) নাকচ করিতে পারেন, সেইজন্য তিনি সাক্ষীগোপাল মাত্র নহেন। ("In a parliamentary government,

the fate of the Cabinet is linked with that of a Money Bill; still if the President can veto it, he is clearly independent of Cabinet advice in regard to the exercise of his functions......

রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা

Thus Article of the Constitution of India establishes the proposition that the President is not a constitutional figurehead,"—Indian Journal of Political Science Oct-Dec., 1961) সংবিধানের সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু কিন্তু বলেন যে রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারেই ব্যবহৃত হইবে (Commentary on the Constitution of India, তৃতীয় সং, পৃঃ ৬৩৭)।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Allan Gledhill তাঁহার Republic of India, The Development of its Laws and Constitution নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১০৮) দেখান যে একজন ক্ষমতালিপ্সু রাষ্ট্রপতি সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া ডিক্টেটর হইতে পারেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া কার্য করিতে গেলে তাঁহার বিরুদ্ধে সংসদে মহাঅভিযোগ আনিবার জন্য চৌদ্দদিনের নোটিশ্ দেওয়া হইবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, মন্ত্রীদের বরখাস্ত করিতে পারেন, কেননা মন্ত্রীরা তাঁহার খুসিমত চাকুরিতে বহাল থাকেন (hold the office during his pleasure); তাঁহার নিজের পছন্দমত যে কোন লোককে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন, ছয়মাসের জন্য তাঁহারা সংসদের কোন সদনের সদস্য না হইলেও চলে; তারপর তিনি অর্ডিনান্স জারি করিয়া শাসন চালাইতে পারেন; তিনি জরুরি অবস্থাও ঘোষণা করিয়া নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ব্যবহার স্থগিত করিতে পারেন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারেন এবং আঙ্গিক রাজ্যগুলিতেও সংবিধান অনুসারে শাসন পরিচালনা করা যাইতেছে না বলিয়া সেখানেও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিয়া নিজের হাতে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন; তারপর প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া তিনি সৈন্যদলের সাহায্যে নিজের ক্ষমতা ও শাসননীতি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিতে পারেন; সেই সময়ে তিনি লোকসভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া নিজের সমর্থকদিগকে নির্বাচিত করাইতে পারেন। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন যে এই সব কথা

রাষ্ট্রপতি কি ডিক্টেটর হইতে পারেন?

দুঃস্বপ্নের মতন বিভীষিকাজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু হিট্‌লার অনেকটা এই ভাবেই ওয়াইমার সংবিধান ধ্বংস করিয়া ডিক্‌টেটর হইয়াছিলেন "This may seem a nightmare, but it is not dissimilar to the way in which the Weimar Constitution was destroyed"।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি একের পর এক ক্ষমতা নিজের হাতে লইবেন আর দেশের জনমত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে এরূপ চিন্তা করা যায় না। যদি দেশে জনমত নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন হয় তাহা হইলে সংবিধান হাজার ভাল হইলেও স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের উদ্ভব হইতে পারে। অধ্যাপক গ্রেডহিলের বিশ্লেষণ পড়িয়া রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ্ হয়তো বেজহটের রাজক্ষমতাবিশ্লেষণ সম্বন্ধে মহারানী ভিক্টোরিয়া যেমন বলিয়াছিলেন "ভদ্রলোক এত কথাও বানাইয়া বানাইয়া বলিতে পারেন, আশা করি আমার প্রজারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না," তেমনি বলিবেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দ্বিতীয় পর্যায়, পৃঃ ২৪ দ্রষ্টব্য)।

জনমত সজাগ থাকিলে উহা অসম্ভব

১৯৫০ হইতে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। কি অর্ডিনান্স জারির ব্যাপারে কি জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে, কি যুদ্ধ ও সৈন্যপরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সব সময়েই মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়াছেন। সাংবিধানিক পণ্ডিতেরা সংবিধানের লিখিত ধারাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া যে কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছান না কেন, বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক প্রধান শাসকের ভূমিকাতেই এ পর্যন্ত দেখা দিয়াছেন।

গত বার বৎসরের

মন্ত্রিপরিষদ ও কেবিনেট (Council of Ministers and Cabinet) :

সংবিধানে (৭৪ ধারা) বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার ক্ষমতাপ্রয়োগ বিষয়ে সাহায্য করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ অবশ্যই রাখিতে হইবে। তবে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতিকে কোন পরামর্শ দিয়াছিলেন কিনা এবং দিয়া থাকিলে কিরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন আদালতে অনুসন্ধান করিতে পারিবেন না। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন বিধিতেও ছিল যে মন্ত্রীরা গবর্ণর জেনারেলকে কি পরামর্শ দিলেন বা না দিলেন সে বিষয়ে খোঁজ লইবার এক্তিয়ার কোন আদালতের

মন্ত্রিপরিষদের সহিত রাষ্ট্রপতির সম্বন্ধ

নাই। গবর্ণর জেনারেলের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি অনুসারে (discretion) কাজ করিবার কতকগুলি ক্ষমতা ছিল, ভারতের রাষ্ট্রপতির সেরূপ ক্ষমতা নাই। তথাপি সংবিধানে উভয়ক্ষেত্রে একই রূপ বিধান করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, কোন বিশেষ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনে, লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, প্রধান মন্ত্রীর নিকট তথ্য চাওয়া এবং একজন মন্ত্রীর দ্বারা গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদের দ্বারা বিচার করাইবার অনুরোধ জ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ না লইয়াই কাজ করিতে পারেন। ঐ সব ক্ষেত্রে তাঁহার কাজ লইয়া যাহাতে অনর্থক মামলামোকদ্দমা না হয় তাহার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব করিবেন এই কথা আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে। ব্রিটেনের অলিখিত সংবিধানের প্রথা এই যে প্রধানমন্ত্রী সমপর্যায়ভুক্ত মন্ত্রীদের মধ্যে প্রাধান্য করিবেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করিবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে বহাল করিবেন। মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির খুশিমত পদে বহাল থাকিবেন। ইহার অর্থ এই যে রাষ্ট্রপতি যে কোন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করিতে পারেন। কিন্তু এ ব্যাপারেও তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীদিগকে বরখাস্ত করিতে পারিলেও, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র মন্ত্রিপরিষদকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারেন না। সংবিধানে (৭৫।৩) আছে

মন্ত্রি ও সংসদ

যে মন্ত্রিপরিষদ সমবেতভাবে বা যৌগরূপে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল রহিবে। মন্ত্রীকে সাধারণতঃ সংসদের কোন এক সদনের সদস্য হইতে হয়। কিন্তু কখনও কখনও প্রধানমন্ত্রী কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংসদের বাহির হইতেও মন্ত্রিপরিষদে লইতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ মন্ত্রীকে ছয় মাসের মধ্যে কোন সদনের সদস্য হইতে হয়; যদি না হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। গোবিন্দবল্লভ পন্থকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীত্ব হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া যখন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হয় তখন তিনি সংসদের সদস্য ছিলেন না। পরে তাঁহাকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত করিয়া লওয়া হয়। মহারাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চ্যবন যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন তখন তিনি সংসদের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু মহারাষ্ট্রের আইনসভা হইতে রাজ্যসভায় নির্বাচিত একজন সদস্য পদত্যাগ করিয়া চ্যবনের পক্ষে ঐ স্থলে নির্বাচিত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

মন্ত্রীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কেবিনেটের সদস্য শ্রেণীভুক্ত মন্ত্রী কেবিনেটভুক্ত না হইয়াও যাঁহারা মন্ত্রীত্ব করেন (Ministers of State) এবং সহকারী মন্ত্রী (Deputy Ministers)। যাঁহারা খুব প্রভাবশালী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কেবিনেটে স্থান দেওয়া হয়।

কেবিনেট

তাঁহারা এক একটি বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করেন, আবার সকল বিভাগের কার্য-পরিচালনার জন্য কেবিনেট বসিয়া নীতি নির্ধারণও করেন। ইঁহাদের সংখ্যা ১৩।১৪ হইতে ১৮।১৯ হয়। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কেবিনেটে ১৩ জন সদস্য ছিলেন, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পূর্বে ১২ জন ছিলেন আর উহার পরে ১৮ জনকে লইয়া কেবিনেট গঠিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অর্থ (Finance), রেলওয়ে, শিল্প ও বাণিজ্য, পরিকল্পনা, যানবাহন ও ডাক এবং তার, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, আইন, খাদ্য ও কৃষি, ও জ্বালানি, ইস্পাত ও গুরুভার দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি খনি বিভাগের মন্ত্রীদিগকে কেবিনেটে লওয়া হয়। কোন্ বিভাগের মন্ত্রীকে কেবিনেটে লওয়া হইবে বা না হইবে তাহা নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর উপর। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রেডিয়ো মন্ত্রী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী এবং সংসদীয় কার্যক্রমের মন্ত্রী কেবিনেটের সদস্য ছিলেন না; কিন্তু এবারে তাঁহারা কেবিনেট সদস্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। পূর্বে দপ্তরবিহীন কেবিনেট মন্ত্রী ছিলেন না এবারে শ্রীযুক্ত টি. টি. কৃষ্ণমাচারিয়াকে কয়েকটি বিভাগের উপর পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ বাঁধিবার পর তাঁহাকে আর্থিক ও প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত দপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছিল। Ministers of State কেবিনেটের সদস্য নহেন, কিন্তু মন্ত্রীত্বের অন্যান্য সম্মান ও মর্যাদা পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের এক একজনের উপর স্বাস্থ্য, শ্রম, গ্রামউন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিল্প, জাহাজ চলাচল প্রভৃতি দপ্তরের ভার আছে।

সাধারণ মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী

ইঁহাদের মধ্যে দুইজন মহিলা মন্ত্রী আছেন। ইঁহাদের পরে আছেন সহকারীমন্ত্রীরা। সহকারী মন্ত্রীদের মধ্যে তিনজন হইতেছেন মহিলা। তাঁহারা মন্ত্রীদের অধীনে থাকিয়া এক একটি দপ্তরের পরিচালনায় সাহায্য করেন; সংসদে প্রশ্নের উত্তর দেন এবং কখনও কখনও বিভাগীয় নীতিও ব্যাখ্যা করেন। সংবিধানে সহকারী মন্ত্রীর পদের উল্লেখ নাই, তবে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সংসদ Salaries and Allowances of Ministers Actয়ে বলা হইয়াছে যে তাঁহারাও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য।

১৮ জন কেবিনেট মন্ত্রী, ১২ জন মন্ত্রী ও ২২ জন ডেপুটি মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত। মন্ত্রিপরিষদের কোন স্বতন্ত্র অফিস নাই বা কর্মচারী নাই। কেবিনেটের অফিস আছে এবং উহার সেক্রেটারি আছেন। সাধারণ সময়ে কেবিনেটের সপ্তাহে একদিন করিয়া অধিবেশন হয়। তাহাতে প্রাধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। তিনি অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার নির্বাচিত কোন অভিজ্ঞ মন্ত্রী সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। উপমন্ত্রীর নীচে কয়েকজন পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি আছেন। তাঁহাদিগকে মন্ত্রিপরিষদের অনুগত বলিয়া ধরা হয়না। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর তারিখে চীনাদের সহিত যুদ্ধসংক্রান্ত নীতি পরিচালনার জন্য একটি সমর পরিষদ বা War Cabinet গঠিত হইয়াছে। উহাতে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া রাজস্ব, যোজনা, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং আর্থিক সংযোগ স্থাপন বিভাগের মন্ত্রী—এই ছয়জন মাত্র সদস্য আছেন। যুদ্ধের সময়ে সকল বিভাগের কাজেই যুদ্ধের আনুকূল্য করিবার জন্য পরিচালিত হয়। সেইজন্য কোন কোন কেবিনেট মন্ত্রীও অনেক গোপন কথা জানিতে পারেন না।

মন্ত্রিপরিষদ কেবিনেট অপেক্ষা আকারে বড়

যুদ্ধকালীন যুদ্ধ-কেবিনেট

সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদের (Council of Ministers) কথা আছে, কেবিনেটের কথা নাই। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা কেবিনেটের হাতে, মন্ত্রিপরিষদের হাতে নহে। সংবিধানে যেখানে বলা হইয়াছে (৭৮ ধারা) যে প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হইতেছে ইউনিয়নের সকল ব্যাপারের প্রশাসন সম্বন্ধে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানানো, সেখানে কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের সিদ্ধান্তই জানাইয়া থাকেন। সংবিধানের লিখিত অনুশাসন প্রথার দ্বারা কি ভাবে পরিবর্তিত হয় ইহা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

কেবিনেটের কথা সংবিধানে নাই। মন্ত্রিপরিষদের স্থান কেবিনেট লইয়াছে।

ভারতের মন্ত্রীরা অন্যান্য দেশের মন্ত্রীদের তুলনায় অনেক কম বেতন লইয়া থাকেন। মন্ত্রীরা মাসে ২২৫০ টাকা বেতন লন, কিন্তু তাঁহাদের অধীনে যে সব সেক্রেটারিরা কাজ করেন, তাঁহারা তিনহাজার (I. A. S. হইলে) বা চারহাজার (I.C.S. হইলে) টাকা বেতন পান। মহাত্মা গান্ধী মন্ত্রীদের কম বেতনে কাজ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। সহকারী মন্ত্রীরা মন্ত্রীদের অপেক্ষা কিছু কম বেতন পান। মন্ত্রীরা বেতন ছাড়া বিনা ভাড়ায় বাড়ি পান। সেই বাড়িতে জল

মন্ত্রীদের বেতন ভাতা প্রভৃতি

ও আলো বাবদ যাহা কিছু খরচ হইত তাহা সরকার বহন করিতেন; কিন্তু সম্প্রতি যুদ্ধের জন্য নিয়ম হইয়াছে যে সরকার মন্ত্রীদের বেলায় মাসে ২৫০ টাকা ও সহকারী মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে মাসে ১৫০ টাকা জল ও আলোর খরচবাবদ দিবেন; উহার চেয়ে বেশি খরচ হইলে সে টাকা মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিজের পকেট হইতে দিতে হইবে।

ইংলণ্ডের রাজা বা রানীর নামে যে সব আদেশ বাহির হয় তাহার প্রত্যেকটিতে কোন না কোন মন্ত্রীর স্বাক্ষর থাকে। ভারতবর্ষে সেরূপ নিয়ম নাই। রাষ্ট্রপতির নামে ঘোষিত আদেশে সংশ্লিষ্টবিভাগের সেক্রেটারির স্বাক্ষর থাকে। ইহার ফলে কোন মন্ত্রীকে কোন অন্যায় আদেশ দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যায় না। তবে ঐরূপ ক্ষেত্রে জনসাধারণ সরকারের নামে নালিশ করিতে পারেন।

ইংলণ্ডের মন্ত্রিদের সহিত ভারতীয় মন্ত্রিদের পার্থক্য

ইংলণ্ডে যে মন্ত্রী যে সদনের সদস্য সেই সদনেই মাত্র তিনি উপস্থিত থাকিতে ও বক্তৃতা করিতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় মন্ত্রীরা উভয় সদনেই বক্তৃতা দিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে পারেন শুধু সেই সদনে যে সদনের তিনি সদস্য।

ব্রিটিশ কেবিনেটের সহিত ভারতীয় কেবিনেটের পার্থক্য: ভারতবর্ষে মোটামুটি ব্রিটিশ কেবিনেট প্রথা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু দুই একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে বিভিন্ন বিভাগের কার্যভার প্রদান করেন। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে (৭৭।৩) লিখিত আছে যে রাষ্ট্রপতি ভারত সরকারের কাজ চালাইবার সুবিধার জন্য নিয়ম তৈয়ারি করিবেন এবং মন্ত্রীদের মধ্যে কার্যবণ্টন করিয়া দিবেন। তিনি অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই নিয়ম তৈয়ারি করেন ও মন্ত্রীদিগকে কার্যভার দেন। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর নিয়ম তৈয়ারি করিবার কোন অধিকার নাই। রাজা বা রানী কোন অন্যায় করিতে পারেন না—এই নীতি প্রতিপালিত হয় বলিয়া তাঁহার প্রত্যেক আদেশ কোন মন্ত্রীর স্বাক্ষরে প্রচারিত হয়। মন্ত্রীই ঐ আদেশের জন্য দায়ী হন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতির আদেশে মন্ত্রীরা স্বাক্ষর করেন না, বিভাগীয় কোন সেক্রেটারি সহি করেন।

নিয়ম তৈয়ারি

ব্রিটিশ কেবিনেটের রীতিনীতির সহিত ভারতীয় কেবিনেটের আর একটি পার্থক্য এই যে ভারতবর্ষের সংবিধানে আছে যে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে বলিতে পারেন যে অমুক বিষয়টিতে অমুক মন্ত্রী একক ভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সমগ্র

মন্ত্রিপরিষদের নিকট উপস্থিত করা হউক। কোন্ বিষয়ে কেবিনেট যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন সে সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কথা মানিতে হয়। তবে ইহাতে কার্যক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য ঘটে না। কেননা রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র কেবিনেটের সামনে কোন বিষয় পেশ করিতে বলিতে পারেন, তাঁহার নিজের মত মন্ত্রীদের উপর চাপাইয়া দিতে পারেন না।

একজন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কেবিনেটের রায় লওয়া বিষয়ে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ

কেবিনেটের কার্য, কমিটি ও সেক্রেটেরিয়েট: কেবিনেটের কার্য, যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বহু বিস্তৃত। ভারতসরকার কোন বিষয়ে কি নীতি অনুসারে কাজ করিবেন তাহা কেবিনেটে আলোচনার ফলে নির্ধারিত হয়। যে কোন বিষয়ে আইন করিবার প্রস্তাব উঠিলে উহা কেবিনেটের সামনে আসে এবং কেবিনেট যেমন নির্দেশ দেন সেই ভাবে বিলের খসড়া তৈয়ারি হয়। সংসদে আলোচনার ফলে তাহার কিছু রদ বদল হইতে পারে, তবে কেবিনেটের মূল প্রস্তাবই সাধারণতঃ সংসদে গৃহীত হয়। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যাহা কিছু বিরোধ বা মতভেদ থাকে তাহার মীমাংসা করিয়া দেন কেবিনেট, বিভিন্ন বিভাগের কার্যপ্রণালীর মধ্যে যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে তাহা দেখিবার ভারও কেবিনেটের উপর। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ও শীল মোহর দিয়া যে সব পদে লোকনিযুক্ত করা হয় সেই সব প্রধান প্রধান পদগুলিতে কাহাকে লওয়া হইবে তাহাও কেবিনেট ঠিক করিয়া দেন। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারও কেবিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ।

কার্যের বিস্তৃতি

এত কাজ সবসময়ে কেবিনেটের সকল সদস্য একত্রে বসিয়া করিতে পারেননা। তাই কাজের সুবিধার জন্য কেবিনেটের কতকগুলি কমিটি স্থাপন করা হইয়াছে। কেবিনেটের চারটি স্থায়ী কমিটি আছে। যথা—প্রতিরক্ষা কমিটি, যোজনা কমিটি, আর্থিক কমিটি, প্রশাসনিক সংগঠন কমিটি এবং সংসদীয় ও আইনবিষয়ক কমিটি। ইহা ছাড়া যখন কোন গুরুতর বিষয়ে পূর্ব হইতে আলোচনা করিয়া ক্ষেত্রপ্রস্তুতি করার প্রয়োজন হয় তখন এক একটি অস্থায়ী (Ad hoc) কমিটি নিযুক্ত করা হয়। কোন কোন কমিটি আবার উপ-সমিতি নিযুক্ত করিতে পারেন। নিযুক্ত (Appointment) বিষয়ে ঐরূপ উপসমিতি আছে। কেবিনেটের সদস্য নহেন এমন মন্ত্রীদিগকে তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট

কমিটি

বিভাগের কার্য সম্বন্ধে পরামর্শ দানের জন্য কেবিনেটের সামনে অথবা উহার সমিতি বা উপসমিতির সামনে অহ্বান করা হয়।

ইংলণ্ডে যেমন কেবিনেটের সেক্রেটারিয়েট আছে; ভারতেও তেমনি স্থাপিত হইয়াছে। স্বাধীনতালাভের পূর্বে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি ভারতের শাসনপরিষদের সেক্রেটারি রূপে কাজ করিতেন। গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের পর তাঁহাকেই কেবিনেট সেক্রেটারির পদ দেওয়া হয়। কেবিনেটের সেক্রেটারিই যোজনা কমিসনের সেক্রেটারি রূপে করেন। তাঁহার অধীনে Organisation and Management (O & M) Division, ও কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন আছে।

সচিবালয়

কেবিনেটের সহিত সংসদের সম্বন্ধ: কেবিনেট লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল; রাজ্যসভার নিকটে নহে। লোকসভা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত, আর রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্য অপ্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত। তাই গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে কেবিনেট শুধু লোকসভার নিকট দায়ী। এই দায়িত্ব বলিতে যৌথদায়িত্ব বুঝায়। ইহার অর্থ এই যে কোন মন্ত্রীর অবলম্বিত নীতি যদি লোকসভা কর্তৃক নিন্দিত হয় অথবা অগ্রাহ্য হয় তাহা হইলে সাধারণতঃ সমগ্র কেবিনেট পদত্যাগ করেন। ঐ নীতি কেবিনেটের অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল কিনা তাহা বিবেচনা করা হয় না। ধরিয়া লওয়া হয় যে মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক নীতি স্থির করেন। কিন্তু যেখানে কোন মন্ত্রীর অসাবধানতা অথবা অসাধুতার প্রশ্ন জড়িত থাকে সেখানে শুধু সেই মন্ত্রীই পদত্যাগ করেন, সমগ্র কেবিনেট নহে। বীমা করপোরেশনের সহিত মুন্দ্রার সংস্রব ব্যাপারে টি. টি. কৃষ্ণমাচারিয়ার উপর কেহ কেহ দোষারোপ করায় তিনি রাজস্বমন্ত্রীর পদ হইতে ইস্তাফা দেন। তাঁহার পূর্বে আর্থিক ব্যাপারে কিছু কেলেঙ্কারি প্রকাশ পাওয়ার জন্য ষন্মুখম চেট্টি ও ডাঃ জন মাথাই পদত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কেহ সমগ্র কেবিনেটের পদত্যাগের দাবি জানান নাই। সম্প্রতি চীনা হামলার ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কিছু গলদ প্রকাশ পাওয়ায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী কেবল শ্রীকৃষ্ণ মেনন পদত্যাগ করেন।

মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব

যৌথ দায়িত্বশীলতা থাকার দরুণ প্রত্যেক মন্ত্রী প্রকাশ্য বক্তৃতা দিতে ও ছোটবড় সকল বিষয়ে সরকারী নীতি সমর্থন করিতে বাধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত

কেবিনেটে কোন বিশেষ নীতি গৃহীত না হয়, ততক্ষণ যে কোন সদস্য যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়া অপরকে নিজের মতে আনিতে চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু একবার যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহা সকলকেই মানিতে হইবে। যিনি বা যাঁহারা উহা মানিতে পারিবেন না তাঁহারা পদত্যাগ করেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি সমর্থন করিতে পারেন নাই বলিয়া ও ডাঃ চিন্তামন দেশমুখ বোম্বাই সহরকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ করিবার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে না পারায় পদত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের মামলায় Labour Appellate Tribunal-এর সিদ্ধান্তগুলির সরকার পরিবর্তন করেন বলিয়া প্রতিবাদ হিসাবে শ্রীযুক্ত ভি. ভি. গিরি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন।

মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে একই রূপ অভিমত প্রকাশ করেন

সংসদ, বিশেষ করিয়া, লোকসভা মন্ত্রীদিগকে প্রশ্ন করিয়া মুলতুবি প্রস্তাব (Adjournment motion) আনিয়া, কোন বিভাগের কার্য সম্বন্ধে বিতর্ক উঠাইয়া, বাজেট পাসের সময়ে কোন বিভাগের খরচা না মঞ্জুরি করিয়া ও অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। সাধারণতঃ মন্ত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার দরুণ তাঁহাদের প্রস্তাবই সংসদে গৃহীত হয়। কিন্তু কোন কোন সময়ে মন্ত্রীরা এমন কি প্রধানমন্ত্রীও সংসদের বিরোধিতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন করেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগস্ট তারিখে লোকসভায় পাটিলের একটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কামাথের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। যৌথ কারবারের প্রয়োজনে জনসাধারণের জমি সরকার দখল করিতে পারিবেন এই মর্মে একটি বিল শ্রীযুক্ত পাটিল লোকসভায় আনিলে শ্রীযুক্ত কামাথ সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে, কোন প্রাইভেট কোম্পানীকে সমর্পণ করিবার জন্য সরকার কোন জমি দখল করিয়া লইতে পারিবেন না। কংগ্রেসের অনেক সদস্য তাঁহার সংশোধনীর পক্ষে বক্তৃতা করায় শ্রীযুক্ত পাটিল উহা মানিয়া লন—যদিও তাঁহার মূল প্রস্তাব ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে চীনা হামলায় আমাদের কিছু ক্ষতি সাধিত হইলে সংসদে অনেকে দাবি করেন যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজের ভার দেওয়া উচিত নহে এবং তাঁহাকে কেবিনেট হইতে অপসারিত

সংসদের দ্বারা মন্ত্রীদের কার্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সংসদের প্রভাব

করা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত নেহরু শ্রীযুক্ত মেননের গুণমুগ্ধ হইলেও এই দাবি মানিয়া লন।

সাংবিধানিক রীতি অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ লোকসভায় আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা থাকার দরুণ কেবিনেটকে পদচ্যুত করা খুব কঠিন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী : সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার যে বিশাল তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাই প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনিই হইতেছেন শাসনযন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র। তাঁহার নির্দেশেই সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয়। তাঁহার কার্যাবলীকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। রাজনৈতিক দল, সংসদ, রাষ্ট্রপতি, কেবিনেট ও দেশের প্রশাসন সম্পর্কে তাঁহার কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

শাসনযন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র

যে রাজনৈতিক দল সংসদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহারই নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন। অন্যান্য গণতন্ত্রশাসিত দেশে বিজয়ী দলের নেতার পিছনে অনেক উপনেতা থাকেন। তিনি তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের একজন অবিসম্বাদিত নেতা। তাঁহার নাম ও ব্যক্তিত্বের সাহায্য লইয়াই অন্যান্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হইয়াছেন। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে শ্রীযুক্ত নেহরু নির্দলীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কেবিনেটে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন সাধারণতঃ কংগ্রেসের সদস্যদিগকেই মন্ত্রিপরিষদে লইয়া থাকেন। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষার ও সম্প্রদায়ের যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে লইয়া তিনি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। দলের মধ্যে যাহাতে বিশেষ কোন অংশ অসন্তুষ্ট না হন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করিতে হয়। তাঁহার দল যাহাতে পরের বারের নির্বাচনেও জয়ী হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য অবিসম্বাদিত

প্রধানমন্ত্রী লোকসভার অধিনায়ক—Leader of the House। তিনি সংসদের নিকট সরকারের নীতির যে ব্যাখ্যা করেন তাহা প্রামাণিক বলিয়া সকলে মনে করেন। তর্কবিতর্ক যখন প্রবলভাবে চলিতে থাকে তখন তাঁহার মধ্যস্থতায় অনেক সমস্যার সমাধান ঘটে। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি বক্তৃতা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কোন

লোকসভায় অধিনায়কত্ব

বিষয়ে তাঁহার দলভুক্ত সদস্যেরা স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে পাইবেন কিনা তাহাও তিনি ঠিক করিয়া দেন। কোন বিলের উপর কত সময় ব্যয় করা হইবে, লোকসভার অধিবেশন কতদিন ধরিয়া চলিবে, এসব বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারেই কার্যপদ্ধতি স্থির করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে লোকসভার সদস্য। তিনি প্রয়োজনমত রাজ্যসভাতেও উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন। কিন্তু তাঁহার মুখপাত্র হিসাবে কাজ করিবার জন্য একজন প্রবীণ মন্ত্রীকে রাজ্যসভা হইতে মনোনীত করা হয়।

রাষ্ট্রপতির সহিত সম্বন্ধ

সংবিধানে লিখিত আছে (৭৮ ধারা) যে, প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হইতেছে ইউনিয়নের প্রশাসন বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত ও আইন তৈয়ারি সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি রাষ্ট্রপতিকে জানানো; ঐসব বিষয়ে রাষ্ট্রপতি যাহা কিছু জানিতে চাহিবেন তাহা জ্ঞাপন করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি যদি নির্দেশ দেন তাহা হইলে কোন মন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের অভিমত না লইয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন সেই বিষয়টি সমগ্র মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনার জন্য রাখিবেন। ইহার দ্বারা মন্ত্রিপরিষদের যৌথ দায়িত্ব পূর্ণরূপে প্রকট করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী একদিকে যেমন সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে, অন্যদিকে তেমনি মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সেতুরূপে কার্য করেন। প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। কোন্ কোন্ বিষয় কেবিনেটে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন তাহা তিনি ঠিক করিয়া দেন। তিনি যে মন্ত্রীর কার্য পছন্দ করেন না তাঁহাকে বরখাস্ত করিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করিতে পারেন। কিন্তু আজকাল মন্ত্রীকে বরখাস্ত করিবার রীতি কি ইংলণ্ডে, কি

মন্ত্রীদের হর্তাকর্তা

ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর বিরাগভাজন হইয়াছেন বুঝিলে সাধারণতঃ যে কোন মন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। যদি তিনি এরূপ না করেন তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং পদত্যাগ করেন। তিনি পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিপরিষদ ভাঙ্গিয়া যায় এবং সকল মন্ত্রীই পদত্যাগ করিয়াছেন বুঝিতে হয়। এইরূপে অনভিপ্রেত মন্ত্রী হইতে অব্যাহতি পাইয়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রধানমন্ত্রী পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রধান কর্তব্য হইতেছে বিভিন্ন বিভাগের কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। যখন যে বিভাগের সামনে কোন কঠিন সমস্যা দেখা দেয় তখন প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ লওয়া হয়। এইজন্য কোন একটি বিশেষ বিভাগের কাজ লইয়া

তিনি সাধারণতঃ ব্যাপৃত থাকিতে চাহেন না। ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী ট্রেজারির প্রথম লর্ডের পদ গ্রহণ করেন; ঐ পদের সহিত গুরুভার কার্য সংশ্লিষ্ট নাই। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অসাধারণ ব্যক্তি; তাই তিনি পররাষ্ট্রসচিবের পদের গুরুদায়িত্ব বহন করিয়া আসিতেছেন। তিনি কমনওয়েলথের সম্মেলনেও উপস্থিত থাকিয়া ভারতের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রীর পার্থক্য

এটর্ণি জেনারেল ঃ ব্রিটেনে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতন ভারতবর্ষেও একজন এটর্ণি জেনারেল আছেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন; তবে তাঁহার সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হইবার মতন যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। তিনি রাষ্ট্রপতির ইচ্ছামত কালের জন্য পদে বহাল থাকিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এটর্ণি জেনারেলের কর্তব্য হইতেছে আইনঘটিত ব্যাপারে ভারতসরকার যে পরামর্শ তাঁহার নিকট চাহিবেন তাহা দেওয়া এবং ভারতসরকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুপ্রিম কোর্টের সামনে উপস্থিত হওয়া। তাঁহাকে সাধারণতঃ দিল্লীতেই থাকিতে হয়। তিনি মাসিক চারহাজার টাকা বেতন পান। তাহার উপর যখন তিনি কোন হাইকোর্টে ভারত সরকারের কোন মোকদ্দমা চালাইবার জন্য উপস্থিত হন তখন প্রতিদিন (যাতায়াতের সময়ও ধরিয়া) বাট মোহর করিয়া ফিঃ পান। তা' ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদিগকে যে হারে ভাতা দেওয়া হয় সেই হারে তিনি ভ্রমণ কালে ভাতা পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের এটর্ণি জেনারেল কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া কোন আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন না; কিন্তু আমাদের দেশে ঐরূপ বাধানিষেধ নাই। তবে তিনি ভারত সরকারের বিপক্ষে অবতীর্ণ হইতে পারেন না। কোন ফৌজদারি মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবার পূর্বে তাঁহাকে ভারতসরকারের অনুমতি লইতে হয়।

নিয়োগ ও কার্যভার

এটর্ণি জেনারেল ইচ্ছা করিলে সংসদের যে কোন সদনে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে পারেন; তবে ভোট দিতে পারেন না। সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে এবং উহাতে ভারত সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে এটর্ণি জেনারেলের মত না লইয়া কোন আদালত ঐ বিষয়ের মামলার বিচার করিতে পারিবেন না।

ক্ষমতা

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে অতঃপর আইনসচিবই এটর্ণি জেনারেলের কাজ করিবেন, কেননা ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় একই ব্যক্তি, ঐ দুই পদের কাজ করিয়া থাকেন। আইনসচিবকে তাহা হইলে একজন সহকারী নিযুক্ত করিতে হইবে, কেননা তিনি কোন আদালতে মামলা পরিচালনা করিবার মতন সময় পাইবেন না। সংবিধানের ধারা (৭৬) দেখিয়া মনে হয় এটর্ণি জেনারেলের পদ মন্ত্রীর পদ হইতে পৃথক।

যোজনা কমিসন (Planning Commission) ঃ সংবিধানে যোজনা বা পরিকল্পনা কমিসনের কোন উল্লেখ নাই। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে যোজনা কমিসন প্রথম নিযুক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ইহার সভাপতি হন। প্রথমে ইহা কেবিনেটের একটি কমিটিরূপে কাজ করিতে আরম্ভ করে। কেবিনেট যখন যোজনা বিষয়ে আলোচনা করিতেন তখন যোজনা কমিসনের যে সব সদস্য কেবিনেটের সদস্য ছিলেন না তাঁহারাও উহাতে যোগ দিতেন। কিন্তু সেই সময়ের অর্থমন্ত্রী জন্ মাথাই যোজনা কমিসনের সদস্য ছিলেন না। তিনি অর্থমন্ত্রীহিসাবে পদত্যাগ করিবার সময় অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও উল্লেখ করেন যে যোজনা কমিসনের সদস্যদের মধ্যে যাঁহারা কেবিনেটের সদস্য নহে তাঁহারা গোপনীয়তার শপথ গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের উপস্থিত থাকার দরুণ কেবিনেটের সদস্যদের যৌথ দায়িত্ব প্রতিপালন করা কঠিন হয়। যাহা হউক তাঁহার পদত্যাগের পর যোজনা কমিসনের সহকারী সভাপতিকে কেবিনেটের সদস্য ও অর্থমন্ত্রী চিন্তামণ দেশমুখকে যোজনা কমিসনের সদস্য করিয়া লওয়া হয়। সেই সময় হইতে যোজনা কমিসনের সদস্যদিগকে আর কেবিনেটে উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় না।

কেবিনেটের সহিত সম্বন্ধ

যোজনা কমিসনের নয় জন সদস্য। তাহার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সভাপতি; যোজনা-মন্ত্রী, সহকারী সভাপতি, এবং অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও পরিসংখ্যান-বিশেষজ্ঞ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীমান্ নারায়ন, টি. এন. সিং, এ. এন. খোসলা ও টি. এম. ত্রিবেদী সাধারণ সদস্য। যোজনা মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য একজন সহকারী মন্ত্রী ও একজন পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি আছেন। সদস্যদিগকে এক একজনকে নিম্নলিখিত এক একটি বিভাগের ভার দেওয়া হয়—(১) সাধারণ যোজনা ও সামাজিক কল্যাণ (২) অর্থ

সংগঠন

(৩) শিল্প (৪) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (৫) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিকাশ (৬) পূর্ত ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি (৭) পরিসংখ্যান।

যোজনা কমিসন ভারতের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন যাহাতে দেশের ধনসম্পত্তি ও জনবল সবচেয়ে ভালো উপায়ে নিয়োজিত হইতে পারে তাহার পরিকল্পনা করেন, এবং পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তর সার্থক করিবার জন্য কি কি প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ করেন।

কার্য

আমাদের দেশের যোজনা কমিসন কিন্তু ভারত সরকারকে পরামর্শপ্রদানের জন্য একটি সংগঠন। ইহার স্বয়ং কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। তবে জনমত গঠন ও সমষ্টি উন্নয়নের পর্যবেক্ষণ ইহারা করিতে পারেন। সংসদের নিকট অনুমোদন না পাইলে কোন কার্যই আরম্ভ করা যায় না। রাশিয়ার যোজনা কমিসনের ক্ষমতার তুলনায় ভারতীয় যোজনা কমিসনের ক্ষমতা নিতান্ত অল্প। এখানে লোককে বুঝাইয়া সুঝাইয়া যতটা করা যায় তাহাই করা হয়; জোর জবরদস্তি করিয়া লোকদের নিকট হইতে কোন কাজ আদায় করা হয় না।

রাশিয়ার যোজনা কমিসনের সহিত পার্থক্য

সংসদ (Parliament)

সংসদের সংগঠন ঃ ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট যেমন রানী, হাউস অব লর্ডস এবং হাউস অব কমন্স লইয়া গঠিত, ভারতীয় সংসদ তেমনি রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া সংগঠিত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি তথাকার কংগ্রেসের অংশরূপে বিবেচিত হন না; কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি সংসদের অঙ্গীভূত। সংবিধানে প্রথম সদনের নাম House of the People এবং দ্বিতীয় সদনের নাম Council of States লিখিত আছে। সংবিধানের কোন সংশোধন না করিয়াই ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে লোকসভার স্পীকার ঘোষণা করেন যে প্রথম সদনকে লোকসভা ও দ্বিতীয় সদনকে রাজ্যসভা বলা হইবে। ঐ নামই এখন ব্যবহৃত হইতেছে।

সংবিধানে প্রথমে লিখিত ছিল যে বিভিন্ন রাজ্য হতে সরাসরি ভাবেই লোকসভায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা পাঁচশতের বেশি হইতে পারিবে না। কিন্তু

লোকসভার মোট সদস্যসংখ্যা

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তম সংশোধনীর দ্বারা স্থির করা হয় যে ঐ সংখ্যা ৫২০ র বেশি হইবে না, তাহার মধ্যে আবার ২০ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইবেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের শেষে চতুর্দশ সংশোধনীর দ্বারা আবার ঐ সংখ্যাকে বাড়াইয়া ৫২৫ করা হইয়াছে; কারণ পণ্ডিচারি ও গোয়া প্রভৃতি হইতে নির্বাচিত সদস্যদিগকে লোকসভায় স্থান দেওয়া প্রয়োজন। এই ৫২৫ জন নির্বাচিত সদস্য ছাড়া অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে দুইজনকে রাষ্ট্রপতি ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মনোনীত করিতে পারেন। যখন রাষ্ট্রপতি দেখিতে পান যে সাধারণ

বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা

নির্বাচনে ঐ সম্প্রদায়ের কেহ নির্বাচিত হন নাই তখন তিনি দুইজনকে মনোনীত করিতে পারেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে লোকসভায় ৫২৭ জন পর্যন্ত সদস্য থাকিতে পারেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে লোকসভায় ৫০৫ জন সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচারি প্রভৃতি হইতে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত লোকসভায় সর্বসাকুল্যে ৫০৯ জন সদস্য ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে ৪৩, আসাম ১২, বিহার ৫৩, গুজরাত ২২, কেরালা ১৮, মধ্যপ্রদেশ ৩৬, মাদ্রাজ ৪১, মহারাষ্ট্র ৪৪, মহীশূর ২৬, উড়িষ্যা ২০, পাঞ্জাব ২২, রাজস্থান ২২, উত্তরপ্রদেশ ৮৬,

পশ্চিমবঙ্গ ৩৬, দিল্লী ৫, হিমাচল প্রদেশ ৪, মণিপুর ২ ও ত্রিপুরা ২ এই ৪৯৪ জন নির্বাচিত হন। বাকী ১৫ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লোকসংখ্যার অনুপাতে সদস্যসংখ্যা স্থির করা হইয়াছে। প্রত্যেক পাঁচলক্ষ অধিবাসীর জন্য একজনের বেশি সদস্য থাকিবেন না। জম্মু ও কাশ্মীর হইতে ছয়জন সদস্য তথাকার আইনসভার সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। রাষ্ট্রপতি আন্দামান ও নিকোবরের ১ জন, লাক্ষাদিব প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে ১ জন, দাদরা ও নগর হাভেলি হইতে ১ জন, গোয়া, দমন ও দিউ হইতে ২ জন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল হইতে ১ জন এবং নাগাল্যাণ্ড হইতে ১ জন সদস্যকেও মনোনয়ন করেন। ইহা ছাড়া ২ জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মনোনীত সদস্য আছেন। মনোনীত সদস্যরাও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু এরূপ হইলে গণতন্ত্রের প্রভাব কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

লোকসভার সদস্য হইতে হইলে প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং তাঁহার বয়স অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া প্রয়োজন। তিনি ভারতসরকার অথবা রাজ্যসরকারের অধীনে কোন লাভজনকপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

লোকসভার সদস্যদের যোগ্যতা

সরকারী করপোরেশনের কর্মচারী, ডিরেক্টর বা ম্যানেজিং এজেণ্ট সংসদের সদস্য হইতে পারেন না। সরকারের ঠিকাদারী করে এমন কোন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কও সংসদের সদস্য হইতে পারেন না। তবে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারির ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতির (Vice Chancellor) পদকে লাভজনক পদের আওতার মধ্যে ফেলা হয় নাই। দেউলিয়া বা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিও সংসদের সদস্য হইতে পারেন না। যাঁহারা নির্বাচনে অসাধু পন্থা অবলম্বনের জন্য কোন বিচারালয় কর্তৃক কয়েক বৎসরের জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না বলিয়া দণ্ডিত হন তাঁহারা ঐ সময়ের মধ্যে নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারেন না। যে সকল সরকারী কর্মচারী উৎকোচগ্রহণের অপরাধে বা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অভাবের অভিযোগে বরখাস্ত হইবেন তাঁহারা পাঁচবৎসর কালের মধ্যে সংসদের সদস্যপদের প্রার্থী হইতে পারিবেন না। সদস্যদের শিক্ষাদীক্ষার সম্বন্ধে সংবিধানে কোন নিয়মকানুন নাই। নিরক্ষর ব্যক্তিও সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন।

যে সকল ভারতীয় নরনারীর বয়স একুশ বৎসর বা তাহার চেয়ে বেশি হইয়াছে তাঁহারাই লোকসভার নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। কেবলমাত্র পাগল, দেউলিয়া,

ফৌজদারি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী অথবা নির্বাচনসংক্রান্ত আইনভঙ্গ করিবার জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি ভোট দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হন।

ভোটারের যোগ্যতা

যাঁহারা ভোটার হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন তাঁহাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হয় যে তাঁহাদের নাম যেন ভোটারের তালিকায় স্থান পায়।

অনুন্নত তপশিলী জাতি ও জনজাতির লোকেরা যাহাতে সংসদে নির্বাচিত হইতে পারে সেইজন্য কতকগুলি আসন তাঁহাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

অনুন্নত জাতির সদস্যদের সংখ্যা

সংবিধান চালু হইবার সময় হইতে দশ বৎসর কালের জন্য ঐরূপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর দ্বারা ঐ সংরক্ষণের সময় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত করা হইয়াছে। এই জন্য বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চল হইতে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে নিম্নলিখিত সদস্যসংখ্যা সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে—

রাজ্য বা অঞ্চল	মোট সদস্যসংখ্যা	তপশিলীজাতির জন্য সংরক্ষিত	তপশিলী জনজাতির জন্য সংরক্ষিত
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪৩	৬	২
আসাম	১২	১	২
বিহার	৫৩	৭	৫
গুজরাত	২২	১	৩
কেরল	১৮	২	×
মধ্যপ্রদেশ	৩৬	৫	৭
মাদ্রাজ	৪১	৭	×
মহারাষ্ট্র	৪৪	৬	২
মহীশূর	২৬	৩	×
উড়িষ্যা	২০	৪	৪
পাঞ্জাব	২২	৫	×
রাজস্থান	২২	৩	২
উত্তর প্রদেশ	৮৬	১৮	×
পশ্চিম বঙ্গ	৩৬	৬	২
দিল্লী	৫	১	×
হিমাচল প্রদেশ	৪	১	×
মণিপুর	২	×	১
ত্রিপুরা	২	×	১
	৪৯৪	৭৬	৩১

সংসদের দ্বিতীয় সদনে অর্থাৎ রাজ্যসভায় ২৫০ জনের বেশি সদস্য থাকিতে পারিবে না। ইহাদের মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মানোনীত হন। মানোনীত সদস্যদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজসেবা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। সমাজসেবা শব্দটি খুব ব্যাপক। তাই মনোনীত সদস্যদের মধ্যে আমরা দুইজন প্রাক্তন রাজ্যপালকেও দেখিতে পাই। এখন রাজ্যসভায় ২২৪জন নির্বাচিত সদস্য অছেন। তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে অপ্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন। রাজ্যসভাগুলির বিধানসভায় (Legislative Assembly) নির্বাচিত সদস্যগণ হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে (Proportional Reperesentation by means of the single transferable vote) নির্বাচন করেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এক একটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী রাজ্যসভার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বা সুইট্জার-ল্যাণ্ডের আইনসভার দ্বিতীয় সদনে ছোট বড় প্রত্যেক রাজ্য বা ক্যাণ্টন যেমন সমান সংখ্যক সদস্য প্রেরণ করেন, ভারতবর্ষে সেইরূপ নহে। এখানে লোকসংখ্যার অনুপাতে দ্বিতীয় সদনেও সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। অন্ধ্র হইতে ১৮, আসাম ৭, বিহার ২২, গুজরাত ১১, কেরালা ৯, মধ্যপ্রদেশ ১৬, মাদ্রাজ ১৮, মহারাষ্ট্র ১৯, মহীশূর ১২, উড়িষ্যা ১০, পাঞ্জাব ১১, রাজস্থান ১০, উত্তরপ্রদেশ ৩৪, পশ্চিমবঙ্গ ১৬, জম্মু ও কাশ্মীর ৪, দিল্লী ৩, হিমাচল প্রদেশ ২, মণিপুর ১, এবং ত্রিপুরা হইতে ১ জন সদস্য নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা আছে। ত্রিপুরা, মণিপুর ও হিমাচল প্রদেশের যে আঞ্চলিক পরিষদ (Territorial Council) আছে তাহার সদস্যেরাই নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) হিসাবে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচন করেন। দিল্লীতে পৌরসভার সদস্যগণ ও ১০ জন প্রত্যক্ষরূপে নির্বাচিত ব্যক্তি লইয়া যে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় তাহার দ্বারা তথাকার তিনজন রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। মোটের উপর ১২ জন মনোনীত সদস্য ছাড়িয়া দিলে আর সকলেই অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

রাজ্যসভার সদস্যদের সংখ্যা ও নির্বাচনপ্রথা

রাজ্যসভার সদস্যদের বয়স অন্ততঃপক্ষে ত্রিশ বৎসর হওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদিগকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং যে রাজ্য বা অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইবেন সেখানকার ভোটার হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু শেষোক্ত নিয়মটি জম্মু ও কাশ্মীরের বেলায় প্রযুক্ত হয় না।

রাজ্যসভার সদস্যদের যোগ্যতা

যে যে বিধি-নিষেধ লোকসভার সদস্যদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেগুলি রাজ্যসভার সদস্যদের সম্বন্ধেও খাটে।

রাজ্যসভা চিরস্থায়ী

রাজ্যসভার সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত বা মানোনীত হন। তবে তাঁহাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ দুইবৎসর পরি পর অবসরগ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থার ফলে কোন সময়েই রাজ্যসভা নূতন করিয়া গঠিত হয় না। কেন না ইহার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সব সময়েই অল্পাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন। রাজ্যসভা এই হিসাবে চিরস্থায়ী।

সাধারণতঃ লোকসভার স্থায়িত্বকাল পাঁচ বৎসরের বেশি হইতে পারে না। তবে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেও লোকসভা ভাঙিয়া নূতন করিয়া নির্বাচন করিবার আদেশ দিতে পারেন। ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট

লোকসভার স্থিতিকাল

যেমন আইন করিয়া হাউস অব কমন্সের স্থায়িত্বকাল যথেচ্ছ-ভাবে বৃদ্ধি করিতে পারেন ভারতের সংসদ সেরূপ পারেন না। পাঁচ বৎসরের বেশি সংসদ স্থায়ী হইতে পারে কেবল মাত্র একটি ক্ষেত্রে। যে সময়ে নির্বাচন হইবার কথা সে সময়ে যদি রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন তাহা হইলে একবারের জন্য এক বৎসরকাল নির্বাচন স্থগিত থাকে এবং লোকসভার আয়ু বৃদ্ধি পায়। জরুরি অবস্থা যদি ৪ বছর ধরিয়া চলে তাহা হইলে এক এক বার করিয়া আরও চার বৎসরের জন্য লোকসভার স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু জরুরি অবস্থার ঘোষণা কার্যকরী হইবার পর ছয় মাসের বেশি নির্বাচন স্থগিত রাখা যাইবে না।

সংসদের সদস্যদের পেশা, ভাতা প্রভৃতির বিবরণ: ব্রিটিশ আমলে উকীল ব্যারিস্টারেরা এবং জমিদারেরা আইনসভার অধিকাংশ আসন অধিকার করিয়া থাকিতেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় আইনপরিষদের সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৩৭ জন ছিলেন আইনজীবী। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে উহা কমিয়া শতকরা ৩৩ জনে দাঁড়ায়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় অ্যাসেমব্লিতে ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন ছিলেন জমিদার, ৩২জন আইনজীবী, ৩০জন ব্যবসায়ী ও ১৭ জন অন্য পেশাভুক্ত। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে

সদস্যদের পেশা

আমাদের প্রথম সংসদ নির্বাচিত হইবার পর হিসাব করিয়া দেখা যায় যে সদস্যগণ নিম্নলিখিত পেশাভুক্ত ছিলেন।

	লোকসভার সংখ্যা	রাজ্যসভার সংখ্যা
জমির উপস্বত্বভোগী	৯৩	৩৩
ব্যবসাবাণিজ্য	৪৯	২৮
আইনজীবী	১২৭	৬০
সংবাদপত্রসেবী	৩৮	২০
শিল্প-ব্যবসায়ী	৩৪	২১
চাকুরিজীবী	১০	১১
অন্যান্য পেশা	২৪	১২
সমাজসেবা (Public Work)	৮৫	২৯
অজ্ঞাত	৩৯	২

উকীল ও জমিদারদের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। তবে ভারতীয় রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব অধিকারীদের মধ্যে কেহ কেহ সংসদে নির্বাচিত হইয়াছেন। গত পনের বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে একশ্রেণীর পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীর উদ্ভব হইয়াছে। তাঁহারা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোন কাজই করেন না। ইহাদের মধ্যে অনেকে সংসদে নির্বাচিত হইতেছেন। নির্বাচন ব্যাপারে আমাদের দেশের কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ বেশ সংরক্ষণশীলতার পরিচয় দিতেছেন। সাধারণতঃ যাঁহারা একবার সংসদে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ করেন। এই উক্তি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

সংসদের সদস্যদের শিক্ষা-দীক্ষা কতদূর তাহার আভাষ পাওয়া যায় প্রথম সংসদের (১৯৫২-৫৭) সদস্যদের বিদ্যাশিক্ষার বিবরণের বিশ্লেষণ হইতে।

সদস্যদের শিক্ষাদীক্ষা

	লোকসভায়	রাজ্যসং
বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত	৪৫	৩৫
ভারতে স্নাতক	২৪৬ (শতকরা ৪৯ ভাগ)	১০৫
কলেজে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত	৬৬	৩১
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষিত	৬০	১৬
মধ্যবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত	৭	৪
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত	৮	৩

	লোকসভায়	রাজ্যসভায়
টোল ও মক্তবে পড়া	১৬	৮
ঘরে পড়া	৮	৬
অজ্ঞাত	৪৩	৮

অনুন্নত জাতি ও জনজাতির অন্তর্ভুক্ত কোন কোন সদস্য লেখাপড়ায় কিছু কম হইলেও, সাধারণতঃ সংসদের সভ্যরা মোটামুটি শিক্ষিত। সংসদের বিতর্ক বুঝিবার মতন বিদ্যাবুদ্ধি প্রায় সকল সদস্যেরই আছে।

ব্রিটিশ আমলে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইনসভায় মহিলা সদস্য বড় একটা দেখা যাইত না। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে মহিলারা নির্বাচনক্ষেত্রে আগাইয়া আসিতেছেন। সংসদে তাঁহাদের সংখ্যা প্রত্যেক নির্বাচনের পর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে লোকসভায়

সংসদের নারী সদস্য

জন ও রাজ্যসভায় ১৭ জন মহিলা:

লিখিত রাজ্য ও অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইয়া সংসদে আসিয়াছেন।

	লোকসভায়	রাজ্যসভায়
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪	২
আসাম	২	১
বিহার	৭	১
গুজরাত	২	০
কেরল	১	২
মধ্যপ্রদেশ	৬	১
মাদ্রাজ	৩	১
মহারাষ্ট্র	১	১
মহীশূর	১	২
উড়িষ্যা	০	১
রাজস্থান	১	০
উত্তরপ্রদেশ	৬	২
পশ্চিমবঙ্গ	২	১
		১
মনোনীত	০	১
	৩৬	১৭

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে নারী সদস্যের সংখ্যা লোকসভায় ছিল ২৭। পাঞ্জাব হইতে কোন নারী সংসদের কোন সদনে নির্বাচিত হন নাই।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ব্রিটেনের পার্লামেণ্টে ২৫ জন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ১৭ জন মাত্র ও জাপানের সংসদে ২৩ জন নারী সদস্য আছেন।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যগণ প্রতিদিনের উপস্থিতির জন্য ৪৫ টাকা হারে ভাতা পাইতেন। তখন বছরে একশত দিনের বেশি আইন-সভার অধিবেশন হইত না। সদস্যেরা ১½ ফার্স্ট ক্লাসের রেলের ভাড়া পাইতেন। এখন তাঁহারা মাসে চারশত টাকা বেতন এবং সংসদের অধিবেশনের স্থানে প্রতি দিন উপস্থিতির জন্য দৈনিক একুশ টাকা হিসাবে ভাতা পান। তা ছাড়া বিনা ভাড়ায় ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়া ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিবার পাস পান। এইরূপ ভ্রমণের জন্য দেশবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের চাক্ষুষ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিবে বলিয়া ঐরূপ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যদের তুলনায় আমাদের সংসদের সদস্যরা অনেক কম বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন। তবে ব্রিটেনে পার্লামেণ্টের সদস্যদের জন্য সরকারী বাসস্থানের ব্যবস্থা নাই, দিল্লীতে আছে।

সদস্যদের বেতন ও ভাতার হার

সংসদের সদস্যেরা নিয়মিতভাবে সংসদে উপস্থিত থাকিবেন আশা করিয়া তাঁহাদের উপযুক্ত ভাতা ও বেতনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি শারীরিক অসুস্থতা, বিদেশে ভ্রমণ বা অন্য কোন কারণে তাঁহাদের পক্ষে সংসদে উপস্থিত থাকা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ছুটির জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। সংসদের একটি কমিটির উপর ঐ সব দরখাস্ত বিবেচনা করিবার ভার দেওয়া হয়। ঐ কমিটি সুপারিশ করিলে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তবে একসঙ্গে ষাটদিনের বেশি কেহ ছুটি পাইতে পারেন না। প্রয়োজন হইলে দুইবার ৫৯ দিন করিয়া ছুটি লওয়া যাইতে পারে। তবে যদি কোন সদস্য প্রায় সময়ই সংসদে অনুপস্থিত থাকেন তবে তাঁহার আসন শূন্য হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা যাইতে পারে।

সদস্যদের অনুপস্থিতি

সংসদে প্রতি দিন উপস্থিত হইয়া সদস্যদিগকে হাজিরা বইয়ে নাম সহি করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদিগকে যে সব সময়েই সভাকক্ষে উপস্থিত থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তবে সভায় বসিয়া গল্প করা, খবরের কাগজ পড়া কিংবা নিদ্রা উপভোগ করা চলে না।

সংসদের কার্য ও ক্ষমতা (Powers and Functions of Parliament): ভারতীয় সংসদ ব্রিটেনের পার্লামেণ্টের মতন সার্বভৌম নহে। তাহার

তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, ব্রিটেনে কোন লিখিত সংবিধান নাই, ভারতের সংবিধান লিখিত ; সেইজন্য ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা সংবিধানের দ্বারা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটেন এককেন্দ্রিক রাজ্য সেইজন্য সেখানকার পার্লামেণ্ট সকল বিষয়ে আইন তৈয়ারি করিবার অধিকারী। কিন্তু ভারতে কতকটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যে সকল বিষয়ে আইন তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা সংবিধানে আঙ্গিক রাজ্যগুলির হাতে দেওয়া হইয়াছে, সে সব বিষয়ে সংসদ আইন করিতে পারেন না—তবে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে পারেন। তৃতীয়তঃ, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট যদি কোন মামলার বিচার করিবার সময় দেখেন যে সংসদ তাহার ক্ষমতা লঙ্ঘন করিয়া আঙ্গিক রাজ্যের ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া আইন করিয়াছেন অথবা নাগরিকের মৌলিক অধিকার কোন আইনের দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে তাহা হইলে সেই আইনকে বে-আইনী সাব্যস্ত করিতে পারেন। ব্রিটেনের কোন আদালতের এরূপ ক্ষমতা নাই। সংবিধানের দ্বারা ভারতীয় সংসদের ক্ষমতাকে কিছুটা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্যান্য সব বিষয়ে তাহার প্রাধান্য বজায় আছে। গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (**Gopalan V The State of Madras**) মামলার রায় দিতে যাইয়া সুপ্রিম কোর্ট ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বলেন **"Our Constitution unlike the American Constitution, does not recognise the absolute supremacy of the Court over the legislative authority, in all respects, for outside the restricted field of constitutional limitations our Parliament and the State Legislatures are supreme in their respective legislative fields and in that wider field there is no scope for the Court in India to play the role of the Supreme Court of the United States".** সংসদের কার্যপদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসৃত হইয়াছে কিনা সে বিষয়েও আদালত কোন প্রশ্ন তুলিতে পারেন না।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের তুলনায় ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ

সংসদকে আইনসভা বলা হয়। কিন্তু আইন তৈয়ারি করাই ইহার প্রধান বা একমাত্র কার্য নহে। বস্তুতঃ আইন তৈয়ারির কাজ এমন জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ যে পাঁচ সাত শত ব্যক্তি একত্রে মিলিত হইয়া উহা করা একপ্রকার অসম্ভব। মন্ত্রিমণ্ডলী অথবা ক্যাবিনেট যে নীতি অনুসারে কোন আইন তৈয়ারি

করিতে চাহেন তাহা অনুসরণ করিয়া খসড়া তৈয়ারে করায় অভিজ্ঞ আইনবিদ্ ব্যক্তিরা বিল প্রস্তুত করেন। সংসদ সেই বিলের দোষগুণ বিচার করেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের নিয়মানুবর্তিতার দরুণ সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সদস্যগণ সাধারণতঃ ক্যাবিনেটের প্রস্তাবিত আইন অনুমোদন করিয়া থাকেন। বিরোধী দলের সদস্যগণ প্রস্তাবিত আইনের দোষ দেখাইয়া বক্তৃতা করেন। উভয় দলের তর্কবিতর্কের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে ঐ বিষয়ে জনমত গঠিত হয়। দুই চারিটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিকূল জনমতের চাপে ক্যাবিনেটের দ্বারা উত্থাপিত বিলের কিছু অদলবদল করা হয়; কিন্তু সাধারণতঃ সংসদ সরকারী বিল পাস করিয়া থাকেন।

আইন তৈয়ারিতে সাহায্য করা

সংসদের প্রধান কার্য হইতেছে ক্যাবিনেটের সংগঠন ও স্থায়িত্ব বিধানের ব্যবস্থা করা এবং তাহার অবলম্বিত নীতি ও কার্যাবলীর সমালোচনা করা। মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যকে সংসদের কোন না কোন সদনের সদস্য হইতে হয়। সংসদের প্রথম সদন লোকসভার নিকট ক্যাবিনেট দায়িত্বশীল। সেইজন্য রাষ্ট্রপতি এমন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন যিনি লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করিতে পারেন। লোকসভা যাঁহাকে Leader of the House রূপে নির্বাচিত করেন তিনিই প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী আবার তাঁহার সহকর্মী অন্যান্য মন্ত্রীকে এমনভাবে মনোনীত করেন যাহাতে তাঁহার পক্ষে লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করা ও উহা অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়। যদি কোন কারণে লোকসভার সদস্যদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি সভ্য ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিবার পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রীকে হয় পদত্যাগ করিতে হয় নয় তো লোকসভার পুনার্নির্বাচন ঘটাইবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করিতে হয়।

ক্যাবিনেটের স্থায়িত্ব বিধান ও সমালোচনা করা

মন্ত্রীরা সংসদে নিজেদের কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দিয়া জনমতকে নিজেদের অনুকূলে আনিবার চেষ্টা করেন। সংসদের যে কোন সদনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, অধিবেশন মুলতুবি রাখিবার প্রস্তাব তুলিয়া, কিংবা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আনিয়া মন্ত্রীদের কাজের সমালোচনা করা যাইতে পারে। বাজেটের বিতর্ক উপলক্ষে এবং কোন বিলের আলোচনার সময়ও সংসদ মন্ত্রীদের কাজে চুলচেরা বিচার করিতে পারেন। সংসদের অধিবেশন উদ্বোধন করিবার সময় রাষ্ট্রপতির

আলোচনায় জনমত গঠন

অভিভাষণ সমালোচনার জন্য সংসদে কয়েকদিন সময় দেওয়া হয়। সেই সময় সরকারের অবলম্বিত নীতি সম্বন্ধে যে কোন সদস্য প্রতিবাদ জানাইতে পারেন এই সব উপায় অবলম্বন করিয়া সংসদ ক্যাবিনেটের উপর কিছুটা কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। দেশের জনসাধারণ সংসদের বিচারবিতর্কের বিবরণ পড়িয়া সরকার কিরূপ কাজকর্ম করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারেন। এইভাবে সংসদ জনমত গঠনে সহায়তা করেন।

সরকারের কাজ চালাইবার জন্য কর ধার্য করা ও অর্থমঞ্জুর করা লোকসভার একটি প্রধান কার্য। ক্বচিৎ কখনও সরকার অর্ডিনান্স পাস করিয়া কর বসাইয়াছেন বটে কিন্তু সাধারণতঃ সংসদের অনুমোদন ছাড়া জনসাধারণের নিকট হইতে কোন কর গ্রহণ করা হয় না। সরকার যে কোন প্রকার কর বসাইবার প্রস্তাব করিবেন তাহাই সংসদ মানিয়া লইতে বাধ্য নহেন। কখনও কখনও অর্থমন্ত্রী বিরুদ্ধ দলের সমালোচনা শুনিয়া কোন কোন কর বসাইবার দাবি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু সাধারণতঃ সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিয়া অর্থমন্ত্রীর দাবি দলের সদস্যদের ভোটের জোরে পাস হইয়া যায়। বিভিন্ন খাতে খরচা বাবদ যে টাকা সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরি করা হয় তাহা যথাযথভাবে ব্যয়িত হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য দুইটি সংসদীয় কমিটি ও অডিটর এবং কম্পট্রোলার জেনারেল নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সংসদের পক্ষে ব্যয়বিষয়ক প্রত্যেকটি প্রস্তাবের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করা সম্ভব নহে। বিনা আলোচনায় সময় সময় কোটি কোটি টাকা খরচার জন্য মঞ্জুর করা হয়।

আয়ব্যয়ের উপর সংসদের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ

মোটের উপর সংসদ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য চালাইবার জন্য অথবা উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সংসদে বিচারবিতর্ক করিয়া ক্যাবিনেটকে একদিকে জনমত অনুসারে কার্য করিতে বাধ্য করা হয়, অন্যদিকে জনমতগঠনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। সংসদকে কেবলমাত্র কেবিনেটের সিদ্ধান্ত পাকা করিবার (Registration of decisions of the Cabinet) প্রতিষ্ঠানরূপে দেখিলে ভুল বুঝা হইবে। ভারতীয় সংসদের প্রতিকূল মনোভাব দেখিয়া কেবিনেট হইতে অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রভৃতি প্রভাবশালী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিয়াছেন এবং অনেক সরকারী বিল প্রত্যাহৃত বা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। আমাদের দেশের

সংসদ গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক

প্রধানমন্ত্রী গণতান্ত্রিক সমালোচনাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়া থাকেন। সংসদের নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের ভোটের মূল্য রাজ্যগুলির আইনসভার সদস্যদের ভোটের সমান। দুই সদনের সদস্যগণ উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংসদ সংবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করিবার অভিযোগ আনিতে পারেন না। হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের যে কোন বিচারকের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা বা দুর্নীতির অভিযোগ আনিয়া সংসদ রাষ্ট্রপতিকে আবেদন করিতে পারেন এবং উভয় সদনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে ঐ আবেদন পাস হইলে ঐ বিচারক অপসারিত হন। সংবিধান সংশোধনে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন সংসদ। কয়েকটি বিষয়ে অবশ্য সংশোধন করিতে হইলে আঙ্গিক রাজ্যগুলির অর্ধেকের আইনসভায় উহা সমর্থিত হওয়া (ratification) প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ বিষয়ের সংশোধনই উভয় সদনের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে পাস করা হয়। এই হিসাবে ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা আমেরিকান কংগ্রেস অপেক্ষা বেশি।

সংসদের অন্যান্য ক্ষমতা

উভয় সদনের ক্ষমতা ও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ (Powers of the two Houses and the relation between them) : লোকসভা জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত কিন্তু রাজ্যসভা আঙ্গিক রাজ্যসমূহের বিধানসভার (Legislative Assembly) দ্বারা অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত। তাই রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার ক্ষমতা বেশি। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় রাজ্যসভা হাউস অব লর্ডসের মত একেবারে ক্ষমতাহীন নহে। তাহার কারণ এই যে রাজ্যসভা আঙ্গিক রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন। সুতরাং এরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আছে।

রাজ্যসভার ক্ষমতা কেন কম ?

Money Bill বা অর্থ সংক্রান্ত বিল রাজ্যসভায় প্রথমে পেশ করা যায় না। কোন্ বিলকে অর্থবিষয়ক বিল বলা হইবে সে সম্বন্ধে লোকসভার স্পীকার মহোদয়ের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া গৃহীত হয়। রাজ্যসভা ঐ ধরনের বিল প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না, সংশোধনও করিতে পারেন না। তাঁহারা কেবল সুপারিশ করিতে পারেন, কিন্তু উহা লোকসভা গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারেন। কোন Money Bill লোকসভা

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে লোকসভার প্রাধান্য

হইতে পাইবার পর ১৪ দিনের মধ্যে যদি রাজ্যসভা ঐ সম্বন্ধে কোন সুপারিশ না করেন অথবা যদি ঐ সুপারিশ লোকসভা অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে উহা সংসদের উভয় সদন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

সরকার খরচার মঞ্জুরির জন্য লোকসভার শরণাপন্ন হন, রাজ্যসভার নহে। রাজ্যসভা খরচা মঞ্জুরি বিষয়ে বিতর্ক করিতে পারেন, কিন্তু উহার উপর ভোট দিতে পারেন না।

অন্যান্য বিষয়ে সমান ক্ষমতা

টাকা পয়সা সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য ধরনের বিল পাস করা বা অগ্রাহ্য করার বিষয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভার সমান ক্ষমতা। সাধারণ বিল যে কোন সদনে প্রথমে উপস্থিত করা যায়। এক সদন প্রত্যাখ্যান করিলে উহা পাস করানো যায় না।

যদি এক সদন কোন বিষয়ে আইন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং অন্য সদন উহা প্রত্যাখ্যান করিতে দৃঢ়সংকল্প হন তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে এক অচল অবস্থার (deadlock) উপস্থিত হয়। (ক) এক সদন যে সংশোধনী প্রস্তাব পাস করিলেন অন্য সদন তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, (খ) অথবা যদি মূল প্রস্তাবটিই অন্য সদনের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় কিংবা (গ) ছয় মাসের মধ্যে একটি সদন তাঁহার মতামত প্রকাশ না করেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি ঐ বিষয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার জন্য উভয় সদনের এক সম্মিলিত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। ঐ অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্য যেদিকে মত দেন তাহাই গৃহীত হয়।

অচল অবস্থা সমাধানের উপায়

এই নিয়ম অনুসারে মনে হয় যে রাজ্যসভার ক্ষমতা লোকসভার সঙ্গে সমান, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে লোকসভার সদস্য সংখ্যা রাজ্যসভা অপেক্ষা দ্বিগুণের বেশি বলিয়া লোকসভারই মত বজায় থাকিবার অধিক সম্ভাবনা। যদি কোন বিল লোকসভায় ২৭০ জন সভ্যের ভোটে পাস হয় এবং ২৩৯ জন সভ্য উহার বিপক্ষে থাকেন তাহা হইলে রাজ্যসভার মাত্র একশতটি ভোট পাইলেই উহা সম্মিলিত অধিবেশনে পাস হইয়া যাইবে। কিন্তু লোকসভায় যদি ঐ বিলের পক্ষে ২৬০ জন থাকেন ও রাজ্যসভার ১০০ জনের ভোট তাঁহারা পান তাহা হইলে কিন্তু বিপক্ষদলের লোকসভার ২৪৯ ভোট ও রাজ্যসভার ১২৪ ভোটের জোরে উহা নাকচ হইয়া যাইবে এবং রাজ্যসভারই জয় হইবে। এ পর্যন্ত মাত্র একবার ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মে

মাসে যৌতুকদান নিষেধক বিল বিবেচনার জন্য দুই সদন একত্রে বসিয়াছিল। বর্তমানে উভয় সদনেই কংগ্রেসের যেরূপ বিপুল সংখ্যাধিক্য আছে তাহাতে উভয় সদনের মধ্যে বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে আঙ্গিক রাজ্যের দ্বিতীয় সদন প্রথম সদনের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিতে পারে না, কেবলমাত্র কিছুকালের জন্য ঠেকাইয়া রাখিতে পারে।

মন্ত্রীরা কেবলমাত্র লোকসভায় নিকট দায়ী

আর একটি ব্যাপারে রাজ্যসভার ক্ষমতা লোকসভার চেয়ে কম। মন্ত্রিপরিষদ লোকসভার নিকট দায়ী, রাজ্যসভার নিকট নহে। রাজ্যসভা যদি কোন অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করেন তাহা হইলেও ক্যাবিনেট উহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবেন না। প্রধানমন্ত্রী লোকসভা হইতেই নিযুক্ত হন। দুই এক জন ছাড়া প্রায় সকল মন্ত্রীই লোকসভার সদস্য। শ্রীযুক্ত চ্যবনকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করিবার পর তাঁহাকে রাজ্যসভার সদস্য করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কয়েকজন ভূতপূর্ব মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী লোকসভার নির্বাচনে পরাজিত হইবার পর রাজ্যসভার সদস্যপদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

সংসদের কার্যপদ্ধতি (Procedure of work in Parliament) ঃ সংসদ ভবন ১৯২১ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছয় বৎসরে ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে উহার উদ্বোধন হয়। নির্বাচনের পর সংসদের প্রত্যেক সদনের সেক্রেটারি সদস্যগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদিগকে সংসদের প্রথম অধিবেশনের দিন আহ্বান করেন। সদস্যগণ সংসদে উপস্থিত হইয়া প্রথমে

শপথ গ্রহণ

সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন, তারপর সেক্রেটারির সমক্ষে তাঁহাদের নামে খাতায় স্বাক্ষর করেন। যে সব সদস্য অনিবার্য কারণে প্রথম দিন উপস্থিত থাকিতে পারেন না তাঁহারা পরে যে কোন দিন আসিয়া শপথ লইতে পারেন। শপথ লইবার পূর্বে কেহ সংসদে বসিতে পারেন না। শপথ লইবার পর সদস্যকে সদনের সভাপতি বা স্পীকারের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

নবনির্বাচিত লোকসভার প্রথম কার্য হইতেছে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে নির্বাচন করা। তারপর রাষ্ট্রপতি উভয় সদনের সম্মিলিত অধিবেশনের সমক্ষে

একটি অভিভাষণ প্রথমে হিন্দীতে এবং পরে ইংরাজীতে পাঠ করেন। ঐ অভিভাষণ ক্যাবিনেটের নির্দেশক্রমে লিখিত হয় এবং উহাতে সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করা হয়। প্রতি বৎসরের প্রথম অধিবেশনে (Session) রাষ্ট্রপতি ঐরূপ অভিভাষণে বলেন, সরকার ঐ বৎসর কি কি কাজ করিতে চাহেন। অভিভাষণ পাঠের পর সরকারী দল হইতে রাষ্ট্রপতিকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। আর বিরোধী দল প্রস্তাব করেন যে ঐ প্রস্তাবের সহিত যোগ করা হউক যে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে অমুক অমুক বিষয় উহাতে উল্লেখ করা হয় নাই। স্পীকার মহোদয় সাধারণতঃ ঐ অভিভাষণের উপর বিতর্কের জন্য তিন দিন সময় দেন।

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ

প্রতি বৎসর সংসদের তিনটি অধিবেশন (session) হয়। জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইয়া এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত উহা চলিতে থাকে। আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় এবং নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে তৃতীয় অধিবেশন হয়। ১৯২১ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বিধানসভার বছরে আটষট্টি দিনের বেশি কাজ হইত না। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উহা বাড়িয়া ৯৭ দিন হয়। এখন ১৪০ দিনের চেয়ে বেশি সময় লোকসভার অধিবেশন হইয়া থাকে। রাজ্যসভার অধিবেশন এত বেশি দিন ধরিয়া চলে না।

বছরে তিনটি অধিবেশন

ব্রিটিশ আমলে কেন্দ্রীয় আইনসভা বেলা এগারটার সময় বসিয়া পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করিতেন। কিন্তু দুপুর ১টা হইতে আড়াইটা পর্যন্ত খাওয়া দাওয়ার জন্য সভার কাজ স্থগিত থাকিত। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে সকাল সাড়ে আটটা হইতে দেড়টা পর্যন্ত অধিবেশন হইত, কিন্তু শীতকালে দুপুর দেড়টা দুইটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা বা সাতটা পর্যন্ত সভা বসিত। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে নিয়ম করা হইয়াছে যে, বেলা এগারটা হইতে বৈকাল পাঁচটা পর্যন্ত সভার অধিবেশন হইবে। ইহার মধ্যে কোন সময়েই সভার কাজ স্থগিত থাকিবে না। তবে একটা প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে বেলা একটা হইতে আড়াইটার মধ্যে কেহ সদনের উপস্থিতি সংখ্যা গণনা করিবেন না এবং ঐ সময়ে কোন ভোট লওয়াও হইবে না। এরূপ করিবার কারণ এই যে ঐ সময়ে অনেকেই খাওয়াদাওয়া করিবার জন্য বাসায় যান। সংসদের সাধারণ নিয়ম এই যে প্রত্যেক সদনের মোট সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ এক-দশমাংশ

সভা বসিবার সময়

সদস্য উপস্থিত না থাকিলে কোন সদস্য যদি ঐ সম্বন্ধে স্পীকার বা সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহা হইলে সভার কাজ স্থগিত রাখা হয়।

কোরামের সংখ্যা

লোকসভার কোরাম ছিল ৫০, এখন বোধ হয় উহা ৫১ করা হইবে। রাজ্যসভার কোরাম (quorum) ২৩। সময় সময় কাজের চাপ এত বেশি হয় যে সংসদ বৈকাল পাঁচটার পরও বেশিক্ষণ অধিবেশন চালাইতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রথা আছে যে দেরিতে তর্কবিতর্ক চলিলেও ভোট লওয়া হয় না।

কাজের দিন

সংসদ সপ্তাহে ছয় দিন অর্থাৎ রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিনে বসে। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে শনিবারের দিন সাধারণতঃ কোন কাজকর্ম করা হয় না। প্রয়োজন পড়িলে অবশ্য শনিবারেও সভা করা হয়।

প্রত্যেক শুক্রবারে বেলা আড়াইটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত বে-সরকারী সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত বিল, প্রস্তাব প্রভৃতি আলোচনার জন্য আলাদা করিয়া রাখা হয়।

বে-সরকারী কাজের সময়

লোকসভায় বর্তমানে ৫০৭ জন সদস্য আছেন, কিন্তু উহার সভাকক্ষে ৪৬১ জনের বেশি সদস্যের বসিবার জায়গা নাই। ব্রিটেনের হাউস অব কমন্সেরও ঐ দশা। মহাযুদ্ধের পর কমন্সসভার সদন নূতন করিয়া নির্মিত হইলেও উহাতে মাত্র ৩৪৬ জন সদস্যের বসিবার স্থান আছে, যদিও উহার মোট সদস্যসংখ্যা হইতেছে ৬৩০। অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে যে কিছু সংখ্যক সদস্যই কোন না কোন কারণবশতঃ অনুপস্থিত থাকেন; তাই জায়গার অভাব হয় না। আমাদের লোকসভায় ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম অধিবেশনে গড়ে ৪৩২ জন, দ্বিতীয় অধিবেশনে৩৮৯ জন ও তৃতীয় অধিবেশনে ৩৭১ জন মাত্র সদস্য হাজিরা বইয়ে নাম সহি করিয়াছিলেন।

লোকসভার উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা

যাঁহারা নাম সহি করেন তাঁহারা সব সময়েই যে সভাকক্ষে বসিয়া থাকেন তাহা নহে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সদস্যদের সংখ্যা গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এইবৎসর গড়ে প্রতিঘণ্টায় প্রথম অধিবেশনে ২৪৭ জন, দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৬৩ জন, তৃতীয় অধিবেশনে ১৪৪ জন উপস্থিত ছিলেন। মোটামুটি বলা যায় যে সভা আরম্ভ হইবার পর যখন প্রশ্নোত্তর চলিতে থাকে তখন আড়াইশত আন্দাজ সদস্য উপস্থিত থাকেন, কিন্তু পরে উহা কমিতে কমিতে পঞ্চাশ বাট জনে দাঁড়ায়।

সংসদের প্রত্যেক সদনে প্রতিদিন প্রথম একঘণ্টা সময় প্রশ্নোত্তরে ব্যয়িত হয়। সদস্যেরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মন্ত্রীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁহাদের বা তাঁহাদের অধীন কর্মচারীদের কোন কাজের গাফিলতির প্রতি সংসদের ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংসদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে এই ভয়ে কর্মচারীরা সন্ত্রস্ত থাকেন। প্রশ্নগুলি অনেক সময় সন্ধানী বাতির (Torch light) কাজ করে। সাধারণতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইলে দশদিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়। ব্রিটেনে দুই দিন আগে প্রশ্ন পাঠাইলেই চলে। আমাদের দেশে অনেক সময়ে দশদিনেও প্রশ্নের জবাব মেলে না। গুরুত্বপূর্ণ কোন জরুরি বিষয়ে প্রশ্ন করিতে হইলে দশদিনের কম নোটিশ দিলেও চলে কিন্তু সভাপতি অথবা স্পীকার ঐ বিষয়কে জরুরি বলিয়া মনে করিলে কিংবা মন্ত্রীরা স্বল্প নোটিশে উত্তর দিতে রাজী হইলে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসার নিয়ম

প্রশ্ন দুই ধরনের—কতকগুলি তারকাচিহ্নিত, কতকগুলি অচিহ্নিত। অচিহ্নিত প্রশ্নের লিখিত উত্তর ছাপিয়া দেওয়া হয়; কোন মৌখিক জবাব দেওয়া হয় না এবং উহার পরিপূরক (Supplementary) কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা যায় না। তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর মন্ত্রী মহাশয় মুখে মুখে দেন, তাঁহার উত্তর শুনিয়া প্রশ্নকারী পরিপূরক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। একজন সদস্য একদিনে তিনটির বেশি তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না।

পরিপূরক প্রশ্ন

যে প্রশ্ন যে বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট সেই বিভাগে উহা পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যথাসময়ে উহার উত্তর দেন। বলা বাহুল্য, কর্মচারীরা লিখিয়া দেন কোন্ প্রশ্নের কিরূপ উত্তর দিতে হইবে। এক এক দিন দুইজন করিয়া মন্ত্রীর জবাব দিবার পালা পড়ে। অনেক সময় উপমন্ত্রীরা জবাব দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রশ্নের উত্তর দিবার কৌশল

কে কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দেন তাহা হইতে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব কিরূপ তাহা বুঝা যায়। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিয়া হাসিঠাট্টার মধ্যে যিনি পরিপূরক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তাঁহার প্রতি সদস্যগণ শ্রদ্ধাশীল।

হন। মন্ত্রী মহাশয় ইচ্ছা করিলে কোন প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন। কিন্তু বারংবার যদি কেহ "উত্তর দেওয়া জনস্বার্থের প্রতিকূল" বলিতে থাকেন তাহা হইলে তিনি জনপ্রিয়তা হারান।

সদস্যেরা যত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নোটিশ দেন তাহার সবগুলিই যে বৈধ বলিয়া স্পীকার বা সভাপতি মহাশয় অনুমতি দেন তাহা নহে। কোন্ প্রশ্ন বৈধ কোন্ প্রশ্ন অবৈধ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অনেক নিয়মকানুন আছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে যে সংসদ নির্বাচিত হইয়াছিল তাহার দশম অধিবেশনে ৭৪০১ তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৪৩৮টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অনুমতি দান করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, ১৩৫৮টি অচিহ্নিত প্রশ্ন ছিল। স্বল্প নোটিশে ১৮৫টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ২২টি জিজ্ঞাসা করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

প্রশ্নের বৈধতা নির্ণয়

সময়ে সময়ে মন্ত্রীরা অথবা প্রধানমন্ত্রী সংসদের সামনে তাঁহাদের অবলম্বিত নীতি সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করেন। ব্রিটেনে ঐরূপ বিবৃতিদানের পর সদস্যেরা ঐ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে দেওয়া হয় না।

বিবৃতির পর প্রশ্ন করিতে দেওয়া হয়না

যদি লোকসভার সদস্য মনে করেন যে সহসা কোথায়ও এমন কিছু ঘটিয়াছে যাহার জন্য লোকসভার অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ করিয়া উহার আলোচনা করা উচিত, তাহা হইলে তিনি লোকসভা মুলতুবি রাখার জন্য (Adjournment Motion) নোটিশ দিতেপারেন। সভার কাজ আরম্ভ হইবার পূর্বে এই নোটিশ দিতে হয়। স্পীকার মহোদয় যদি মনে করেন যে ব্যাপার তেমন গুরুতর নহে, উহার ঘটনা সবটা জানা যায় নাই তাহা হইলে তিনি ঐ প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি প্রস্তাব গ্রহণীয় মনে করেন তাহা হইলে প্রশ্নোত্তরের ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর তিনি প্রস্তাবকারী সদস্যকে সভার অনুমতি চাহিতে আদেশ দেন। যদি পঞ্চাশ জন সদস্য উহার সমর্থনের জন্য দাঁড়ান, তাহা হইলে অনুমতি দেওয়া হইল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ঐদিনই বেলা চারটার সময় অথবা স্পীকার মহোদয়ের নির্দিষ্ট তাহার পূর্বে কোন সময় উহা উত্থাপন করা হয়। ঐরূপ প্রস্তাব

মুলতুবি প্রস্তাব

পাস হওয়া সরকারের পক্ষে অপমানজনক। সেইজন্য তাঁহারা উহার বিরোধিতা করেন এবং উহা পাস হইতে দেন না। ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে প্রতি বৎসর গড়ে এরূপ একটি প্রস্তাব উঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে সরকারী পক্ষে প্রচুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলিয়া এ পর্যন্ত মাত্র তিনবার (১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ ওরা আগস্ট ১৯৫১ ও ১২ই মার্চ ১৯৫৯) ঐরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে ১৯২১ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গড়ে দেড়টি করিয়া মূলতুবি প্রস্তাব আলোচিত হইত। মূলতুবি প্রস্তাব রাজ্যসভায় আনীত হয় না।

মূলতুবি প্রস্তাব (Adjournment Motion) ছাড়া সংসদের সদস্তেরা সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় কোন বিষয়েও প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন (Motions on matters of public interest)। স্পীকার বা সভাপতি মহাশয় যদি উহা গ্রহণীয় বিবেচনা করেন তাহা হইলে উহার আলোচনার জন্য সুবিধামত একটি দিন ধার্য করা হয়। সরকার পক্ষ হইতেও সময়ে সময়ে এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সরকার কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদের মতামত নির্ধারণের জন্য ঐরূপ প্রস্তাব উঠাইয়া থাকেন।

জনস্বার্থ সম্পর্কে আলোচনা

কখনও কখনও মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। মন্ত্রিবর্গ লোকসভার নিকট দায়ী বলিয়া ঐরূপ প্রস্তাব কেবলমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপিত হইতে পারে। ব্রিটেনের পার্লামেন্টে বিপক্ষদলের নেতা ঐরূপ প্রস্তাব আনিবার নোটিশ দিলে স্পীকার মহোদয় উহার আলোচনার জন্য একটি দিন ঠিক করিয়া দেন। কিন্তু ভারতীয় সংসদের স্পীকার মহোদয় প্রস্তাবটি লোকসভার সামনে রাখেন এবং এবং যদি পঞ্চাশ জন সদস্য উহার সমর্থনের জন্য নিজ আসন হইতে দণ্ডায়মান হন তাহা হইলে উহা উত্থাপন করিবার অনুমতি দেন। তারপর দশদিনের মধ্যে কোন একটি দিনে উহা আলোচিত হয়। বর্তমানে কংগ্রেস সরকারের স্বপক্ষে যেরূপ বিপুল সংখ্যাধিক্য আছে তাহাতে ঐরূপ প্রস্তাব উঠাইবার বিশেষ কোন সার্থকতা দেখা যায় না। তবে বিরোধীদল ইচ্ছামত সরকারকে নিন্দা করিবার সুযোগ পান।

অনাস্থা প্রস্তাব

Motion ও Resolution সদস্যের সমক্ষে আলোচনার পর ভোট লওয়া হয়। **Resolution** পাস হইলে উহা সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু তিনি উহা কার্যকরী করিতে বাধ্য নহেন। কোন বে-সরকারী সদস্য যদি কোন Resolution প্রস্তাব করিতে চাহেন তবে তাঁহাকে ১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। Motion ও Resolution ছাড়া অন্য এক প্রকারেও বিতর্ক সদনের সমক্ষে উপস্থিত করা যায়। কোন প্রশ্নের উত্তর হইতে বা অন্য কোন উপায়ে যদি কোন সদস্যের মনে হয় যে বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি আধঘণ্টার জন্য উহার উপর বিতর্ক কারবার নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি দিতে পারেন। উহাতে যদি তার দুইজন সদস্য সহি করেন এবং সভাপতি মহোদয় যদি ইহা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিতর্কের শেষে কোন ভোট লওয়া হয় না। অন্য একরকম কার্যবিধি অনুসারে কোন জরুরী ব্যাপার লইয়া আড়াই ঘণ্টার অনধিক কালের জন্য বিতর্কের ব্যবস্থা আছে। ইহারও শেষে কোন ভোট লওয়া হয় না। এরূপ বিতর্কের ফলে জনমত কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা বুঝা যায়। এরূপ বিতর্ক শুধু লোকসভাতেই হয়—রাজ্যসভায় নহে।

স্বল্পকালব্যাপী বিতর্ক

সংসদে বক্তৃতা করিবার জন্য সাধারণতঃ কাহাকেও একঘণ্টার বেশি সময় দেওয়া হয় না। তর্কবিতর্কের অবসান ঘটাইবার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের কোন সদস্য আলোচনার সময় বলিতে পারেন যে এইবার ভোট লওয়া হউক (ইহার ইংরাজী হইতেছে The question be now put)। সভাপতি যদি ঐ প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাহা হইলে উহা সদনের সামনে উপস্থিত করা হয়। অধিকাংশ সদস্য যদি উহার স্বপক্ষে ভোট দেন তাহা হইলে ঐ বিষয়ের উপর আর আলোচনা হইতে পারে না; এবং তৎক্ষণাৎ উহার উপর ভোট লওয়া হয়। ইহাকে Closure বলে। ইহারই এক কঠোরতর প্রকারভেদকে গিলোটিন (Guillotine) বলা হয়। ইহাতে আগে হইতেই ঠিক করা হয় যে একটি বিষয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করা হইবে। ঐ সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়া ভোট লওয়া হয়। আবার সভাপতি মহোদয় ইচ্ছা করিলে কোন বিলের কয়েকটি ধারা সম্বন্ধে কোন বিতর্ক করিতে না দিয়া অপর কয়েকটি ধারার উপর আলোচনা নিবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহাকে ক্যাঙ্গারু (Kangaroo) বলে, কেন না ঐ নামধারী প্রাণীর মত লাফাইয়া লাফাইয়া যাইয়া মাত্র কয়েকটি ধারার উপর আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

বিতর্ক বন্ধ করিবার বিবিধ উপায়

সংসদে ধীরস্থিরভাবে আলোচনা চালাইবার জন্য কতকগুলি নিয়ম করা হইয়াছে। প্রত্যেক সদস্যকে সভাপতি মহোদয়কে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিতে হয়। অপর কোন সদস্যের যুক্তিতর্ক খণ্ডনের সময়েও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া "আপনি যে ঐরূপ বলিয়াছেন উহা মিথ্যা" ইত্যাদি বলা চলে না। সংসদে কোন্ কোন্ শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ তাহার একটি বিরাট তালিকা আছে। ভদ্রভাবে পরস্পরের মধ্যে সংযমের সহিত আলোচনার ব্যবস্থা করিবার জন্য ঐরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। মোটের উপর আমাদের সংসদে সদস্যদের ব্যবহার ধীর ও সংযত। সংসদে কখনও চেয়ার টেবিল ছোড়াছুড়ি করা হয় নাই এবং ঘুসাঘুসিও হয় নাই। ফ্রান্স ও জাপানের সংসদে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আঙ্গিক রাজ্যের আইনসভার তুলনায় ভারতীয় সংসদের সদস্যদের আচরণ অনেক বেশি ভদ্র ও সংযত। তবে কখনও কখনও স্পীকার মহোদয়কে বেশ কঠোরতার সহিত বলিতে হয় যে অমুক সদস্য যদি এরূপ বাধা সৃষ্টি করেন তবে তাঁহাকে সদন হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

সংসদের আলোচনার সংযত ভাব

সংসদের কর্মকর্তাদের বিবরণ: লোকসভার সভাপতিকে স্পীকার বলে। তিনি লোকসভার সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন উপরাষ্ট্রপতি। উভয়েরই নিজ নিজ সদনে কার্যনিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচুর ক্ষমতা আছে। স্পীকারকে লোকসভার সদস্য হইতেই হইবে; যদি কোন কারণে তিনি সদস্যপদ হইতে চ্যুত হন তাহা হইলে আর তিনি স্পীকার থাকিতে পারেন না। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সদস্য নহেন। সভাপতিরূপে কার্য পরিচালনার সময় উভয়েই দলীয় আনুগত্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন। স্পীকার ও রাজ্যসভার সভাপতির মধ্যে কেহই সদনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না এবং কোন পক্ষে ভোট দেন না। তবে কোন বিষয়ে যদি উভয়পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হয় তাহা হইলে তিনি নির্ণায়ক ভোট বা Casting vote দিতে পারেন।

স্পীকারের নির্বাচন ও যোগ্যতা

স্পীকার ও সভাপতি স্থির করেন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেওয়া হইবে কিনা, কোন প্রস্তাব (Motion ও Resolution) পাঠাইতে দেওয়া হইবে কিনা, কোন সংশোধনী প্রস্তাব বৈধ কিনা। বিতর্কের সময় তিনি যে রায়

Ruling দিবেন সকলকে তাহা মানিতে হইবে। সদনে যদি কোন সদস্য বক্তৃতা করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে চুপ করিয়া নিজের আসনের সামনে দাঁড়াইতে হইবে; তিনি হাঁকডাক করিয়া কিছু বলিতে পাইবেন না। স্পীকার ও সভাপতির নজর প্রথমে যাঁহার উপরে পড়িবে তাঁহাকে তিনি বক্তৃতা দিতে অনুমতি দিবেন। সভাপতি যখন কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইবেন তখন বক্তাকে আসন গ্রহণ করিতে হইবে। সভা কোন্ দিনে বসিবে কতক্ষণ বসিবে তাহাও সভাপতি স্থির করিয়া দেন। কোন্ বিষয়ের উপর কতটা সময় দেওয়া হইবে, তাহা তিনি সদনের নায়কের (Leader of House) সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন। কোন্ কাজের পর কোন্ কাজ করা হইবে, তাহাও ঐ ভাবে স্থির করা হয়। সদনে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তিনি সভার কাজ স্থগিত রাখিতে পারেন। কোন সদস্য যদি গোলমাল করেন বা বিসদৃশ আচরণ করেন, তবে তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া অথবা কয়েকদিনের জন্য তাঁহাকে সাসপেণ্ড বা অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য করার ক্ষমতাও তাঁহার আছে।

সভাপতির ক্ষমতা

সংবিধানের প্রকৃত অর্থ এবং সংসদীয় কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে স্পীকার মহোদয় যে ব্যাখ্যা করিবেন তাহাই সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। সংসদের অধিকার বা Privilegesয়ের তিনিই রক্ষক। যাহাতে ঐ অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার প্রতি তিনি সব সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তিনি সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজ করেন।

ব্যাখ্যাকর্তা

স্পীকার মহোদয়ের কতকগুলি প্রশাসনিক ক্ষমতাও আছে। তিনি সদস্যদের বাসস্থানের ও লোকসভার কমিটিগুলির সভা করিবার জায়গা স্থির করিয়া দেন। সংসদের ভিতর সুরক্ষার (security) ব্যবস্থা তাঁহার হাতে। প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া Identity Card থাকে; পুলিশকে উহা দেখাইয়া তবে তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। যেসব দর্শককে ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গকে সংসদে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় তাঁহারাও সভাপতির আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য। তিনি আদেশ দিলে ভোট লওয়া হয় এবং ভোটের ফলাফল তিনিই ঘোষণা করেন।

প্রশাসনিক ক্ষমতা

সংসদের সদস্যদের জন্য যে গ্রন্থাগারটি আছে তাহার পরিচালনার ভারও স্পীকার মহোদয়ের উপর। উভয় সদনের যখন যুক্ত বৈঠক বসে তখন স্পীকারই উহার সভাপতিত্ব করেন। তিনি বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির প্রধান। প্রত্যেক কমিটির সভাপতিকে তিনিই মনোনীত করেন। কোন কমিটি যদি সংসদ ভবনের বাহিরে কোন সভা করিতে চাহেন অথবা কোন রাজ্য সরকারের কর্মচারীকে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকিতে চাহেন তাহা হইলে স্পীকারের অনুমতি হইলে হয়।

কমিটির সভাপতি নিয়োগ

কোন বিল অর্থসম্বন্ধীয় (Money Bill) কিনা সে সম্বন্ধে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া মানিতে হয়।

স্পীকারকে সাহায্য করিবার জন্য একজন ডেপুটি স্পীকারও নির্বাচিত হন। অনেক সময়ে স্পীকার তাঁহার চেম্বারে বসিয়া মন্ত্রী বা অন্যান্য সদস্যদের সহিত যুক্তিপরামর্শ করেন। সেই সময়ে ডেপুটি স্পীকার লোকসভার সভাপতিত্ব করেন। গত বার বৎসরের মধ্যে যে দুইজন ডেপুটি স্পীকার ছিলেন তাঁহারা স্পীকার পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। স্পীকার ছয়জন সদস্যের একটি তালিকা (Panel) তৈয়ারি করিয়া রাখেন। স্পীকার ও তাঁহার ডেপুটি উভয়েই যখন অনুপস্থিত থাকেন তখন ঐ তালিকাভুক্ত একজন সভাপতিত্ব করেন। সেই ভাবে উপরাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবার জন্য একজন রাজ্যসভার ডেপুটিচেয়ারম্যান থাকেন। তিনি স্বয়ং রাজ্যসভার সদস্য এবং অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হন। উপরাষ্ট্রপতি ও ডেপুটি চেয়ারম্যান উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার যে সদস্যকে মনোনীত করিবেন তিনি সভাপতিত্ব করেন। উপরাষ্ট্রপতি চারজন ডেপুটি চেয়ারম্যানের একটি তালিকা (Panel) মনোনয়ন করেন।

ডেপুটি স্পীকার

স্পীকার মহোদয় ২২৫০ টাকা মাসিক বেতন, বাসস্থান এবং মাসিক ৫০০ টাকা অতিথি সৎকারের খরচা বাবদ পান। তাঁহার বেতন ও ভাতা লোকসভায় প্রতি বৎসর পেশ করা হয় না।

ব্রিটেনের স্পীকার বছরে পাঁচহাজার পাউণ্ড বেতন পান। সেখানে একবার যিনি স্পীকাররূপে নির্বাচিত হন তিনি যতদিন কার্যক্ষম থাকেন ততদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তারপর তাঁহাকে বছর চার হাজার পাউণ্ড পেন্সন দেওয়া হয় এবং সাধারণতঃ লর্ড উপাধিতে ভূষিত

স্পীকারের বেতন ও ভাতা

করা হয়। ভারতে এই প্রথা অনুসৃত হয় নাই। একজন স্পীকারকে এক রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। দিল্লী যখন 'গ' বর্গভুক্ত রাজ্য ছিল সেই সময়ে তথাকার স্পীকার দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন ও পরে এক রাজ্যের রাজ্যপাল হইয়াছিলেন। স্পীকারকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব আনিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয় এবং এ প্রস্তাব সদনের মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত হইলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়।

পদচ্যুত করার প্রণালী

স্পীকার মহোদয়ের প্রশাসনিক কার্যের সাহায্য করিবার জন্য একজন সেক্রেটারি আছেন। তিনি স্থায়ী কর্মচারী, কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তি নহেন। স্পীকার মহোদয় তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। একবার যিনি নিযুক্ত হন তিনি অবসরগ্রহণের বয়সে না পৌঁছান পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। সেক্রেটারিই সদস্যদিগকে সভার নোটিশ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পাঠান। তাঁহারই হাতে প্রশ্ন, মন্তব্য ও প্রস্তাবের নোটিশ প্রভৃতি দিতে হয়। তিনি সদস্যদিগকে ঐ সব বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন। লোকসভার যাবতীয় কাগজপত্র, দলিলদস্তাবেজ তাঁহার নিকট থাকে। তাঁহার অধীনে বহুসংখ্যক কর্মচারী আছেন।

লোকসভার সেক্রেটারি

সংসদের বিশেষ অধিকার (Privileges of parliament in India): সংসদের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং উহার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ অধিকার স্থির করা হইয়াছে। আমাদের সংবিধানে কেবলমাত্র সংসদে ও তাহার কোন কমিটিতে কিছু বলিবার জন্য কাহাকেও কোন প্রকারে দায়ী করা হইবে না, এই কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, সংসদের অন্যান্য সুবিধা প্রভৃতি সম্বন্ধে সংসদ নিজে নিয়ম প্রণয়ন করিবেন, কিন্তু যতদিন এরূপ করা না হয় ততদিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব কমন্সের ঐ বিষয়ক নিয়মকানুন প্রযোজ্য হইবে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধানে অন্য কোন রাষ্ট্রের সংবিধানের এইরূপ উল্লেখের দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। যাহা হউক, সংসদের বিশেষ অধিকারসমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—কতকগুলি অধিকার সদস্যদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে প্রযুক্ত হয়, আর অন্য কয়েকটি অধিকার সংসদ সমষ্টিগতভাবে ভোগ করেন।

ব্রিটিশ প্রথা অনুকরণ

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সদস্য আটক না হইবার সুবিধা ভোগ করেন বটে, কিন্তু উহা কেবল দেওয়ানি মোকদ্দমা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ফৌজদারি মামলার জন্য এবং দেশের নিরাপত্তারক্ষার জন্য নিবর্তনমূলক আটক আইনের বলে তাঁহাকে বন্দী করা যায়। ঐ সময়ে তিনি সংসদের কাগজপত্র পাইতে পারেন কিন্তু সংসদে আসিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, কোন সদস্যকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আদালতে হাজির করা যায় না। তৃতীয়তঃ, সংসদে প্রত্যেক সদস্য বাক্ স্বাধীনতা ভোগ করেন; কিন্তু তাই বলিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের কোন বিচারপতির আচরণের সমালোচনা করিতে পারেন না বা অন্য সদস্যদিগের প্রতি অ-সংসদীয় ভাষা প্রয়োগ করিতে পারেন না।

সদস্যদের অধিকার

সমষ্টিগতভাবে সংসদ তাঁহার কার্যাবলী ও তর্কবিতর্ক নিজে প্রকাশ করিতে পারে এবং প্রয়োজন বুঝিলে অপরকে উহা প্রকাশ করিতে বাধা দিতে পারে। তবে সাধারণতঃ সংবাদপত্রাদি উহা যথাযথভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন ক্ষেত্রে যদি এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইচ্ছা করিয়া কোন সংবাদপত্র সংসদের আলোচনার বিবরণ বিকৃত আকারে ছাপিয়াছে, তাহা হইলে ঐ সংবাদপত্রকে সংসদের অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায়। উত্তর প্রদেশের বিধানসভায় একবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে একখানি সংবাদপত্র কোন কোন সদস্যের বক্তৃতা বেশ ফলাও করিয়া ছাপিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য সদস্যের বক্তৃতার উল্লেখমাত্র করে নাই, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে আইনসভাকে অবমাননা করিবার অপরাধে কাহাকেও দণ্ড দেওয়া যায় না।

সংসদের সমষ্টিগত অধিকার

সংসদ ইচ্ছা করিলে বাহিরের লোককে সংসদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু অনুমতি লইয়া দর্শকগণ উপস্থিত থাকিতে পারে। সংসদ তাহার অভ্যন্তরীণ কার্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। যদি কোন সদস্য স্পীকারের আদেশ অমান্য করেন অথবা সংসদে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেন, তবে তাঁহাকে তিনি দণ্ড দিতে পারেন। সংসদের বিশেষ অধিকার যাঁহারা ক্ষুণ্ণ করিবেন, তাঁহারা উহার সদস্য হউন বা না হউন তাঁহাদিগকে দণ্ড দিবার ক্ষমতা সংসদের আছে। কেহ যদি সংসদের কিংবা তাহার কোন সদস্যকে অন্যায়ভাবে নিন্দা করেন বা এমন

সংসদের শৃঙ্খলারক্ষার অধিকার

সমালোচনা করেন যাহাতে উহার মর্যাদার হানি হয়, তাহা হইলে উহাকে সংসদের অবমাননা বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহার দ্বারা অবশ্য সংবাদপত্রে সংসদের কার্যাদির ন্যায়সঙ্গত সমালোচনাকে বন্ধ করা হইবে না। সংসদের কোন সদস্য যদি কোন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া উহার নিকট হইতে টাকাপয়সা গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার ঐরূপ আচরণ সংসদের আপমানকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমুদ্‌গল নামে একজন সদস্য ঐ ভাবে টাকা লইয়াছিলেন বলিয়া সংসদ তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াছিল।

সংসদের একটি বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (Privileges Committee) আছে। উহার পরামর্শ অনুসারে স্পীকার মহোদয় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

সংসদের কমিটি : কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সংসদের কার্যভার গুরুতর। নানা বিষয়ে আইন তৈয়ারি করিতেই ইহার অনেক সময় কাটিয়া যায়। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৫১টি আইন পাস হইয়াছিল। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ৬৩টি বিল আইনে পরিণত হয়। কাজের চাপে সকল বিষয়ে খুঁটিনাটি বিচারবিবেচনার সময় পাওয়া যায় না। পাঁচশতাধিক সদস্যের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে আলোচনা করাও কঠিন। তাই সকল সুসভ্য দেশেই আইনসভার অধিকাংশ কার্য কমিটিতে নিষ্পন্ন হয়। কমিটিতে অল্পসংখ্যক সদস্য থাকেন বলিয়া তাঁহারা আলোচ্য বিষয়গুলি নানা দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। ভারতীয় সংসদের কমিটিগুলি ব্রিটেনের পার্লামেণ্টের কমিটির মতন ক্ষমতা সম্পন্ন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি সমূহ যেমন মূল প্রস্তাবকে আগাগোড়া বদলাইয়া ফেলিতে পারে, ভারতীয় সংসদের কমিটি সেরূপ পারে না।

কমিটির প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষমতা

আইন প্রণয়নের সময় বিলকে Select Committeeর নিকট পেশ করা হয়। এই কমিটি অস্থায়ী। ইহাকে Ad Hoc কমিটি বলে অর্থাৎ যে কাজের জন্য কমিটি নিযুক্ত করা হয় সেই কাজ শেষ হইয়া গেলে ঐ কমিটির আয়ু ফুরাইয়া যায়।

অস্থায়ী কমিটি

লোকসভার ও রাজ্যসভার কতকগুলি পৃথক্ স্থায়ী কমিটি আছে; আবার উভয় সদনের সম্মিলিত কয়েকটি স্থায়ী কমিটিও আছে। এইসব কমিটির উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া ইহাদিগকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) সরকারী খরচ

নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে এস্টিমেট কমিটি ও পাবলিক অ্যাকাউণ্টাস কমিটি আছে ; (২) সংসদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়ন কমিটি (Rules Committee), কার্যপদ্ধতি নির্ণয় সম্বন্ধে পরামর্শ কমিটি (Business Advisory Committee), বে-সরকারী সদস্যদের আনীত বিল সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য কমিটি, সদস্যদের অনুপস্থিত থাকাব বিষয় বিবেচনার জন্য কমিটি প্রভৃতি ; (৩) নানাবিধ অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিটি, যেমন সাধারণের আবেদন সম্পর্কে খোঁজখবর লইবার কমিটি, সংসদের বিশেষ সুবিধা বিষয়ে Privileges Committee, সরকারী প্রতিশ্রুতি কতদূর প্রতিপালিত হইতেছে সে সম্বন্ধে কমিটি (Government Assurances Committee), অধস্তন পর্যায়ে আইন তৈয়ারির কমিটি (Subordinate Legislation প্রভৃতি ; (৪) সদস্যদের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিবার জন্য গ্রন্থগার কমিটি, বাসস্থান কমিটি, ভাতা ও বেতন সম্পর্কে কমিটি ও সাধারণ কমিটি (General Purpose Committee).

চার প্রকারের স্থায়ী কমিটি

এস্টিমেট কমিটির কাজ হইতেছে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের খরচের এস্টিমেট পরীক্ষা করিয়া কোথায় কিভাবে খরচ কমানো যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করা। অবশ্য কমিটি সরকারের মূলনীতি বদলাইতে পারে না, তবে প্রয়োজন হইলে ঐ বিষয়েও সুপারিশ করিতে পারেন। সংসদে খরচা মঞ্জুরির দাবি পেশ করিবার পর উহা কমিটির নিকটে উপস্থিত করা হয়। কমিটি প্রতি বৎসব সকল বিভাগের দাবি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন না ; এক এক বছরে কয়েকটি মাত্র বিভাগের দাবি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। এই কমিটিতে ৩০জন সদস্য থাকেন। তাঁহারা প্রতি বৎসর লোকসভার সদস্যদের দ্বারা এক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রথায় নির্বাচিত হন। ইহার ফলে বিভিন্ন দল কমিটিতে নিজেদের সংখ্যার অনুপাতে সভ্য পাঠাইতে পারেন। এস্টিমেট কমিটির সদস্যগণকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে কমিটি ১৪১ ঘণ্টা ধরিয়া ৬৩টি অধিবেশন করিয়াছিল ও ৩৫টি রিপোর্ট সংসদে পেশ করে। রিপোর্টে তাঁহারা অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়া থাকেন।

এস্টিমেট কমিটি

এস্টিমেট কমিটি লোকসভায় খরচা মঞ্জুরির পূর্বে পরামর্শ দেয় আর পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটি খরচ হইবার পর উহা পরীক্ষা করে। শেষোক্ত কমিটিতে

লোকসভার ১৫ জন ও রাজ্যসভার ৭ জন সদস্য থাকেন। ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের এবং বিভিন্ন স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র করপোরেশনের খরচার হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে সংসদ যে টাকা যে কাজের জন্য মঞ্জুর করিয়াছিল তাহা ঠিক মত ব্যয় করা হইয়াছে কিনা। অডিটর-জেনারেল ইহাদিগকে সাহায্য করেন। ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে দামোদর উপত্যকা করপোরেশনের অনেক অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত ইহারা ধরিয়া দিয়াছিল। ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে এই কমিটি ৪০ ঘণ্টা সময়ে ২১ বার অধিবেশন করিয়াছিলেন।

সরকারী হিসাব কমিটি

কার্যপদ্ধতি নির্ণয় সম্বন্ধে পরামর্শ দান সমিতির (Business Advisory Committee) কাজ হইতেছে সংসদে সরকারী বিল ও অন্যান্য কার্য সম্বন্ধে আলোচনার সময় ও ক্রম নির্দেশ করা। লোকসভার স্পীকার ইহার সভাপতিত্ব করেন। ইহার সদস্য সংখ্যা ১৫। সাধারণ কমিটির (General Purpose Committee) কাজ হইতেছে লোকসভা কতদিন ধরিয়া বসিবে, কবে উহার ছুটি থাকিবে প্রভৃতি স্থির করা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, বিভিন্ন কমিটির সভাপতি প্রভৃতিকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। নিয়ম প্রণয়ন কমিটিতে (Rules Committee) ১৫ জন সদস্য থাকেন। তাঁহারা লোকসভার কার্য পরিচালনা বিষয়ে নূতন নিয়মকানুন তৈয়ারি সম্বন্ধে সুপারিশ করেন। স্পীকার স্বয়ং ইহার সভাপতিত্ব করেন। জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে বিভিন্ন বিষয়ে আইন করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দরখাস্ত করিয়া লোকসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। ঐ ধরনের দরখাস্ত বিবেচনার জন্য ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি Petitions Committee আছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৯৫টি দরখাস্ত করা হইয়াছিল। ডাকঘর সংক্রান্ত নিয়ম, হিন্দুদের মধ্যে উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণ লোকসভার নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল।

অন্যান্য কমিটি

লোকসভার বিশেষ অধিকার (Privileges) লইয়া যে কমিটি আছে তাহাতে ১৫ জন সদস্য আছেন। এই কমিটি সংসদের বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিবেচনা করে। যদি সংসদ অথবা কোন আঞ্চলিক রাজ্যের আইনসভা কোন কার্যক্রমের অংশ বিশেষ লোপ করিবার (expunge) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে

এবং কোন সংবাদপত্র ঐ অংশ প্রকাশ করে, তবে উহার বিরুদ্ধে বিশেষ অধিকার ভঙ্গের জন্য অভিযোগ আনা যায়। পাটনার সার্চলাইট পত্রিকার সম্পাদক মন্ত্রেশ্বর শর্মা ঐরূপ অপরাধে দণ্ডিত হইলে সুপ্রিম কোর্টের নিকট আপিল করেন। কিন্তু ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঐ আপিল অগ্রাহ্য হয়। কেরলের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সংসদের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করার দরুণ ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট যদি লোকসভায় পেশ হইবার পূর্বেই কেহ প্রকাশ করেন তবে, তিনি সংসদের বিশেষ অধিকার ভঙ্গের অপরাধে দণ্ডনীয় হন। এইরূপ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কমিটির দ্বারা বিবেচিত হয়।

বিশেষ অধিকার কমিটি

সংবিধানে শাসনবিভাগের উপর কিছু নিয়মকানুন তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আবার সংসদও আইন পাস করিবার সময় উহার অনুসরণে নিয়ম তৈয়ার করিবার ক্ষমতা শাসনবিভাগের উপর দিয়া থাকে। এই সব ক্ষমতা যথাযথ প্রয়োগ করা হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য **Subordinate Legislation** কমিটি নামে ১৫ জন সদস্যের এক কমিটি আছে। এই কমিটি ১৯৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে শাসন বিভাগের ১৩১টি আদেশ (Orders), ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৩৩টি, ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে ৩৩৬টি এবং ১৯৫৭ হইতে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৮৮৪টি উপ-আইন (Statutory Instruments) বিবেচনা করিয়াছিল। কমিটি নির্দেশ দিয়াছে যে, কোন বিভাগকে কিছু উপ-আইন করিবার ভার দিলে তাহারা যেন আবার অপরের উপর উহার ভার সমর্পণ না করে।

উপ-আইন সাক্রান্ত কমিটি

বে-সরকারী সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত বিল ও মন্তব্য বিবেচনা করিবার জন্য ১৫ জন সদস্য লইয়া যে কমিটি আছে তাহা ঐসব বিষয় আলোচনার জন্য সময় ঠিক করিয়া দেয়। যদি কোন বে-সরকারি সদস্য সংবিধান সংশোধন করিবার জন্য কোন প্রস্তাব আনেন তাহা হইলে উহা লোকসভায় উত্থাপিত করিবার পূর্বে এই কমিটি বিবেচনা করিয়া থাকে।

সংসদে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সময়ে সরকারের পক্ষই হইতে মন্ত্রীরা সময় সময় প্রতিশ্রুতি দেন যে, অমুক অভিযোগের তাঁহারা প্রতিকার করিবেন। এইরূপ

প্রতিশ্রুতি কতদূর প্রতিপালিত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ১৫জন সদস্যের একটি প্রতিশ্রুতি (Assurance) কমিটি আছে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ঐ কমিটি পরীক্ষা করিয়া বলে যে, ১৯৫২ হইতে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে মধ্যে সরকার ২৮৭৫টি প্রতিশ্রুতি দেন; তাহার মধ্যে ২১১৫টি প্রতিশ্রুতি পালন করা হইয়াছিল। ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় এ ধরনের কোন কমিটি নাই। এইরূপ কমিটি থাকার দরুন মন্ত্রীরা সংসদে প্রতিশ্রুতি দিবার পূর্বে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেন। কিন্তু সংসদের বাহিরে বক্তৃতা দিবার সময় তাঁহারা অনুরূপ সাবধানতা অবলম্বন করেন না।

প্রতিশ্রুতি পরীক্ষা কমিটি

কয়েকটি স্থায়ী কমিটিতে উভয় সদন হইতে সদস্য লওয়া হয়। সংসদের ভাতা ও বেতন সম্পর্কিত কমিটিতে ১২ জন সদস্য লোকসভা হইতে ও তিনজন রাজ্যসভা হইতে নির্বাচিত হন। সংসদীয় পাঠাগার কমিটিতে দশজন সদস্য আছেন; তন্মধ্যে ৭ জন লোকসভা হইতে ও তিন জন রাজ্যসভা হইতে নিযুক্ত হন। কোন পদ লাভজনক কিনা তাহা বিচার করিবার জন্য যে কমিটি আছে তাহাতে ১৫জন সদস্যের মধ্যে ৫জনকে রাজ্যসভা হইতে ও ১০জনকে লোকসভা হইতে নিযুক্ত করা হয়। উভয় সদনের সদস্যদের বাসস্থান প্রভৃতি স্থির করিবার জন্য রাজ্যসভার ও লোকসভার পৃথক পৃথক কমিটি আছে। রাজ্যসভার কমিটি সংখ্যা লোকসভার চেয়ে কম।

উভয় সদনের সম্মিলিত স্থায়ী কমিটি

সরকারী ও বে-সরকারী বিল: দেশের জন্য নূতন আইন তৈয়ারি করা অথবা পুরাতন আইনের সংশোধন করা খুব কঠিন কাজ। আইনের ফলে যাহাতে দেশের মধ্যে অশান্তি না আসে, শ্রেণী বিশেষের ক্ষতি হইলেও যাহাতে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় সেই সব বিষয়ে অনেক বিচারবিবেচনা করিতে হয়। ধীর ও স্থির ভাবে আলোচনার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রস্তাব বা বিলকে আইনে পরিণত করিবার প্রণালীকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমে বিল পেশ করিবার অনুমতি চাওয়া হয়। মন্ত্রীরাই অধিকাংশ বিল পেশ করিয়া থাকেন; তবে মন্ত্রিমণ্ডলীর বহির্ভূত বে-সরকারী সদস্যও ইচ্ছা করিলে বিল উত্থাপন করিতে পারেন। বে-সরকারী সদস্যদিগকে একমাস আগে নোটিশ দিতে হয়। যাঁহারা নোটিশ দেন তাঁহারাই যে বিল উত্থাপন করিবার সুযোগ পান তাহা নহে। সপ্তাহে কেবলমাত্র শুক্রবারে বে-সরকারী সদস্যদের

বে-সরকারী সদস্যদের বিল উপস্থিত করিবার প্রণালী

প্রস্তাব সংসদে আলোচিত হইতে পারে। ঐ প্রস্তাব বিলও হইতে পারে, সাধারণ প্রস্তাবও (Resolution) হইতে পারে। তাই চৌদ্দদিনের মধ্যে একটি শুক্রবার মাত্র বে-সরকারী বিল আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট আছে। বহু বে-সরকারী সদস্য ঐ দুর্লভ দিনটিতে নিজ নিজ প্রস্তাবিত বিল উঠাইবার দাবি করেন। লটারি করিয়া ঠিক করা হয় যে, কাহার বিল আগে বিবেচনা করা হইবে। যাঁহাদের নাম শেষের দিকে থাকে তাঁহারা আর বিল উত্থাপনের সুযোগ পান না।

কোন বে-সরকারী সদস্য যখন বিল পেশ করেন তখন তাঁহাকে লিখিতভাবে জানাইতে হয় যে যখন তাঁহার প্রস্তাবকে কার্যকরী করিতে হইলে এককালীন কত খরচ লাগিবে এবং বছরে কত খরচ লাগিতে পারে। কেবিনেটের সমর্থন না পাইলে কোন বে-সরকারী বিল পাস হওয়া শক্ত, এমন কি অসম্ভব বলিলেও চলে। অথচ কেবিনেট সাধারণতঃ বে-সরকারী বিল সমর্থন করেন না। যদি কোন বিলের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কিছু আছে বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে সরকারী বিল পেশ করিবেন বলেন ও বে-সরকারী সদস্য নিজের বিল তুলিয়া লন। ভারতীয় সংসদে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাধিক্য আছে। ঐ দলভুক্ত সদস্যেরা তাঁহাদের নেতৃবৃন্দের পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। সেইজন্য কোন বিল লইয়া তাঁহারা জিদ করিতে পারেন না। বিরোধীদলের সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত কোন বিল পাস হইবার সম্ভাবনা বর্তমানে নাই।

বে-সরকরী বিলের পাসের সম্ভাবনা কম

সরকারের পক্ষ হইতে কোন মন্ত্রী যে বিল উপস্থিত করেন তাহা তাঁহার বিভাগের কর্মচারীরা প্রথমে আলোচনা করিয়া সুদক্ষ খসড়ালেখকের (Draftsman) নিকটে দেন। তিনি উহার আইনসম্মত রূপ প্রদান করেন। ঐ খসড়ার সহিত মন্ত্রী মহোদয় একটি মন্তব্যে লিপিবদ্ধ করেন কি জন্য ঐ আইনের প্রয়োজন হইয়াছে এবং উহার জন্য খরচ কিরূপ হইবে। কেবিনেটের অধিবেশনে উহা আলোচিত ও গৃহীত হইলে তবে সংসদে উহা উপস্থিত করা হয়। সাধারণতঃ সরকারী বিল পেশ করিবার জন্য কোন অনুমতি চাহিবার প্রয়োজন হয় না। স্পীকার মহোদয়ের অনুমতি লইয়া উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়। ঐরূপ ভাবে প্রকাশিত হইলে পেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বে-সরকারী সদস্যের বিল

সরকারী বিল

পেশ করিবার অনুমতি প্রদানের পর উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। কোন বিল পেশ করিবার অনুমতি বড় একটা প্রত্যাখ্যান করা হয় না।

আইন প্রণয়নের প্রণালী (Procedure or different stages in the enactment or Passing of an ordinary Bill)

আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সাধারণ বিল সংসদের যে কোন সদনে পেশ করিবার অনুমতি দিবার পর প্রস্তাবক মন্ত্রী বা বে-সরকারী সদস্য দাঁড়াইয়া বলেন "মহাশয়, আমি এই বিল উত্থাপন (Introduce) করিতেছি।" এই সময়ে প্রস্তাবক সাধারণতঃ কোন বক্তৃতা করেন না এবং অন্য সদস্যেরাও কিছু বলেন না। তবে নিবর্তনমূলক আইন পেশ করার সময় (Preventive Detention Amendment Bill ১৯৫৪) ঘোরতর বিতর্ক হইয়াছিল। বিল পেশ হইবার পর সেইদিন সন্ধ্যার মধ্যেই উভয় সদনের সদস্যদিগকে উহার প্রতিলিপি প্রেরণ করা হয়।

বিল উত্থাপন করিবার অনুমতি

বিল পেশ হইবার অন্ততঃ দুইদিন পরে উহার দ্বিতীয় পাঠ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় পাঠের আবার দুইটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে কেবলমাত্র উহার অন্তর্নিহিত মূল-নীতির সম্বন্ধে আলোচনা হয়। যদি উহা গৃহীত হয় তাহা হইলে পরে উহার ধারা ও উপধারা লইয়া ও সংশোধনী প্রস্তাব লইয়া বিতর্ক হয়। তাহার পর বিলটি সমগ্রভাবে গ্রহণ করা হইবে কি প্রত্যাখ্যান করা হইবে তাহা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় পাঠের প্রথম স্তরে প্রস্তাবক ঐ বিল সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন যে (ক) উহা বিবেচনার জন্য গৃহীত হউক বা (খ) উহা একটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হউক (গ) অপর সদনের সম্মতি লইয়া উহা উভয় সদনের যুক্ত কমিটিতে বিবেচিত হউক অথবা (ঘ) জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য ইহা প্রচারিত হউক। খুব বিতর্কমূলক আইন প্রণয়নের সময় মাত্র শেষোক্ত প্রস্তাব করা হয়। সাধারণতঃ বিরোধীরা ঐরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকেন। উহা পাস হইলে বিলটি বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা ও অন্যান্য সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান সমূহের মতামত জানাইতে বলা হয়। ঐ সব মতের সারাংশ সংসদের সদস্যদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়। জনমত নির্ধারিত হইবার পর বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ

দ্বিতীয় পাঠ

কমিটি ও তাহার রিপোর্ট

করিবার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবক বলেন, অমুক অমুক সদস্যকে লইয়া ঐ সিলেক্ট কমিটি গঠিত হউক এবং অমুক দিনের মধ্যে তাঁহারা রিপোর্ট পেশ করুন। স্পীকার মহোদয় ঐ সব সদস্যদের মধ্যে একজনকে কমিটির সভাপতি করিয়া দেন; তবে যদি ডেপুটি স্পীকার ঐ সদস্যদের মধ্যে একজন হন তাহা হইলে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। যে সব বিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ নহে অথবা অত্যন্ত জরুরি সেগুলি সিলেক্ট কমিটিতে না দিয়া সংসদের সদনেই আলোচনা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ বিলই সিলেক্ট কমিটিতে প্রথমে বিবেচিত হয়।

কমিটির রিপোর্ট পেশ হইবার পর প্রস্তাব করা হয় যে, এইবার সিলেক্ট কমিটির দ্বারা গৃহীত বা সংশোধিত বিল বিবেচনা করা হউক। ঐ প্রস্তাব পাস হইবার পর বিলটির প্রত্যেক ধারা বা উপধারা লইয়া এবং উহার সংশোধনী প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করা হয়। সংশোধনী প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি অন্ততঃ একদিন পূর্বে দিতে হয়।

সংশোধনী প্রস্তাব

এই আলোচনার পর প্রস্তাবক প্রস্তাব করেন, যে এইবার বিলটি পাস করা হউক। ইহাকেই কমন্সসভার তৃতীয় পাঠের পর্যায়রূপে গ্রহণ করা যায়। উহা পাস হইলে ঐ সদনের দ্বারা উহা গৃহীত হইল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

তৃতীয় পাঠ

ইহার পর বিলটি অপর সদনে প্রেরণ করা হয়। সেখানেও পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি স্তরের মধ্যে দিয়া ইহাকে যাইতে হয়। যদি অপর সদন বিলটি প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে অথবা ছয়মাস কাল কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া চুপচাপ টেবিলের উপর উহা ফেলিয়া রাখে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় সদনের সম্মিলিত অধিবেশন আহ্বান করেন। অপর সদন যদি বিলটিতে এমন সংশোধন আনয়ন করে যাহা প্রস্তাবকারী সদনের দ্বারা গৃহীত না হয় তাহা হইলেও রাষ্ট্রপতি যুক্ত অধিবেশন ডাকেন। ঐ অধিবেশনে অধিকাংশ সদস্যের মত অনুসারে বিলটির ভাগ্য নির্ণীত হয়।

সম্মিলিত অধিবেশন

উভয় সদনের দ্বারা বা যুক্ত অধিবেশনের দ্বারা বিলটি পাস হইবার পর উহা রাষ্ট্রপতির নিকটে পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতি যদি উহাতে সম্মতি দেন তাহা হইলে উহা আইনে পরিণত হয়। তিনি যদি মত না দেন তাহা হইলে উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু তিনি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান না করিয়া উহা উভয় সদনের পুনরায় বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন

এই ক্ষেত্রে যদি উভয় সদন উহা সংশোধন সহিত বা বিনা সংশোধনে পাস করে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে উহা মানিয়া লইতে হয় এবং বিলটি আইনে পরিণত হয়। কোন কোন বিলে লেখা থাকে যে অমুক দিন হইতে ইহা কার্যকরী হইবে, কোন বিলে আবার লেখা থাকে সরকার যে দিন হইতে ইহা কার্যকরী করিবার আদেশ দিবেন সেইদিন হইতে ইহা চালু হইবে। এরূপ কোন কথা লেখা না থাকিলে রাষ্ট্রপতি যেদিন হইতে সম্মতি দেন সেই দিন হইতে উহা কার্যকরী হয়।

ন্যস্ত ক্ষমতা বলে নিয়মকানুন তৈয়ারি (Delegated Legislation): রাষ্ট্রের কাজকর্ম যত বৃদ্ধি পাইতেছে শাসনবিভাগের হাতে নিয়মকানুন তৈয়ারির ভার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তত বাড়িতেছে। আইনসভা মোটামুটি একটা আইন তৈয়ারি করিয়া দিতে পারে কিন্তু তাহার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে উপআইন বা নিয়মকানুন প্রস্তুত করার ভার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগের উপর ন্যস্ত করিতে হয়। ইংলণ্ডে এইরূপ Delegated legislationএর সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটেনের একটা মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট যে আইন করিয়া দেয় বা ঐ আইনের নীতি অনুসরণ করিয়া যে সমস্ত নিয়মকানুন করা হয়, তাহার বৈধতা বিচারের কোন ক্ষমতা তথাকার আদালতের নাই। ভারতের উচ্চতম আদালত কিন্তু আইন বৈধ কিনা অর্থাৎ সংবিধানের সঙ্গে উহার সঙ্গতি আছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবার অধিকারী। সুতরাং আইনের অধীনে যে কোন নিয়মকানুন তৈয়ারি করা হয় তাহার বৈধতাও তাঁহারা বিচার করিতে পারেন।

ভারতীয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় সংসদ আইনের মধ্যেই উল্লেখ করা আছে যে, ঐ আইনের অন্তর্গত নিয়মকানুন তৈয়ারি করিবার অধিকার সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীকে দেওয়া হইল। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ঐ সব নিয়মকানুন গেজেটে প্রকাশ করিলেই তাহা বলবৎ হইত। কিন্তু ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লোকসভার স্পীকার মহোদয় সংসদের দশজন সদস্য লইয়া একটি Committee on Subordinate Legislation গঠন করেন। ঐ কমিটি নির্দেশ দেয় যে, কোন আইনে কর্তৃপক্ষের উপর ঐরূপ ভার দেওয়া হইলে একটি মন্তব্য স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে কি কি বিষয়ে কি ধরনের নিয়ম তৈয়ারির ভার দেওয়া হইল, নিয়ম কে বা কাহারা তৈয়ারি করিবেন এবং উহা

নিয়ম তৈয়ারির প্রণালী

প্রয়োগ করিবার অধিকারই বা কাহার হাতে থাকিবে। ঐ সব নিয়ম তৈয়ারি করিয়া সংসদের উভয় সদনের টেবিলের উপর যতশীঘ্র সম্ভব রাখিতে হইবে; নিয়মগুলি গেজেটে প্রকাশিত হইবার অন্ততঃ ত্রিশ দিন পূর্বে উহা টেবিলে রাখিতে হইবে এবং সংসদ ইচ্ছা করিলে ঐসব নিয়মকানুন পরিবর্তন করিতে পারিবে, এই কথা সুস্পষ্টভাবে আইনের মধ্যে উল্লেখ করিতে হইবে। এই উপায়ের দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রস্তুত নিয়মকানুনের উপর সংসদের খানিকটা কর্তৃত্ব বজায় থাকিবে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আজকাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে, অ-বিশেষজ্ঞ সদস্যদের পক্ষে উহার মধ্যে মাথা গলানো খুবই কঠিন। জীবনবীমা করপোরেশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা এস্টেট্ ডিউটি সংক্রান্ত আইনের পরিপূরক নিয়মকানুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার মতন সময় ও ক্ষমতা খুব কম সদস্যেরই আছে।

অর্থসংক্রান্ত বিল পাস করিবার পদ্ধতি : যে বিলে কোন কর ধার্য করিবার বা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব থাকে, কিংবা সরকারী ঋণ গ্রহণের কথা থাকে, অথবা একত্রীকৃত কোষ (Consolidated Fund) হইতে খরচ করিবার কোন প্রস্তাব করা হয় তাহাকে অর্থসংক্রান্ত বিল বা Money Bill বলা হয়। বাজেট অর্থসংক্রান্ত বিলের মধ্যে প্রধান কোন বিলকে অর্থসংক্রান্ত বিল রূপে ধরা হইবে কিনা সে বিষয়ে স্পীকার মহোদয়ের সিদ্ধান্তই চরম বলিয়া মানিতে হইবে।

একত্রীকৃত কোষ

অর্থসংক্রান্ত বিল পাস করাইবার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এইরূপ বিল কেবলমাত্র মন্ত্রীরাই উপস্থিত করিতে পারেন, বে-সরকারী সদস্যেরা পারেন না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া অর্থ-সংক্রান্ত বিল পেশ করা যায় না। বে-সরকারী সদস্যেরা কোন কর ধার্য করিবার প্রস্তাব তুলিতে পারেন না। তাঁহারা খরচা কমাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন, কিন্তু খরচা বাড়াইবার প্রস্তাব করিতে বা ঐ উদ্দেশ্যে সংশোধনী প্রস্তাব আনিতে পারেন না।

মন্ত্রী ছাড়া কেহ অর্থ বিষয়ক বিল প্রস্তাব করিতে পারেন না

অর্থসংক্রান্ত বিল লোকসভাতেই প্রথমে আনয়ন করিতে হয়। রাজ্যসভায় ইহা প্রথমে উত্থাপন করা যায় না। লোকসভায় সাধারণ বিলের পদ্ধতিতে ইহা পাস হয়। তবে প্রথমে পেশ হইবার পরপরই ইহার আলোচনায় ব্যবস্থা করা যায়—দুইদিন অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। বে-সরকারী সদস্যেরা

একদিনের নোটিশ দিয়া সরকারী প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব আনিতে পারেন।

সদস্যদের সংশোধনী প্রস্তাব

এই সংশোধনী প্রস্তাব তিন ধরনের হইতে পারে। যদি কোন সদস্য কোন বিভাগের অবলম্বিত নীতির বিরোধিতা করিতে চাহেন তাহা হইলে ঐ বিভাগের খরচা মঞ্জুরির সময়ে তিনি প্রস্তাব করিতে পারেন যে যেহেতু ঐ বিভাগ এইরূপ বিশেষ কোন কাজ করিয়া অন্যায় করিয়াছে সেই হেতু উহার খরচা কমাইয়া মাত্র এক টাকা মঞ্জুর করা হউক (The grant be reduced to Rupee one only)। দ্বিতীয়তঃ, মিতব্যয়িতা সাধনের জন্য প্রস্তাব করা যায় যে, ঐ খরচা কমাইয়া এত করা হউক বা ঐ খরচা একেবারেই বাদ দেওয়া হউক। তৃতীয়তঃ, কোন বিভাগের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তাব করা হয় যে উহার খরচার পরিমাণ একশত টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক (That the amount be reduced by Rs. 100/- in order to ventilate a specific grievance.)। ঐসব ধরনের সংশোধনী প্রস্তাব আনিয়া গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া চলে; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব খুব বেশি নয়। অর্থসংক্রান্ত বিলের উপর ভোটের সময় সরকারী দলের প্রত্যেক সদস্যকে হুইপ বা পরিচালক মহাশয়ের নির্দেশ মতন ভোট দিতে হয়। তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ; সুতরাং সংশোধনী প্রস্তাবগুলি নাকচ হইয়া যায়।

অর্থসংক্রান্ত বিল লোকসভায় পাস হইবার পর রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। এই ধরনের বিলের উপর রাজ্যসভার বিশেষ ক্ষমতা নাই। রাজ্যসভা বড় জোর উহা চৌদ্দদিন আটকাইয়া রাখিতে পারে। রাজ্যসভা চৌদ্দদিনের মধ্যে উহা

রাজ্যসভার ক্ষমতা

বিবেচনা করিয়া সুপারিশসহ উহা ফেরৎ পাঠাইতে বাধ্য। যদি রাজ্যসভা চৌদ্দদিনের মধ্যে ফেরৎ না দেয় তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া হয় যে উহা রাজ্যসভা ও লোকসভার দ্বারা পাস হইয়াছে। রাজ্যসভা যদি কোন সুপারিশ করে তাহা হইলে লোকসভা উহা গ্রহণ করিতেও পারে, নাও পারে। রাজ্যসভা ঐ সুপারিশ না মানিয়া লইলেও উহা যে আকারে লোকসভার দ্বারা পাস হইয়াছিল সেই আকারেই গৃহীত হইল বলিয়া ধরা হয়। তারপর উহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। সংবিধানে আছে যে রাষ্ট্রপতি উহা অনুমোদন করিতেও পারেন, নাও পারেন। তবে তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে চালিত হন বলিয়া তিনি অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করিবার কথা মনে স্থান দেন না।

একত্রীকৃত কোষ ও তাহার উপর নির্ধারিত খরচা (Consolidated Fund and expenditure charged on it) : বিভিন্ন প্রকার কর আদায় করিয়া একটি মাত্র কোষে রাখা হয়। বিভিন্ন ধরনের ঋণ হইতে যে টাকা আসে তাহাও ঐ কোষে জমা হয়। ঐ কোষের নাম Consolidated Fund বা একত্রীকৃত কোষ। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে এক এক ধরনের কর হইতে সংগৃহীত অর্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোষে জমা রাখা হইত। তাহার ফলে কোন সময়েই সহজে বুঝা যাইত না সরকারী তহবিলে মোট কত টাকা আছে। সেইজন্য জনসাধারণের উন্নয়নমূলক কাজে কতটা খরচ করা যাইতে পারে তাহা সহজে জানা যাইত না। এইসব অসুবিধা দূর করিবার জন্য একটি মাত্র তহবিলে সমস্ত প্রকার রাজস্ব ও ঋণের টাকা জমা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি এবং বিভিন্ন আঙ্গিক রাজ্যের সরকারের পৃথক পৃথক একত্রীকৃত কোষ আছে।

একত্রীকৃত কোষের অর্থ ও উপযোগিতা

কেন্দ্রীয় একত্রীকৃত তহবিল (Consolidated Fund) হইতে টাকা তুলিতে হইলে সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত খরচা মঞ্জুরির আইনের (Appropriation Act) সমর্থন দরকার। সংসদ যে কাজের জন্য যে টাকা মঞ্জুর করে সেই কাজেই উহা ব্যয় করা হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার ভার Comptroller and Auditor General-এর উপর।

একত্রীকৃত কোষে সরকারের নিজস্ব টাকাই জমা হয়। গচ্ছিত টাকা জমা হয় না। সরকারী কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা, ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাবে জমার টাকা, আদালতে কোন টাকা আমানত হিসাবে রাখিলে তাহাও ঐ ধরনের অন্যান্য অর্থ হইতেছে গচ্ছিত ধন। ঐরূপ গচ্ছিত ধন Public Accounts-এ জমা থাকে। উহা হইতে টাকা তুলিতে হইলে সংসদের আইনের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।

পাবলিক অ্যাকাউণ্টে কি ধরনের টাকা জমা থাকে?

সরকারের কয়েকটি এমন ধরনের স্থায়ী খরচা আছে যাহার জন্য প্রতি বৎসর সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। ঐ ধরনের খরচাকে একত্রীভূত কোষ হইতে দেয় খরচা বলা হয় (Expenditure charged on the consolidated Fund of India)। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা প্রভৃতি, রাজ্যসভার সভাপতি (অর্থাৎ উপ-রাষ্ট্রপতি) ও সহকারী সভাপতির এবং লোকসভার স্পীকার ও

ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণের বেতন, ভাতা, পেন্সন প্রভৃতি, হাইকোর্টের ও ফেডারেল কোর্টের বিচারকদের পেন্সন, Comptroller and Auditor Generalএর বেতন, ভাতা ও পেন্সন, কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ শোধ, কোন আদালতের ডিক্রি মিটাইবার জন্য টাকা এইরূপ দেয় বলিয়া গণ্য হয়। সংসদ অন্য কোন খরচকেও এই পর্যায়ে ফেলিতে পারে। এই সব খরচা লইয়া সংসদে আলোচনা হইতে পারে, কিন্তু কোন ভোট লওয়া হয় না। এরূপ কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করিবার সুযোগ পান। তাঁহাদিগকে সংসদের মর্জির উপর নির্ভর করিতে হয় না।

একত্রীকৃত কোষ হইতে দেয় খরচা

বাজেট তৈয়ারির প্রণালী: সরকারের পক্ষ হইতে অর্থসচিব আগামী বৎসরের আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের যে বিবরণ সংসদের অনুমোদন লাভের আশায় পেশ করেন তাহাকে বাজেট বলে। ইহাতে রাজস্ব হিসাবে প্রাপ্য আয় তো থাকেই, দেশের ভিতর হইতে ও বিদেশ হইতে গৃহীত ঋণ ও অন্যান্য সকল প্রকারের অর্থ আমদানিও থাকে। সাধারণ লোকে বাজেট বলিতে রাজস্বখাতে প্রাপ্ত আয় ও তাহা হইতে যে খরচা করা হয় তাহাই বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা মূলধনখাতে (capital account) দর্শিত আয়ব্যয়কে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। কিন্তু অর্থসচিব যে বার্ষিক অর্থবিষয়ক বিবরণ (Annual Financial Statement) পেশ করেন তাহাতে উভয়বিধ আয়ব্যয়েরই প্রস্তাব থাকে। একত্রীকৃত কোষ (Consolidated Fund) ও সাধারণের হিসাবে (Public Account) যে টাকা জমা হয় এবং উহা হইতে যাহা খরচ হয় তাহার সবটাই বার্ষিক অর্থবিষয়ক বিবরণে উল্লিখিত হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা বাজেট বলিতে কেবল করধার্য করিবার প্রস্তাব বুঝেন।

বাজেটের বিভিন্ন অর্থ

ভারত সরকারের আর্থিক বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১শে মার্চ শেষ হয়। বাজেট তৈয়ারির আয়োজন আরম্ভ হয় পূর্ববর্তী বৎসরের জুলাই মাস হইতে। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে বাজেট পেশ করা হইল তাহার জন্য তথ্য সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে। অর্থমন্ত্রীর বিভাগ, খরচার প্রয়োজন

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ

হয় এমন সব মন্ত্রণালয় (Ministry), পরিকল্পনা কমিসন এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল এই চারিটি সংস্থা বাজেট তৈয়ারির ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সরকার প্রথমে স্থির করেন কোন্ কোন্ ব্যয় অপরিহার্য। ব্যয়ের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইলে উহার জন্য কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহা বিবেচিত হয়। ভারতীয় বাজেটের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের বাজেটের পার্থক্য এই যে ভারতে রেলপথের জন্য স্বতন্ত্র বাজেট তৈয়ারি করা হয়; উহা সাধারণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নহে।

আর্থিক বৎসরের প্রথম দিকে যে বাজেট পাস করা হয় তাহার চেয়ে বেশি বা কম আয় ও ব্যয় হইতে পারে। সেইজন্য বৎসরের শেষের দিকে একটি পরিপূরক বাজেট (supplementary budget) উপস্থিত করিয়া অর্থসচিব সাধারণতঃ বা revised estemate বেশি খরচ মঞ্জুরির প্রার্থনা জানান। এই পরিপূরক বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী বৎসরের আয়ব্যয় কতটা হইবে তাহা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের কর্মাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ বিভাগের জন্য আগামী বৎসরে কত খরচ দরকার হইবে তাহা অক্টোবর মাসের মধ্যে নির্ণয় করেন। তাঁহারা উহার এক প্রতিলিপি তাঁহাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে পাঠান, অন্য এক প্রতিলিপি কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলকে প্রেরণ করেন। মন্ত্রণালয় উহা কাটছাঁট করিয়া অর্থসচিবের দপ্তরে পাঠায়। সেখানে উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা হয়। অর্থসচিবের মন্ত্রণালয় যাহা স্থির করিয়া দেয় তাহাই সাধারণতঃ অন্যান্য মন্ত্রীরা মানিয়া লন। তবে যদি কোন মন্ত্রী মনে করেন যে তাঁহার বিভাগের উপর অবিচার করা হইয়াছে তাহা হইলে তিনি কেবিনেটের নিকট আপিল করিতে পারেন। খুব বেশি টাকার জিনিসপত্র খরিদ করিবার কিংবা নূতন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য এককালীন যে খরচের প্রয়োজন হয় তাহা সাধারণতঃ কেবিনেটের অধিবেশনেই বিবেচিত হয়। কিন্তু অর্থসচিবের মন্ত্রণালয় কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার কিংবা বেতন বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া থাকে। বিভিন্ন বিভাগের দাবিগুলি Accountant General হিসাবের দিক হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং তাঁহার মন্তব্য ডিসেম্বরের শেষ দিকে অর্থসচিবের নিকট পাঠাইয়া দেন। জানুয়ারী মাসে আবার নূতন কোন খরচের প্রস্তাব থাকিলে তাহা বিচার করিয়া দেখা হয়। সাধারণতঃ ঐ সময়ে বেশ কিছু নূতন প্রস্তাব করা হইয়া

পরিপূরক বাজেট

থাকে। সেগুলি আবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। যে বছর চলিতেছে সেই বছরের আয়-ব্যয়ের মোটামুটি একটা আন্দাজ ফেব্রুয়ারী মাসে পাওয়া যায়। তাহা হইতে আগামী বৎসরের বাজেটের আয়-ব্যয়ের এস্টিমেণ্ট করা হয়। তারপর কোন কোন দ্রব্যের উপর নূতন কর বসানো হইবে বা নূতন হারে কর বসানো হইবে কিংবা কোন করের হার কমাইয়া দেওয়া হইবে কিনা তাহা বিবেচনা করা হয়। কর ধার্যের ব্যাপার অত্যন্ত গোপনে রাখিতে হয়। কেননা ব্যবসায়ীরা যদি জানিতে পারেন যে দেশলাইয়ের উপর বেশি কর বসিবার আশঙ্কা আছে তাহা হইলে তাঁহারা আগে হইতেই দোকান হইতে দেশলাই সরাইয়া ফেলেন এবং যখন কর বসানো হয় তখন বেশি লাভে সেগুলি বিক্রয় করেন। মার্চ মাসের প্রথম দিকে অর্থসচিব লোকসভায় বার্ষিক অর্থবিষয়ক প্রস্তাব, খরচা মঞ্জুরীর দাবি (Demands for grants) ; আর্থিক বিল (The finance Bill) পেশ করেন। ফিনান্স বিলে সেই বৎসরে যে সব কর ধার্য করা হইবে এবং দান গ্রহণ করা হইবে তাহার প্রস্তাব থাকে।

কর ধার্য করা

এই প্রসঙ্গে ফিনান্স বিলের সহিত ফিনান্সিয়াল বিল ও মনি বিলের পার্থক্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যে বিলে অর্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সহিত অন্য প্রস্তাবও থাকে তাহাকে ফিনান্সিয়াল শ্রেণীভুক্ত করা যায়। ফিনান্স বিল একটি বিশেষ বিল; ফিনান্সিয়াল বিল এক শ্রেণীর বিলের নাম। মনি বিল ও ফিনান্স বিল ফিনান্সিয়াল বিলের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু যে কোন ফিনান্সিয়াল বিলকে মনি বিল বলা যায় না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ না থাকিলে মনি বিল উত্থাপন করা যায় না—ফিনান্সিয়াল বিল উত্থাপন করা যায়; কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত উহা বিবেচনা করা যায় না। মনি বিল রাজ্যসভায় প্রস্তাবিত হইতে পারে না, ফিনান্সিয়াল বিল প্রস্তাবিত হইতে পারে এবং রাজ্য-সভায় উহার উপর ভোট লওয়া যাইতে পারে।

ফিনান্স বিল

লোকসভার বাজেট পেশ করিবার পর দুই তিন দিন ধরিয়া উহার উপর সাধারণ আলোচনা করা হয়। ঐ সময়ে সরকারের অবলম্বিত নীতির বিরুদ্ধে কোন সদস্যের কিছু বলিবার থাকিলে তিনি তাহা বলেন। তারপর নয় দশদিন ধরিয়া বিভিন্ন বিভাগের খরচামঞ্জুরী সম্বন্ধে বিতর্ক হয়। তখন সদস্যেরা সংশোধনী প্রস্তাব আনিয়া বলিতে পারেন যে খরচা একশত টাকা বা অন্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কম করা হউক অথবা উহা

আলোচনার জন্য সময়

কমাইয়া এক টাকা করা হউক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এরূপ প্রস্তাব পাস হইবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই।

বিভিন্ন বিভাগের খরচা পাস হইবার পূর্বেই নূতন আর্থিক বৎসর সুরু হয়। তাই ৩১ শে মার্চের মধ্যে সংসদ কিছু আগাম খরচা মঞ্জুর করিয়া থাকেন। ইহাকে Vote on Account বলে। পরে বিভিন্ন বিভাগের খরচা একে একে যখন মঞ্জুর করা হয় তখন একটি Appropriation Bill-এ ঐসব একত্রিত করিয়া পাস করা হয়।

আগাম খরচার মঞ্জুরী

আর্থিক ব্যাপারে সংসদের কর্তৃত্ব : কেবিনেটের প্রস্তাব ছাড়া লোকসভায় অর্থসংক্রান্ত কোন বিল উত্থাপিত বা বিবেচিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ কার্যতঃ কেবিনেটেরই সুপারিশ বলিয়া গণ্য হয়। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের কংগ্রেস যেমন আর্থিক ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া নানাবিধ খরচের প্রস্তাব করে, ব্রিটেনে বা ভারতবর্ষের পার্লামেণ্ট সেরূপ করিতে পারেন না। তবে সংসদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য কয়েকটি মৌলিক নীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, সংসদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কর বসানো যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সংসদের অনুমোদন না পাইলে কেন্দ্রীয় সরকারের একত্রীকৃত কোষ হইতে কোন প্রকার খরচা নির্বাহের জন্য টাকা তোলা যায় না। তৃতীয়তঃ সংসদের Public Accounts Committee পরীক্ষা করিয়া দেখে যে মঞ্জুরী অর্থ সংসদের অভিপ্রায় অনুসারে ব্যয় করা হইয়াছে কি না।

কর্তৃত্বের বিভিন্ন রূপ

সংসদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার এতগুলি উপায় নির্দিষ্ট থাকিলেও সংসদের পক্ষে আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের খুঁটিনাটি বিচার করা অসম্ভব। সংসদ শুধু মূলনীতির আলোচনা করিতে পারে। কোটি কোটি টাকার খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিবার শক্তি ও সময় সংসদের কোন বে-সরকারী সদস্যেরই নাই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মতন ভারতীয় সংসদও আর্থিক ব্যাপারে কেবিনেটের নেতৃত্ব মানিয়া চলে। কেবিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দ লইয়া গঠিত বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সরকারী প্রস্তাবগুলি পাস করাইয়া লওয়া কঠিন হয় না।

মন্ত্রীদের প্রাধান্য

সুপ্রিম কোর্ট ও অন্যান্য আদালত

প্রধান আদালত স্থাপনের ইতিহাস ঃ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সংবিধান কার্যকরী হইলে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার ১৭৬ বৎসর পূর্বে একবার সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল এবং ৮৮ বৎসর কাল ধরিয়া উহা বর্তমান ছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস করিবার সময় আইন করে যে ব্রিটিশ ভারতে অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় এক সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সদর দেওয়ানি আদালত ও সদর নিজামত আদালত ছিল। তাহাদের উপরে সুপ্রিম কোর্টের স্থাপনার ব্যবস্থা হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনের রাজার সনদের দ্বারা বাংলার সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ আদালত রাজার আদালত, কোম্পানীর আদালত নহে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক নিযুক্ত করা হয়। পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রিম কোর্ট (১৭৭৪)

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সুপ্রিম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত আদালত উঠাইয়া দিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের) হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরেই পাঞ্জাবের জন্য একটি চিফ কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সংবিধানে (২১৪ ধারা) লিখিত আছে যে প্রত্যেক আঙ্গিক রাজ্যে এক একটি হাইকোর্ট থাকিবে।

হাইকোর্টের স্থাপনা ১৮৬২

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের বলে দিল্লীতে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি ফেডারেল কোর্ট স্থাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কিছু প্রবর্তিত না হইলেও এই কোর্ট ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত কার্য করিয়াছিল। ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষ হইতে দেওয়ানি মামলার আপিল চলিত ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের বাহিরে আপিল করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফেডারেল কোর্ট (১৮৩৭) ও প্রিভি কাউন্সিল

সুপ্রিম কোর্টের সংগঠন ও অধিকার: ভারতীয় বিচারব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের রায় ভারতের সমস্ত হাইকোর্ট ও অন্যান্য নিম্ন আদালতে নজির রূপে গৃহীত হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকেরা যে সিদ্ধান্ত করেন তাহা আইন রূপে গণ্য হয়। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ও প্রয়োজন বুঝিলে অনুরূপ কোন মামলায় নিজেদের রায় বদলাইয়া নূতন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের যেরূপ ব্যাখ্যা করিবে তাহাই সকলে মানিতে বাধ্য। কোন আইন যদি ভারতীয় পার্লামেণ্ট (সংসদ) কর্তৃক পাস হয়, অথচ সুপ্রিম কোর্ট যদি রায় দেয় যে ঐ বিষয়ে আইন করিবার অধিকার কেবলমাত্র রাজ্য বিধান মণ্ডলের, তাহা হইলে ঐ আইন নারুচ হইয়া যায়। কোন রাজ্যের সরকার যদি প্রজাদের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন নিয়ম চালু করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্টের ঐ নিয়ম রদ করিয়া দিতে পারে। সংবিধানে ঘোষণা করা হইয়াছে যে প্রত্যেক অসামরিক ও বিচার-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের সহায়ক কাজ করিতে বাধ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুপ্রিম কোর্ট কোন কোন বিষয়ে আইন সভা ও শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী।

সুপ্রিম কোর্টের প্রাধান্য

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধান অনুসারে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে ফেডারেল কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল তাহা অনেকটা সুপ্রিম কোর্টের মতন ছিল। কিন্তু তাহার ক্ষমতা ছিল সুপ্রিম কোর্টের চেয়ে অনেক কম। প্রথমতঃ, ফেডারেল কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের প্রিভি-কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটিতে আপিল করা চলিত, কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর বিদেশে ঐরূপ আপিল করা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। দ্বিতীয়তঃ, ফেডারেল কোর্ট কেবলমাত্র সংবিধান-গত ব্যাপারে আপিল শুনিতে পারিত; অন্যান্য বিষয়ে কোন হাইকোর্টের রায় বা ডিক্রীর বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাইত না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট দেওয়ানি, ফৌজদারি বা যে কোন মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিচার করিতে পারে। একমাত্র সামরিক আদালত বা কোর্ট মার্শাল ছাড়া ভারতের যে কোন বিচারালয়ের অথবা ট্রাইবুনালের যে কোন রায় বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল মঞ্জুর করার ক্ষমতা সংবিধানের ১৩৬ ধারা অনুসারে সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া

ফেডারেল কোর্টের সহিত পার্থক্য

হইয়াছে। সাধারণতঃ কোন মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য যদি কুড়ি হাজার টাকার বেশি হয় তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্টের নিকট আপিল করা চলে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ইচ্ছা করিলে মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য অত না হইলেও আপিল করিবার অনুমতি দিতে পারে। তাছাড়া শ্রমিক-মালিক বিরোধ অথবা নির্বাচন ঘটিত মামলার আপিল শুনিয়া সুপ্রিম কোর্ট চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ বলেন যে "সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও অধিকার এত ব্যাপক ও বিচিত্র যে এখানে এক বছরে যত মামলা আসে, ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ফেডারেল কোর্টের প্রায় বার তের বৎসরের মোট অস্তিত্বের মধ্যেও তত মামলা নিষ্পত্তির জন্য ফেডারেল কোর্ট আসে নাই"। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট ৩৫৭টি সংবিধানের ব্যাখ্যাঘটিত আপিল এবং ৫৩১টি মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত মামলার বিচার করিয়াছিল।

সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার (jurisdiction)

সংবিধানে লিখিত আছে যে সুপ্রিম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও সাতজন অন্যান্য বিচারপতি থাকিবেন, কিন্তু পার্লামেণ্ট আইন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া ঐ সংখ্যা স্থির করা হয়। আবার ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে উহা সংশোধন করিয়া প্রধান বিচারপতি ছাড়া আরো তের করা হইয়াছে। বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইতে হইলে প্রত্যেককে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং হয় তাঁহাকে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য কোন হাইকোর্টের বিচারপতির অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হইতে হইবে অথবা এক বা একাধিক হাইকোর্টে অন্ততঃ দশ বৎসর ধরিয়া এডভোকেট থাকিতে হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে কোন এক ব্যক্তি আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, তাহা হইলে তাঁহাকেও বিচারপতির পদে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এ ধরনের লোক এখন পর্যন্ত নিযুক্ত হন নাই। সকলেই হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুপ্রিম কোর্টের সাধারণ বিচারপতি নিয়োগ করিবার সময় রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য। তিনি ইচ্ছা করিলে সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতির ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের সহিতও যুক্তি করিয়া নূতন বিচারপতি নিযুক্ত করিতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মাসিক বেতন পাঁচ হাজার টাকা ও অন্যান্য

সংগঠন

বিচারপতির যোগ্যতা

বিচারপতির বেতন চার হাজার টাকা। তাছাড়া তাঁহারা প্রত্যেকে বিনা ভাড়ায় সরকারী বাসস্থান পান। একবার নিযুক্ত হইলে তাঁহার কার্যকালের মেয়াদের মধ্যে বেতন হ্রাস করা চলিবে না। তবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হইলে বেতন কম করা যাইতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা ৬৫ বৎসর বয়সে, হাইকোর্টের বিচারপতিরা ৬২ বৎসর বয়সে এবং শাসনবিভাগের কর্মচারীরা ৫৮ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে নবেম্বর তারিখের সুপ্রিম কোর্টের ব্যবহারজীবীর তালিকায় ৩২৫৭ জন উকীল ও ব্যারিস্টারের নাম ছিল। ঐ বৎসরের ১লা ডিসেম্বর হইতে Bar Council of India অ্যাডভোকেটদের তালিকা প্রস্তুতের ভার পাইয়াছে।

সুপ্রিম কোর্ট ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের পরস্পরের মধ্যে আইন অথবা ঘটনা সম্পর্কিত যে কোন মামলার মৌলিক বিচার করিতে পাবে (Original Jurisdiction)। মৌলিক বিচার ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের আপিল সংক্রান্ত বিচার করিবার অধিকার আছে।

মৌলিক বিচারের অধিকার

দেওয়ানি মামলার আপিল করিতে হইলে সাধারণতঃ হাইকোর্টের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। হাইকোর্ট যদি বলে যে, মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য বিশ হাজার টাকার চেয়ে কম নহে অথবা তাঁহারা যদি সার্টিফিকেট দেন যে কোন মামলার সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনগত প্রশ্ন জড়িত আছে কিংবা তাঁহারা অন্য কোন কারণে কোন মামলাকে আপিলের যোগ্য বিবেচনা করিয়া সার্টিফিকেট দেন তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা চলে।

ফৌজদারি মামলায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আপিল করা যাইতে পারে (১) যদি নিম্ন আদালতে কোন ব্যক্তিকে নির্দোষ বলা হইলেও হাইকোর্ট তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় (২) যদি হাইকোর্ট নিম্ন আদালত হইতে কোন মামলা নিজের কাছে আনিয়া উহাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয় অথবা (৩) হাইকোর্ট সার্টিফিকেট দেয় যে মামলা সুপ্রিম কোর্টের আপিলের যোগ্য। এই তিন প্রকার মামলা ছাড়া পার্লামেন্ট আইন করিয়া সুপ্রিম কোর্টের অধিকার বাড়াইতে পারে।

ফৌজদারি মামলায় এক্তিয়ার

মৌলিক ও আপিল সংক্রান্ত বিচার ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের রিট্ জুরিসডিকসন (Writ jurisdiction) নামে এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার আছে। সুপ্রিম কোর্ট

নাগরিকের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য হেবিয়াস কর্পাস, ম্যাণ্ডামাস, প্রহিবিসন, কো ওয়ারেণ্টও, ও সারসিওরাইয়ের মত পরোয়ানা বা নির্দেশ জারি করিতে পারে। নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হইতেছে সুপ্রিম কোর্ট।

নাগরিকের অধিকার রক্ষা

রাষ্ট্রপতি আইন ও ঘটনাগত কোন সমস্যা সম্বন্ধে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দিতে বাধ্য নহে। গত বার বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি দুইবার মাত্র সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তিনটি আইনের বৈধতা সম্পর্কে এবং ১৯৫৭ কেরলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন-আইন সম্পর্কে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিচারপতিদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ বলেন যে, সংবিধানে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হইয়াছে তাহা কোন আইন করিয়া ক্ষুণ্ণ করা যায় না।

পরামর্শ দানের অধিকার

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী আদালত: সংবিধান প্রণয়নের সময় আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহোদয় সংবিধান রচনাকারী সভায় বলেন যে পৃথিবীর যে কোন সুপ্রিম কোর্টের অপেক্ষা ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা অধিক ("The Supreme Court in the Indian Union has more powers than any Supreme Court in any part of the world.")। এই উক্তি সর্বাংশে না হইলেও যে মূলতঃ সত্য তাহা কয়েকটি প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের সংবিধান আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সংবিধানে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে যে কোন আদালত সংবিধান ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না। ব্রিটেনেও আদালতের ঐ ক্ষমতা নাই। এই সব দেশের আইনসভা যে কোন আইন পাস করুক না কেন, কোন আদালত বলিতে পারে না যে ঐরূপ আইন করিবার ক্ষমতা আইনসভার নাই। কিন্তু ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক রাজ্যের কোন আইন যদি এমন দেখিতে পায় যে সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ তাহার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিংবা সংবিধানে যে যে বিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতা ইউনিয়নকে বা আঞ্চলিক রাজ্যকে দেওয়া হইয়াছে তাহা

জুডিসিয়াল রিভিউ বা আইনের বৈধতা বিচার

অতিক্রম করিয়া ঐ আইন করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে মামলা উপস্থিত হইলে উহার রায় দিবার সময় ঐ আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্য না থাকিলে কোন আইন বৈধ হইতে পারে না এবং ঐরূপ সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহা বিচার করিবার ভার সুপ্রিম কোর্টের উপর। তাহা বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে একটি মামলার রায় দান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "A statute law to be valid must, in all cases be in conformity with the constitutional requirements and it is for the judiciary to decide whether any enactment is constitutional or not" (১৯৫০ খৃষ্টাব্দের S. C. J. পৃ: ২৬২)। কোন আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতাকে Judicial Review বলে।

কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের উপর এইরূপ Judicial Review-এর ক্ষমতা যতটা আছে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ততটা নাই। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট অনেক সময় সংবিধানের অন্তর্নিহিত অর্থ বা উদ্দেশ্য বাহির করিয়া কংগ্রেসের দ্বারা পাস করা আইনকে অবৈধ বলিয়া থাকে। সেখানকার সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানে সুস্পষ্ট কোন বাধানিষেধ না পাইলেও মানবের স্বাভাবিক অধিকার প্রভৃতি অস্পষ্ট ধারণার দোহাই দিয়া আইনকে বে-আইনী বলিয়া থাকে।

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের আইনের বৈধতা বিচার ক্ষমতা আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের তুলনায় কম

আমেরিকার সংবিধান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহাদের পক্ষে এইরূপ টানিয়া বুনিয়া মানে করা সম্ভব হয়। ভারতীয় সংবিধানে একদিকে নাগরিকের অধিকারের অন্যদিকে রাজ্যগুলি-ক্ষমতার বিশদ বর্ণনা দেওয়ায় এদেশের সুপ্রিম কোর্টের ঐরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। তাই বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাশ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে রায় দান প্রসঙ্গে বলেন "But our Constitution, unlike the American Constitution does not recognise the absolute supremacy of the court over the legislative authority in all respects, for outside the restricted field of constutional limitations our parliament and the state legislature are supreme in their respective ligislative fields and in the wider field there is no scope for the courts in India to play the role of the Supreme Court of the United States." (S.I.C. পৃ ২৬৪,-১৯৫০)।

সংবিধানে বলা হইয়াছে যে সংসদ ও রাজ্যের বিধানমণ্ডলী নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন করিতে পারেন, কিন্তু ঐরূপ নিয়ন্ত্রণ যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই। কোন নিয়ন্ত্রণমূলক আইন কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা বিচার করিবার ভার কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের উপর।

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের কিন্তু আঙ্গিক রাজ্যের অধিকারভুক্ত বিষয়ের উপর মামলায় আপিল শুনিবার এক্তিয়ার নাই; ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের অধিকার এভাবে সঙ্কুচিত নহে। আমেরিকায় আঙ্গিক রাজ্যের আদালতের সহিত সুপ্রিম কোর্টের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ভারতের বিচারপদ্ধতি একীভূত (integrated)। সেইজন্য যে-কোন আঙ্গিক রাজ্যের যে কোন প্রকার বে-সামরিক মামলার আপিল শুনিবার ক্ষমতা আমাদের সুপ্রিম কোর্টের আছে (সংবিধানের ১৩৬ ধারা)। আমেরিকার ও অস্ট্রেলিয়ার সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শদানের কোন ক্ষমতা নাই। আমাদের সুপ্রিম কোর্ট ইচ্ছা করিলে ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে পরামর্শ দান করিতে পারে। কানাডার সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দিতে পারে বটে কিন্তু ঐ আদালতের নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত করিবার ক্ষমতা নাই।

কিন্তু ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট যে কোন মামলার আপিল শুনিতে পারে

বিচারকগণের স্বাতন্ত্র্য: বিচারকগণ যদি শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষের অধীন হন তাহা হইলে নাগরিকের ধনপ্রাণ শাসকদের খেয়ালখুসির উপর নির্ভর করে। তাঁহাদের উপর আইনসভার নিয়ন্ত্রণও নাগরিকদের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। তাই ভারতীয় সংবিধানে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারকদের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁহাদের নিযুক্তির ব্যাপারে কেবলমাত্র যোগ্যতাই দেখা হয়, রাজনৈতিক দলাদলির প্রশ্ন তোলা হয় না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরূপে কাহাকেও নিযুক্ত করিতে হইলে রাষ্ট্রপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতিকে অবশ্য মন্ত্রিমণ্ডলীর সাহায্য ও পরামর্শ লইতে হয়। কিন্তু মন্ত্রীরা সাধারণতঃ সুপ্রিম কোর্টের ও হাইকোর্টের বিচারকদের অভিমত অনুসারেই এরূপ উচ্চপদে লোক নিযুক্ত করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতি বলা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের

নিযুক্তির ব্যবস্থায় দলের প্রভাব নাই

মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশিদিন ধরিয়া ঐ পদ অলংকৃত করিতেছেন অর্থাৎ যিনি সবচেয়ে সিনিয়র তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করা হয়। এ সম্বন্ধে সংবিধানে কোন নিয়ম নাই বটে তবে ঐরূপই প্রথা দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং প্রধান বিচারপতিকে তাঁহার নিযুক্তির জন্য কাহারও নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবার প্রয়োজন নাই।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের কার্যকাল ভারত সরকারের অন্য যে কোন কর্মচারীর কার্যকালের চেয়ে অধিক। তাঁহারা ৬৫ বৎসরে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অবসর গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট বয়স নাই; তাঁহারা যতদিন খুসি জজিয়তি আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের জজেরা অবসর গ্রহণের পর আর ভারতের কোন আদালতে ওকালতী করিতে পারেন না। কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সদস্যগণ যেমন অবসর গ্রহণের পর আর কোনরূপ সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত হইতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচারকদের বেলায় কিন্তু সেরূপ কোন নিয়ম নাই। কোন কোন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক অবসরগ্রহণের পর রাষ্ট্রদূত কিংবা রাজ্যপালরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ পদে নিযুক্ত হইবার আশায় তাঁহারা বিচারক পদে বহাল থাকিবার সময় শাসকবর্গের মনস্তুষ্টি সাধন করিবেন এরূপ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং ইহার ফলে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যের কোন হানি হয় না।

অবসর গ্রহণের পর অন্য পদে নিযুক্ত

সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নির্ভীকভাবে বিচারকার্য করিতে পারেন। পদ হারাইবার ভয়ে তাঁহাকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় না। কেন না সংবিধানে লিখিত আছে যে কোন বিচারককে পদচ্যুত করিতে হইলে সংসদের প্রত্যেক সদনে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে একটি প্রস্তাব পাস করা দরকার, এরূপ প্রস্তাব পাস হওয়া বড় সহজ নহে। এই ধরনের প্রস্তাব না উঠিলে কেহ সংসদেও কোন বিচারকের আচরণ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিতে পারেন না। বিচারকদের সরকারী কাজের সম্বন্ধে কেহ বলিতে পাইবেন না যে তাঁহারা কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া কোন মামলায় বিশেষ কোন রায় দিয়াছেন।

পদচ্যুতির ও সংসদে সমালোচনার আশঙ্কা কম

যদি কোন সংবাদপত্র ঐরূপ লেখেন তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা আনা হয়।

বিচারকদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সংবিধানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে তাঁহাদের বেতন লইয়া সংসদে ভোটাভুটি চলিবে না। ঐ বেতনের মঞ্জুরি প্রতি বৎসর লইবার প্রয়োজন নাই। উহা একত্রীকৃত কোষ (Consolidated Fund) হইতে দেয় বলিয়া ধার্য। এই সব ব্যবস্থার ফলে ভারতের উচ্চতম আদালতের বিচারকবর্গ পরিপূর্ণরূপে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছেন।

বিচারকদের স্বাতন্ত্র্য

হাইকোর্টের সংগঠন : প্রত্যেক আঙ্গিক রাজ্যে এক একটি হাইকোর্ট আছে। কিন্তু নব-প্রতিষ্ঠিত নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের জন্য আসামের হাইকোর্টই বর্তমানে কাজ চালাইবে। হাইকোর্টগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইতেছে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের হাইকোর্ট। এই তিনটি হাইকোর্ট ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোরে মহীশূরের হাইকোর্ট, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পাটনা হাইকোর্ট, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীনগর ও জম্মুতে জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্ট, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব ও দিল্লীর জন্য চণ্ডীগড়ে হাইকোর্ট, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে গৌহাটিতে আসামের ও কটকে উড়িষ্যার হাইকোর্ট, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে যোধপুরে রাজস্থানের হাইকোর্ট, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদে অন্ধ্রপ্রদেশের হাইকোর্ট, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে এর্ণাকুলমে কেরলের হাইকোর্ট, ও জব্বলপুরে মধ্যপ্রদেশের হাই-কোর্ট এবং ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে আহমেদাবাদে গুজরাতের হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। এলাহাবাদের হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌতে, বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের নাগপুরে, কেরলের হাইকোর্টের ত্রিবান্দ্রমে, জব্বলপুরের হাইকোর্টের ইন্দোর ও গোয়ালিয়রে এবং চণ্ডীগড়ের হাইকোর্টের দিল্লীতে বেঞ্চ আছে, অর্থাৎ কয়েকজন বিচারক এই সব জায়গাতেও বিচার করেন। কেন্দ্রশাসিত হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে জুডিশিয়াল কমিসনার হাইকোর্টের কাজ করেন।

বিভিন্ন হাইকোর্ট স্থাপনের ইতিহাস

সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের সংখ্যা যেমন সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট আছে, হাইকোর্টের সেরূপ নাই। বিভিন্ন হাইকোর্টে কাজের চাপ দেখিয়া রাষ্ট্রপতি যথোপযুক্ত সংখ্যক বিচারপতি নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক হাইকোর্টেই একজন করিয়া প্রধান বিচারপতি থাকেন। তিনি ছাড়া অন্যান্য বিচারকের সংখ্যা

বিভিন্ন হাইকোর্টে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এইরূপ ছিল : এলাহাবাদ ২১, কলিকাতা ২৪, হায়দ্রাবাদ ১৭, চণ্ডীগড় ১৫, পাটনা ও জব্বলপুর ১৪ করিয়া, মাদ্রাজ ১১, বাঙ্গালোর ও এর্ণাকুলম ১০ করিয়া, যোধপুর ৮, আহমেদাবাদ ৭, কটক ৩, এবং গৌহাটি ও শ্রীনগরে ২ জন করিয়া।

বিচারকের সংখ্যা

মাসে প্রধান বিচারপতি মাসিক চার হাজার টাকা বেতন পান। অন্যান্য বিচারপতিরা সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন পান, কিন্তু আয়কর প্রভৃতি বাদ দিয়া তাঁহারা নগদ আটাশ শ টাকা মাত্র হাতে পান। এইজন্য অনেক পসারওয়ালা উকিল-ব্যারিস্টার বিচারকের পদ গ্রহণ করিতে চাহেন না। হাইকোর্টের বিচারক পদে নিযুক্ত হইলে ষাট বৎসর বয়সে অবসর লইতে হয় এবং যেখানে তিনি বিচারকের কাজ করিয়াছেন সেখানে আর ওকালতী করিতে পারেন না। সংবিধানে প্রথমে লিখিত ছিল যে হাইকোর্টের বিচারপতি অবসরগ্রহণের পর আর কোথাও ওকালতি করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই সর্তে যোগ্য লোক পাওয়া কঠিন হইতেছিল বলিয়া এখন কোন হাইকোর্টের বিচারককে সুপ্রিম কোর্টে বা অন্য কোন হাইকোর্টে ওকালতী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যিনি হাইকোর্টের বিচারকের ন্যায় গৌরবপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি বাষট্টি বৎসর বয়সের পর অবসর লইয়া নূতন জায়গায় যাইয়া পুনরায় ওকালতী সুরু করিতে উৎসুক হইবেন কিনা সন্দেহ।

বেতন

ভারতীয় নাগরিক ব্যতীত অন্য কেহ হাইকোর্টের বিচারক হইতে পারেন না। ইহা ছাড়া তাঁহার নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন—(ক) ভারতের কোনও আদালতে বিচারকের কাজে অন্ততঃ দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা (খ) এক বা একাধিক হাইকোর্টে অন্ততঃ দশ বৎসরকাল ধরিয়া অ্যাড্‌ভোকেটের কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। মেয়েরাও হাইকোর্টের বিচারক হইতে পারেন। কেরল রাজ্যে একজন মহিলা হাইকোর্টের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বিচারপতি হইবার যোগ্যতা

যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারকরূপে নিযুক্ত করেন। তিনি ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং যে রাজ্যের হাইকোর্টে নিযুক্ত করা হইবে সেখানকার রাষ্ট্রপাল ও প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া লোক নিযুক্ত করেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এখানেও রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপাল বলিতে তাঁহাদের মন্ত্রিমণ্ডলীর কথা বুঝাইতেছে।

নিযুক্ত করিবার প্রণালী

কোন বিচারক দীর্ঘদিনের জন্য ছুটি লইলে তাঁহার স্থানে অস্থায়ী বিচারক নিযুক্ত করা হয়। যখন অনেক মামলা অমীমাংসিত থাকে তখন রাষ্ট্রপতি দুই একজন অতিরিক্ত বিচারককে দুই বৎসরের অনধিককালের জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ হইবে বলিয়া এবং দেশের সংহতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে প্রয়োজন হইলে কোন রাজ্যের বাহির হইতে লোক লইয়া হাইকোর্টে নিযুক্ত করা চলিবে। কিন্তু অনেকগুলি রাজ্য এই প্রস্তাবে সম্মতি দেয় নাই। তবে সংবিধানে লিখিত আছে যে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বুঝিলে কোন বিচারককে এক হাইকোর্ট হইতে অন্য হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন। মাঝে মাঝে এরূপ করা হইতেছে।

অস্থায়ী ও অতিরিক্ত বিচারক

হাইকোর্টের বিচারকগণের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদের চাকুরি ও বেতনকে যতদূর সম্ভব পাকা ও সুনিশ্চিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের অবসর গ্রহণের বয়স উপস্থিত হইবার পূর্বে যদি তাঁহাদিগকে অপসারিত করিতে হয় তাহা হইলে সংসদের উভয় সদন হইতে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এক প্রস্তাব পাস করাইয়া রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাইতে হয় এবং রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। এরূপ করা সহজ নহে। তাই হাইকোর্টের বিচারকগণের চাকুরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের বেতনও আইনসভার ভোটে দেওয়া হয় না। সেইজন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের মতন তাঁহারাও নির্ভয়ে বিচার কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন। নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার কাজে তাঁহারা যথেষ্ট তৎপরতা ও নিরপেক্ষতা দেখাইয়া থাকেন। হাইকোর্ট আঞ্চিক রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত হইলেও তথাকার আইনসভা হাইকোর্টের সংবিধান ও সংগঠনের কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। উহা একমাত্র কেন্দ্রীয় সংসদের এক্তিয়ার।

হাইকোর্টের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা

হাইকোর্টের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার (Extent of Powers and Jurisdiction of a High Court) : কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের হাই-কোর্টের ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলায় মূল বিচারের ক্ষমতা আছে; কিন্তু উহা নাগরিক অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য হাইকোর্টের শুধু আপিল শুনিবার ক্ষমতা আছে; তবে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট মূল বিচার করিতে পারে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনবিধি অনুসারে হাইকোর্ট যদি বুঝিতে পারে যে নিম্ন আদালতে কোন মামলায় ন্যায় ও সুবিচারের মৌলিক নীতি অবহেলিত হইতেছে বা অত্যন্ত অন্যায় অবিচার হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা হইলে হাইকোর্ট এই মামলা হাইকোর্টে আনিয়া বিচার করিতে পারে। আমাদের সংবিধানে এই নিয়ম বজায় রাখা হইয়াছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হাইকোর্ট রাজস্ব সংক্রান্ত মামলায় মূল (original) বিচার করিতে পারিত না। কিন্তু বর্তমান সংবিধানে ঐ নিষেধ দূর করা হইয়াছে।

সকল হাইকোর্টই নিজ নিজ এলাকার মধ্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার উচ্চতম আপিল আদালত। হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের মতন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হেবিয়াস্ কর্পাস্, পরমাদেশ বা Mandamus, প্রতিষেধ বা Prolibition উৎপ্রেষণ বা Certiorari, এবং অধিকার পৃচ্ছা বা Quo Warranto লেখ জারি করিতে পারে। হাইকোর্ট নিজ এলাকার ভিতরের সামরিক আদালত ছাড়া আর সকল প্রকার আদালতের ও ট্রাইব্যুনালের ও প্রশাসনিক বিচারালয়ের (Administrative Courts) কার্য নিরীক্ষণ করিতে পারে। ঐসব আদালত হইতে কাজের হিসাব চাহিতে পারে, উহাদের ব্যবহারের জন্য নিয়মকানুন তৈয়ারি করিয়া দিতে পারে, কিভাবে হিসাবপত্র ও বিবরণাদি লিখিত হইবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে পারে, আইনজীবীদের ও কেরানীদের ফিয়ের হার বাঁধিয়া দিতে পারে।

আঞ্চিক রাজ্যের মধ্যে কোন আদালতে যে কোন মামলায় যদি সংবিধানের ব্যাখ্যা লইয়া কোন প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে উহার মীমাংসা একমাত্র হাইকোর্টই করিতে পারে—নিম্নতন কোন আদালত পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে নিম্নতন আদালত হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং হাইকোর্টও নিজ হইতে ঐ ধরনের মামলা তুলিয়া আনে। তবে সংবিধানের ব্যাখ্যার সহিত অন্য প্রশ্নও যদি জড়িত থাকে তাহা হইলে আগে নিম্ন আদালতে সেগুলির মীমাংসা করা হয়, পরে হাইকোর্ট সংবিধানে ঘটিত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করে। ১৫টি হাইকোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী। তাই কখনও কখনও এক কোর্টের ব্যাখ্যার সহিত অন্য কোর্টের ব্যাখ্যার বিরোধ বাধে। এরূপ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট অসঙ্গতি দূর করিতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় হাইকোর্টও Court of Record। উহার অর্থ

হইতেছে এই যে হাইকোর্টের সমস্ত রেকর্ড রক্ষিত হয় এবং পরবর্তীকালে উহা সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। কোন ব্যক্তি যদি আদালতের অবমাননাকর কোন উক্তি করেন তবে কোর্ট অব রেকর্ড হিসাবে হাইকোর্ট (এবং সুপ্রিমকোর্ট) তাঁহাকে নিজেই দণ্ড দিতে পারে।

প্রশাসনিক বিচারালয় (Administrative Tribunals): রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের কাজ জটিলতর হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে আইনের মধ্যে বলিয়া দেওয়া হয় যে ঐ আইন সম্পর্কিত কোন মামলা উঠিলে উহা প্রশাসনীয় কর্তৃপক্ষ বিচার করিবেন। বাড়িভাড়া লইয়া মামলা সাধারণ আদালতের সামনে না আসিয়া Rent Controller-এর কাছে যায়। তেমনি মোটর গাড়ি সম্বন্ধে আইনের মামলা পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিচার করেন। এই ধরনের কর্তৃপক্ষকে ঠিক আদালত বলা চলে না। অথচ ইঁহারা নাগরিকদের অধিকার লইয়া বিচার করেন এবং ইহাঁদের রায় বাদী প্রতিবাদী মানিতে বাধ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তির যদি প্রশাসনিক আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকে তাহা হইলে তিনি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হইতে পারেন এবং হাইকোর্ট যদি মনে করে যে ঐ আদালত স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে গিয়াছে কিংবা উহার এক্তিয়ারের বাহিরে গিয়াছে তাহা হইলে উৎপ্রেষণ লেখ (Certiorari) জারি করিতে পারে।

সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ১৩৬ ধারার বলে আপিল করিবার বিশেষ অনুমতি দিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনিক আদালতের দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করে না।

শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ: ব্রিটিশ আমলে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে শাসনবিভাগীয় ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা একত্রে ন্যস্ত ছিল। তাহার ফলে ম্যাজিস্ট্রেটরূপে তিনি যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতেন বিচারকরূপে আবার তিনিই তাহার বিচার করিতেন। অভিযোগকারী ও বিচারক একই ব্যক্তি হওয়ার দরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের সীমা ছিল না। তাই বহুকাল ধরিয়া কংগ্রেস দাবি করিয়াছিল যে শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে পৃথক করা হউক। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করিল তখন তাঁহারা সংবিধানের নির্দেশক নীতির মধ্যে এই পৃথকীকরণ নীতি সন্নিবিষ্ট করিলেন (ধারা ৫০)।

এই নীতি অনুসরণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, কেরল, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ ও ভূপাল অঞ্চল, পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত পেপসু ও অন্য পাঁচটি জেলায়, উড়িষ্যার নয়টি জেলায়, বিহারের বারটি জেলায় এবং উত্তরপ্রদেশের ৫৪টি জেলার মধ্যে ৪৭টি জেলায় শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে পৃথক করা হইয়াছে। আসাম ও রাজস্থানেও পৃথকীকরণের সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। যে সকল ম্যাজিস্ট্রেটকে বিচার সম্পর্কিত কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের আইনজ্ঞান আবশ্যিক এবং তাঁহারা হাইকোর্টের অধীনে ন্যস্ত হইয়াছেন।

নিম্ন আদালতগুলিকে হাইকোর্টের অধীনে রাখার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে ইহা যেন শাসনবিভাগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে পড়িয়া নাগরিকদের অধিকার অনর্থক সঙ্কুচিত না করে। হাইকোর্টের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপাল জেলাজজকে নিযুক্ত করেন। নিম্ন আদালতের অন্যান্য বিচারকের যোগ্যতা কি হইবে সে সম্বন্ধে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ অনুসারে পাবলিক সার্ভিস কমিসন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লইয়া মুন্সেফকে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করে। যাঁহারা অন্ততঃ তিন বৎসর ধরিয়া কোন আদালতে ওকালতী করিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই ঐ পরীক্ষায় বসিতে পারেন। সাবজজ হইতে অনেকে প্রমোশন পাইয়া জজ হন আবার অন্ততঃ সাত বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন উকীল বা অ্যাডভোকেটদের মধ্য হইতেও জেলা জজকে নিযুক্ত করা হয়। সংবিধানের ২৩৬ ধারায় লিখিত আছে যে জেলা জজ বলিতে সহকারী সেসন জজ, অতিরিক্ত সেসন জজ, প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, জয়েন্ট জেলা জজ ও সহকারী জেলা জজকেও বুঝাইবে। সুতরাং এই সব পদেও লোক নিযুক্ত করিতে হইলে রাষ্ট্রপালকে হাইকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

জেলা আদালত ও ইহার অধীন অন্যান্য আদালতে কাহাকে কোথায় স্থাপন করা হইবে, কাহাকে প্রমোশন দেওয়া হইবে, এমন কি ছুটি দেওয়া হইবে কি না তাহাও হাইকোর্টের উপর নির্ভর করে (২৩৫ ধারা)। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে বিচারবিভাগ শাসনবিভাগের প্রভাব হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়াছে।

জেলা আদালত ও অন্যান্য নিম্ন আদালত ঃ সাধারণতঃ প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা আদালত আছে। কিন্তু কোথাও কোথাও ছোটখাট দুইটি

জেলার জন্য একটি জেলা আদালতেরও ব্যবস্থা আছে। মহকুমা বা তহশিলেও আদালত আছে। জেলা বা মহকুমার কেন্দ্র নহে এমন জায়গায় যদি মুন্সেফের আদালতে থাকে তবে তাহাকে চৌকি বলে। গ্রামের পঞ্চায়েতে সর্বনিম্ন আদালত আছে। পশ্চিমবঙ্গে নিম্নতম গ্রাম্য দেওয়ানি আদালতকে ইউনিয়ন কোর্ট বলে। নিম্নতম গ্রাম্য ফৌজদারি আদালতের নাম বেঞ্চ কোর্ট। এই সব আদালতে ছোটখাট মামলা হয়।

মুন্সেফের আদালতে সাধারণতঃ যে সব দেওয়ানি মামলায় এক হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি তাহারই বিচার হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ দাবির সীমা পাঁচ হাজার পর্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু কোন মামলার দাবি দুই হাজার টাকার অধিক হইলে উহা সরাসরি জেলা জজ বা সাবজজের আদালতে উপস্থিত করা যায়। ইহাদের বেলায় দাবির অঙ্কের কোন উর্ধ্বতন সীমা নির্দিষ্ট নাই। জেলা জজ মুন্সেফ ও সাবজজদের আদালত হইতে প্রথম আপিল শুনিতে পারেন।

ফৌজদারি মামলা ছোটখাট হইলে অনারারি (অবৈতনিক) ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করিতে পারেন। বেতনভুক্ ম্যাজিস্ট্রেটরা গুরুতর ফৌজদারি মামলার প্রাথমিক বিচার করিয়া অভিযুক্তকে দায়রা সোপর্দ করিতে পারেন। জেলা জজ দায়রা (Sessions) জজরূপে কার্য করেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কোথাও কোথাও অতিরিক্ত দায়রা জজ ও সহকারী দায়রা জজ থাকেন।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি সহরে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারি মামলা ও প্রেসিডেন্সি ছোট আদালতে (Small Causes Court) বিশেষ নির্দিষ্ট সীমার দাবিদাওয়ার মামলার বিচার হয়।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ (Public Services)

স্থায়ী কর্মচারীদের গুরুত্ব : সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই মন্ত্রীরা শাসনসংক্রান্ত নীতির নির্দেশ দেন এবং স্থায়ী কর্মচারীরা উহা কার্যে পরিণত করেন। মন্ত্রীরা রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তি। দলের উত্থান ও পতনের সঙ্গে তাঁহাদের 'মন্ত্রিত্বের প্রাপ্তি ও অবসান ঘটে। স্থায়ী কর্মচারীরা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহেন। তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক দলভুক্ত মন্ত্রীদিগকে সেবা করেন। তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে তাঁহারা মন্ত্রীদিগের সামনে সকল তথ্য রাখিয়া কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে ভাল হয় সে সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রচুর। সেইজন্য বুদ্ধিমান মন্ত্রীরা তাঁহাদের পরামর্শ ধীরভাবে বিবেচনা করেন। তবে উহা গ্রহণ করা না করা তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এক চাকায় যেমন গাড়ি চলে না, তেমনি শুধু মন্ত্রীদের দ্বারা প্রশাসনিক কার্য নির্বাহ হইতে পারে না। মন্ত্রীদের সহিত স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের পরিপূর্ণ ও আন্তরিক সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী কর্মচারীদের সংখ্যা, স্তরবিভাগ ও কার্য : কেন্দ্রীয় সরকারের বে-সামরিক কর্মচারীদের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে রেলবিভাগে সাড়ে এগার লক্ষের উপর এবং ডাক ও তারবিভাগে পৌনে চার লক্ষের উপর কর্মচারী আছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্বে ডাক, তার ও প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে উনপঞ্চাশ হাজার কর্মচারী ছিলেন। রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাইবার জন্য উহা এখন ছয়গুণের বেশি বাড়িয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন স্তরের চাকুরির জন্য প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লইয়া কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়।

(১) নিখিল ভারতীয় প্রশাসনিক চাকুরি (Indian Administrative Service, I. A. S.)। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এই চাকুরিকে Indian Civil Service বা I. C. S. বলা হইত। এই পদে যাঁহারা নিযুক্ত হন তাঁহারা ভারত সরকারের অধীনে বা কোন রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করেন। পরীক্ষায় পাস

করিবার পর ইঁহাদিগকে মুসৌরিতে অবস্থিত প্রশাসনিক শিক্ষা কেন্দ্রে (National Academy of Administration) কিছুকাল শিক্ষা লইতে হয়। ইঁহাদের জুনিয়র স্কেলের বেতন ৩৫০ হইতে ১৯ বৎসরে ৯৫০ এবং সিনিয়র স্কেলের বেতন ৮০০ হইতে ২৫ বৎসরে ১৮০০ হইবে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন তাঁহারা কোন বিভাগের কমিসনার বা সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইলে মাসিক তিন হাজার টাকা বেতন পান। কিন্তু ঐ পদে যদি কোন আই, সি, এস, কাজ করেন তাহা হইলে তিনি মাসে চার হাজার টাকা বেতন পান। স্বাধীনতা লাভের সময় যে সব ব্রিটিশ আই, সি, এস, ছিলেন তাঁহারা উপযুক্ত পেন্সন ও ক্ষতিপূরণ লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। কাজেই এখন যেসব আই, সি, এস, কাজ করিতেছেন তাঁহারা সকলেই ভারতীয় নাগরিক।

কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবালয়ে (Secretariat) যে সব আই, সি, এস. জয়েন্ট সেক্রেটারিরূপে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা মাসে তিন হাজার টাকা বেতন পান; কিন্তু আই, এ, এসেরা ঐ পদে বহাল হইলে ২২৫০ টাকা (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের তুল্য) বেতন পান। ডেপুটি সেক্রেটারির ১১০০ হইতে ১৮০০ টাকা বেতন পান। যাঁহারা আই, এ, এস, পরীক্ষা পাস করেন নাই অথচ কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত প্রথমস্তরে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা আণ্ডার সেক্রেটারির পদে ৯০০ হইতে ১২০০ টাকা বেতনে উন্নীত হন।

প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লইয়া কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের জন্য করণিক (Assistants, চতুর্থ স্তর) নিযুক্ত করা হয়। ইঁহাদের স্নাতক উপাধি থাকা প্রয়োজন। পাস করিলে ইহারা ২১০ হইতে ৫৩০ টাকা গ্রেডে নিযুক্ত হন।

সম্প্রতি দ্বিতীয় Pay Commission-এর সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরকে একীভূত করা হইয়াছে। ঐ স্তরের কর্মচারীদিগকে আগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলা হইত; এখন তাঁহাদিগকে Section Officer বলা হয়। ইঁহাদের বেতনের গ্রেড ৩৫০ হইতে ৯০০ পর্যন্ত। ইহাদের অধস্তন কর্মচারীদের মধ্য হইতে বাছিয়া অর্ধেক চাকুরী দেওয়া হয়; বাকী অর্ধেক প্রতিযোগিতা পরীক্ষার দ্বারা নিযুক্ত করা হয়। আবার ইঁহাদের উপরিতন প্রথম স্তরের অর্থাৎ আণ্ডার সেক্রেটারির স্তরের যতগুলি পদ খালি হয় তাহার অর্ধেক ইঁহাদের মধ্য হইতে উন্নীত করিয়া লওয়া হয়।

(২) ভারতীয় বৈদেশিক সেবা (Indian Foreign Service)—বিদেশের

প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের সহিত আমাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষার জন্য প্রায় এক হাজার রাষ্ট্র ও বাণিজ্যদূত নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহাদের সেক্রেটারিয়েটে প্রায় ১৫০০ ব্যক্তি কাজ করেন। ৩৬টি রাষ্ট্রে ভারতের দূতাবাস (Embassy) আছে। কমনওয়েলথ-ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে এক একজন হাই কমিসনার আছেন। ছোটখাট রাষ্ট্রে আমাদের প্রতিনিধি (Legations) আছেন। ইঁহারা ছাড়া ১৭টি স্থানে আমাদের বাণিজ্য দূতাবাস (Consulates) আছে। Indian Foriegn Service পরীক্ষায় যাঁহারা পাস করেন তাঁহাদিগকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে জুনিয়ার স্কেলের লোকেরা ৪০০ হইতে ১০০০ এবং সিনিয়ার স্কেলের ব্যক্তিরা ৯০০ হইতে ১৮০০ টাকা বেতন পান। কতকগুলি উচ্চপদের বেতন ১৮০০ হইতে ৩০০০।

(৩) নিখিল ভারতীয় পুলিস সার্ভিস—পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ইনস্‌পেকটর জেনারল পর্যন্ত এই সেবা হইতে নিযুক্ত হন। ইঁহারাও প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পাস করেন এবং ইঁহাদিগকে অন্ততঃপক্ষে স্নাতক উপাধিধারী হওয়া প্রয়োজন। এই সেবার জুনিয়ার স্কেলের বেতন ৪০০ হইতে ৯৫০ ; সিনিয়র স্কেলের বেতন ৭৪০ হইতে ১৩০০ টাকা। যে কোন রাজ্যের ডেপুটি ইনস্‌পেকটর জেনারেল ১৬০০ হইতে ১৮০০ ; কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিসনার ১৮০০ হইতে দুই হাজার এবং ইন্‌সপেকটর জেনারেল ২২৫০ টাকা মাসিক বেতন পান। গুপ্তচর বিভাগের বড়কর্তা (Director Intelligence Bureau) মাসে ২৭৫০ টাকা বেতন পান।

(৪) আই, এ, এস, পরীক্ষার সহিত একই প্রশ্নপত্রের দ্বারা নিখিল ভারতীয় হিসাব (Audit and Accounts Service), শুল্ক ও উৎপাদন শুল্ক (Customs and Central Excise Service) এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের হিসাব (Indian Defence Accounts Service)-য়ের লোক নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। এইসব চাকুরির প্রাথমিক বেতন ৪০০ এবং উচ্চতম বেতন দুই হাজার বা ২২৫০। ইনকামটেক্স সার্ভিসের প্রথম স্তরের কর্মচারীদিগকেও ঐ ভাবেও প্রায় অনুরূপ বেতনে নিযুক্ত করা হয়।

(৫) নিখিল ভারত ডাক বিভাগের উচ্চতন স্তরের কর্মচারীরাও ঐ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পাস করিয়া ৪০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। একটি রাজ্যের পোস্টমাস্টার জেনারেল ১৮০০ হইতে ২০০০ টাকা বেতন পান। যাঁহারা ভারতীয়

ডাক ও তার বিভাগের বোর্ডের সদস্য হন তাঁহারা মাসে ২২৫০ টাকা বেতন পান।

(৬) ভারতীয় রেলপথের হিসাব বিভাগের উচ্চতন স্তরের কর্মচারীদিগকেও ঐ পরীক্ষায় কৃতকার্য নর-নারীদের মধ্য হইতে লওয়া হয়। ইঁহাদের বেতনও ৪০০ হইতে ১২৫০ হয় এবং উচ্চতম কর্মচারীরা ২২৫০ টাকা বেতন পান। রেল-পরিচালনার ও রেলের বাণিজ্যবিভাগের কর্মচারীরাও অনুরূপ বেতন পাইয়া থাকেন।

অধিকাংশ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মেয়েরাও বসিতে পারেন এবং তাঁহারাও উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার অধিকারী। অনেক ভারতীয় মহিলা কৃতিত্বের সহিত নানা বিভাগে কাজ করিতেছেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তাঁহারা এই সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিলেন।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজ্যসভা প্রস্তাব করিয়াছে যে, সংসদ আইন করিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের, বন বিভাগের এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের জন্য নিখিল ভারতীয় সার্ভিস সৃষ্টির ব্যবস্থা করুক।

ভারত সরকার এখন শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে অনেক কার্য নিজেদের হাতে লইয়াছেন। ঐ সব কাজের জন্য শিল্প পরিচালনা ও ক্রয়-বিক্রয়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। তাই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে যাঁহারা ঐ ধরনের কাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোককে বাছিয়া সরকারী পদ দেওয়া হইতেছে। তাঁহারা যথোপযুক্ত বেতন পাইয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিসন (Union Public Service Commission): ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসনবিধিতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিসন স্থাপনের ব্যবস্থা থাকিলেও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে উহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যখন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসনবিধি প্রবর্তিত হইল তখন হইতে ঐ কমিসনের নাম হইল ফেড়ারেল পাবলিক সার্ভিস কমিসন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিসনের স্থাপনার ব্যবস্থা করা হইল।

রাষ্ট্রপতি নিয়ম করিয়া উহার কতজন সদস্য থাকিবেন এবং তাঁহাদের চাকুরির সর্ত কি হইবে তাহা নিরূপণ করিবেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার আটজন সদস্য ছিলেন। ইঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অর্ধেক ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য-সরকারের অধীনে অন্ততঃ দশবৎসর চাকুরির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এরূপ করিবার কারণ এই যে সরকারী চাকুরিতে

কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার তাহা তাঁহারাই ভাল বুঝিবেন। বাকী অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি বা অনুরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে হইতে লওয়া হয়। ইঁহাদের নিযুক্তি ছয় বৎসরের জন্য হয়, কিন্তু ৬৫ বৎসর বয়সে সকলকেই অবসর লইতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ন্যায় ইঁহাদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ বৎসর করা হইয়াছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারকেরা অবসর লইবার পর আবার অন্য পদে নিযুক্ত হইতে পারেন। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সভাপতি সেরূপ পারেন না। অন্যান্য সদস্য সভাপতির পদে উন্নীত হইতে পারেন বা কোন রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিসনে যোগ দিতে পারেন। শেষোক্ত বিকল্প অনেকটা নিরর্থক, কেননা রাজ্য, পাবলিক সার্ভিস কমিসনে অবসর লইবার বয়স হইতেছে ষাট। পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সহিত শাসনবিভাগের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইহার সদস্যগণ যাহাতে সরকারের অনুগ্রহভাজন হইবার জন্য চেষ্টা না করেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অবসর গ্রহণের পর আর কোন সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করা নিষেধ করা হইয়াছে। তবে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলরের মতন বে-সরকারি পদে নিযুক্ত হইতে পারেন।

কমিসনের নিযুক্তি ও সংগঠন

পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সদস্যদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হইয়াছে যে তাঁহাদের বেতন লইয়া সংসদে কোন ভোটাভুটি হইবে না। তাঁহাদিগকে সহজে অপসারিত করা যায় না। যদি তাঁহাদের কাহারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ শুনা যায় রাষ্ট্রপতি তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্টের নিকট উহার বিচারভার দিবেন। সুপ্রিম কোর্ট যদি প্রমাণ পায় যে অভিযোগ সত্য তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কোন সদস্য যদি দেউলিয়া হন কিংবা উপরি আয়ের আশায় অন্য কোন কাজ করিয়া বেতন লন তাহা হইলেও তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায়। এ পর্যন্ত কোন পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সদস্যের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই।

কমিসনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিসনের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইল পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন চাকুরির জন্য লোক নিয়োগের সুপারিশ করা। পরীক্ষা লিখিত ও মৌখিক উভয় প্রকারেরই হয়। সারা বছর ধরিয়াই কোন না কোন পরীক্ষা চলে। আই. এ. এস. প্রভৃতি যে সব

কর্তব্য

চাকুরির বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে সেগুলির জন্য সাধারণতঃ অক্টোবর মাসে পরীক্ষা হয়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য, সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য, সৈন্যবিভাগের ডাক্তারদের নিযুক্তির জন্যও পরীক্ষা লওয়া হয়। প্রতিরক্ষা বিভাগের অফিসার শ্রেণীর পদের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে (যথা The National Defence Academy, The Military, College, The Indian Air Force Flying College, The Commissioned Ranks of the Indian Navyর জন্য শিক্ষা) তাহাতে ভর্তি হইবার জন্য তরুণ ছাত্রদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা দিতে হয়। ঐ সব পরীক্ষারও পাবলিক সার্ভিস কমিসন ব্যবস্থা করেন। করণিক শ্রেণীর চাকুরির জন্য তিনটি পরীক্ষা লওয়া হয়—যথা, কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সহকারী (Assistants) পদের জন্য, লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কদের জন্য এবং স্টেনোগ্রাফারদের জন্য। ইহা ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের কেরানিদের টাইপিং জ্ঞানের পরীক্ষাও লওয়া হয়। সর্বসমেত ২৭টি পরীক্ষা প্রতি বৎসর লওয়া হয়। ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ঐসব পরীক্ষায় ৫৬, ৯৫৬ জন ব্যক্তি পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

পরীক্ষা গ্রহণ

যে সব পদের জন্য বৈজ্ঞানিক, শিল্পসংক্রান্ত বা অন্য কোন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় সেই সব ক্ষেত্রে প্রার্থীদের ডাকিয়া সাক্ষাৎকার করা হয়। পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সদস্যদেব সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ও মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞগণ বসিয়া প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচার করেন। এইভাবে ১৭৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ৯৫০০ প্রার্থীকে সাক্ষাৎকার করিয়া প্রায় ১৪০০ পদ পূর্ণ করা হইয়াছিল। কোন কোন উচ্চ পদে লোক নিযুক্ত করিবার সময় বর্তমান কর্মচারীদের মধ্য হইতে বাছিয়া প্রমোশন দেওয়া হয়। যে বিভাগে লোক লওয়া হইবে সেই বিভাগ হইতে প্রমোশন দিবার সুপারিশ করা হয় এবং সমস্ত প্রার্থীর দরখাস্ত এবং যোগ্যতার বিবরণ কমিসনের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কমিসন তাঁহাদের সুপারিশ গ্রহণ করিলে তবে ঐ সুপারিশ কার্যকরী হয়। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য যদি কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় বা প্রমোশন দেওয়া হয় তাহা হইলে কমিসনের সম্মতির প্রয়োজন হয় না। কোন কোন সময়ে কোন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ কাহাকেও নিযুক্ত করিতে চাহিলে তাঁহাকে প্রথমে প্রায় এক বৎসরের জন্য কাজ করিতে দেওয়া হয়; পরে কমিসনের নিকট যাইয়া

সাময়িক নিযুক্তি ও প্রমোশন

তাঁহারা খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া দাবি করিতে পারেন। এক বৎসরের বেশি কাল স্থায়ী সাময়িক পদে নিযুক্তির সময় কমিসনের অনুমতি প্রয়োজন হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কর্মচারীকে যদি কোন দণ্ড দিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের সমস্ত কাগজপত্র কমিসনের নিকট পাঠাইয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ কমিশনের সম্মতি ছাড়া কাহাকেও দণ্ডিত করা হয় না। সরকারী কাজ করিতে যাইয়া কেহ যদি কোন মামলায় জড়িত হন, তাহা হইলে তাঁহার মামলা সংক্রান্ত খরচা কতটা দেওয়া উচিত তাহা কমিসন বিবেচনা করে। সরকারী কাজ করিতে যাইয়া কেহ যদি আহত বা বিকলাঙ্গ হন তাহা হইলে তাঁহাকে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে তাহাও কমিসন কর্তৃক বিবেচিত হয়।

কর্মচারীকে দণ্ডদান বিষয়ে বিচার

মোটের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন অধিকাংশ পদই কমিসনের দ্বারা বা তাহাদের সম্মতিক্রমে পূর্ণ করা হয়। কি নীতিতে লোক নিযুক্ত করা হইবে, উন্নীত করা হইবে এবং স্থানান্তরিত (transfer) করা হইবে তাহাও কমিসন ঠিক করিয়া দেয়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের উচ্চ পদকে—যেমন রাষ্ট্রদূত কিংবা গোপন অথবা জরুরী কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি—সরকার কমিসনের এক্তিয়ারের বাহিরে রাখিতে পারেন; কিন্তু ঐ বিষয়ের নিয়মকানুন অন্ততঃ চৌদ্দদিন পূর্বে সংসদের উভয় সদনের নিকট উপস্থিত করিতে হয় এবং সংসদ উহার পরিবর্তন করিতে পারে। এই সব ব্যবস্থা হইতে বুঝা যায় যে ভারতবর্ষে আমেরিকার মতন Spoils system নাই। পাবলিক সার্ভিস কমিসনের ন্যায় নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের বিবেচনার ফলেই প্রায় সকল পদই পূর্ণ করা হয়। যোগ্যতার মাপকাঠিতেই সকলকে পরীক্ষা করা হয়, তবে তপশিলী জাতি ও জনজাতির লোকদের জন্য কিছু সংখ্যক পদ সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

কমিসনের এক্তিয়ারের বাহিরের পদ সংখ্যা কম

পাবলিক সার্ভিস কমিসন যে সুপারিশ করেন সরকার তাহা মানিতে বাধ্য। যদি কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা উহা অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সংসদের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়। ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ছয়টি, পরবর্তী দুই বৎসরে দুইটি করিয়া, ১৯৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে চারটি এবং তাহার পর বৎসরে মাত্র একটি ক্ষেত্রে কমিসনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। তাহার পর হইতে আর কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদের সুপারিশ

সুপারিশ অগ্রাহ্যের দৃষ্টান্ত বিরল

অগ্রাহ্য করা হয় নাই। তবে কোন কোন সময়ে কমিসনের সুপারিশ কার্যকরী করিতে অযথা বিলম্ব করা হইয়া থাকে।

আঞ্চিক রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিসন: ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ন্যায় প্রত্যেক আঞ্চিক রাজ্যের কর্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্য এক একটি পাবলিক সার্ভিস কমিসন আছে। রাজ্যের মধ্যে যেসব পদে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেডেন্টের মত অখিল ভারতীয় সার্ভিসের লোক নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের নিযুক্তি, দণ্ডদান প্রভৃতি ব্যাপারে অবশ্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিসনই সুপারিশ করে।

আঞ্চিক রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিসনের কার্য ও সংগঠন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিসনের অনুরূপ। তবে তাঁহাদের সদস্যসংখ্যা রাজ্যসরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। পাঞ্জাবে ছয়জন, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশে ৫ জন করিয়া, অন্ধ্র, বিহার ও কেরালে ৪ জন করিয়া, মধ্যপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশূর, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গে ৩ জন করিয়া এবং আসাম ও গুজরাতে দুইজন করিয়া সদস্য আছেন। আসামের একজন সদস্য নারী। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিসনেব সদস্যেরাও ছয় বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু ষাট বৎসর হইলে তাঁহাদিগকে অবসর লইতে হয়। তাঁহাদের বেতনের হারও ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সদস্যদের বেতনের অপেক্ষা কম।

স্থায়ী কর্মচারীদের চাকুরির স্থায়িত্ব: ব্যবসাবাণিজ্যে বা কোন বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলে সরকারী চাকুরি অপেক্ষা বেশি বেতন পাওয়া যায়। কিন্তু সরকারী চাকুরিতে স্থায়িত্ব বেশি, সম্মান ও প্রতিপত্তি বেশি এবং অবসর গ্রহণের পর পেন্সন পাওয়া যায় বলিয়া অনেকেই সরকারী পদ পাইবার জন্য লালায়িত হন। সরকারী চাকুরিতে যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা লোকে নিযুক্ত হন তাহা অপেক্ষা নিম্ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কেহ বরখাস্ত হইতে পারেন না।

কর্তৃপক্ষ যদি কাহাকেও চাকুরি হইতে বিতাড়িত করিতে চান বা তাঁহাকে নিম্নপদে বহাল করিতে চান তাহা হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাবলিক সার্ভিস কমিসনের পরামর্শ লইতে হয়। যদি কর্তৃপক্ষ কাহারও প্রতি মাত্র নিন্দাসূচক মন্তব্য পাস করেন, কিংবা বেতনবৃদ্ধি ও প্রমোশন বন্ধ করেন তাহা হইলে ঐ কর্মচারীকে জানাইতে হইবে যে কি দোষে তাঁহাকে

দণ্ডিত করা হইতেছে এবং তাঁহার কি বলিবার আছে তাহা শুনিতে হইবে। এই সব ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তি পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারেন এবং ঐরূপ স্থলে পাবলিক সার্ভিস কমিসনের মতামত লওয়া হয়।

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারীদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় না। তাহাতে জনস্বার্থের হানি হইতে পারে। যদি কেহ ফৌজদারি মামলায় গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হন তাহা হইলে তাঁহাকে বরখাস্ত করা চলে ও সেই ক্ষেত্রে তাঁহাকে আর আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে দেওয়া হয় না।

স্থায়ী কর্মচারীদের যোগ্যতা ও দুর্নীতি: অনেক সময় হাটে, বাজারে, এমন কি সংসদে ও রাজ্যের আইনসভায় স্থায়ী কর্মচারীদের যোগ্যতা ও সততার বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পূর্বেই ইংরাজ কর্মচারীরা অবসর লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল তাহা হইতে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হইল। শাসনব্যবস্থা চালাইবার গুরুভার পড়িল কেবলমাত্র ভারতীয় কর্মচারীদের উপর। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অভিজ্ঞতা ছিল সামান্য। এদিকে আবার সাম্প্রদায়িক গোলমালের জন্য অবস্থা আরও জটিল হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অসাধারণ শ্রম করিয়া ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, গত ১৫ বৎসর ভারতবর্ষের যে অভূতপূর্ব আর্থিক উন্নতি হইয়াছে তাহার অনেকখানি কৃতিত্ব স্থায়ী কর্মচারীদের প্রাপ্য।

তবে এক কলসী দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গোমূত্র পড়িলে যেমন সমস্ত দুধ নষ্ট হইয়া যায় তেমনি কর্মচারীদের মধ্যে দুইচারি জনের অসাধুতার দোষে সমস্ত কর্মচারীদের বদনাম হইয়াছে। একথা নিশ্চিত যে কেহ কেহ উৎকোচ লইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধরা পড়িয়াছেন তাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন। কিন্তু ধরা পড়েন নাই এমন লোকের সংখ্যাও কম নহে। পুলিশী শাসনব্যবস্থার সহসা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিবর্তিত করিতে যাইয়া কর্মচারীদের, সামনে প্রচুর প্রলোভন রাখা হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিদেশী মাল আমদানির লাইসেন্সের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত সাত বৎসর ধরিয়া ১৯৫৪-৫৫ হইতে ১৯৬১-৬২ পড়ে প্রতি বৎসর বে-সরকারী ক্ষেত্রে ৬১৭ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ঐ সব দ্রব্য যে দরে কেনা হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি দরে

বিক্রয় করা হয়। কোন কোন জিনিস তিন চার বা পাঁচগুণ দরেও বিক্রয় হয়। যেমন কৃত্রিম রেশমের সুতা এক কোটি টাকায় কিনিয়া তিন কোটি পনের লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হয়। গড়ে প্রত্যেকটি লাইসেন্সের জিনিসের উপর যদি শতকরা ৭৫ টাকা হিসাবে বেশি দাম ধরা হয় তাহা হইলে লাইসেন্স বিলি করার ফলে আমদানিকারীরা বৎসরে ৪৬ কোটি টাকা লাভ করেন বলিয়া শ্রীযুক্ত বি, আর, সাহা (Statesman ২৫।১০।৬২) মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহারা লাইসেন্স পাইবার আশায় উহার সিকি টাকা অনায়াসে উৎকোচ দিতে পারেন। ১১৫ কোটি টাকা উপরি আয় বাড়িবার প্রলোভন জয় করার মতন মনোবল কয়জন কর্মচারীর আছে? এ ছাড়া এক শ্রেণীর কর্মচারীদের হাতে কোটি কোটি টাকার ঠিকাদারী দিবার ভার আছে। ঠিকাদারেরা শতকরা ১৫ হইতে ৪০ ভাগ লাভ করেন। তাহার কিছুটা ঘুষ দিতে তাহাদের কোন কষ্ট হয় না। দেশের মুদ্রাস্ফীতি, বিদেশের বাজারের সহিত দেশের ভিতরকার দরের বিরাট পার্থক্য, পারমিট দিয়া জিনিস বিক্রয় প্রথা প্রভৃতি দূর করিতে না পারিলে প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারী সাধুতা অবলম্বন করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। সরকার অবশ্য কর্মচারীদের বিষয় সম্পত্তি ও ব্যাঙ্কের হিসাব প্রভৃতি কি আছে না আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং দুর্নীতিদমন বিভাগ নামে একটি সুদক্ষ বিভাগও খুলিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিদমন করা সম্ভব হয় নাই। দেশের লোক যদি ঘুষদানকারী ও গ্রহণকারীকে বয়কট করিতে প্রস্তুত হয় তবেই এ কার্যে সাফল্য লাভ করা যাইবে।

মন্ত্রীদের সহিত স্থায়ী কর্মচারীদের সম্বন্ধঃ এদেশে মন্ত্রিদের সহিত আই. সি. এস বা আই. এ. এস. শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীদের সম্বন্ধ সহজ ও স্বাভাবিক হইবার পক্ষে কতকগুলি বাধা ছিল। সাধারণতঃ মন্ত্রীরা নীতি নির্ধারণ করেন, কর্মচারীরা ঐ নীতিকে কার্যে পরিণত করেন। তাঁহাদের দোষত্রুটি মন্ত্রীরা বিচার করেন; প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। কিন্তু সংসদে কর্মচারীদের সকল দোষত্রুটির জন্য মন্ত্রীরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রেলের দুর্ঘটনার জন্য লালবাহাদুর শাস্ত্রী রেলপথের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং জীবনবীমা বিভাগের অবিমৃষ্যকারিতার দরুণ অর্থসচিব টি, টি, কৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন মন্ত্রী যদি সংসদে বলেন যে তাঁহার বিভাগের ত্রুটির জন্য

তিনি দায়ী নহেন, স্থায়ী কর্মচারীদের দোষে উহা ঘটিয়াছে তাহা হইলে তাঁহার উক্তিকে অ-বৈধানিক (unconstitutional) বলা যাইতে পারে।*

এখন যাঁহারা কেন্দ্রে বা বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রীত্বের গদি পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ আমলে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। ঐ যুগের আই. সি. এসরা তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের উপর কিছুটা আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক। ঐ সব কর্মচারীরা যখন তাঁহাদিগকে 'স্যার' 'স্যার' করিয়া বিনয়াবনত হইয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন তখন মন্ত্রী মহোদয়েরা বিপুল আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। তাঁহারা যে কত বড়, তাঁহাদের যে কত ক্ষমতা তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহারা খুব বেশি সচেষ্ট থাকিতেন। এদিকে আবার বিভাগীয় সেক্রেটারি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির গরিমায় গর্বিত ছিলেন। মন্ত্রীরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা কম লেখাপড়া জানেন বা কম বুদ্ধি ধরেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ক্লাবে, পার্টিতে বা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁহারা নানারূপ গল্প করিতেন। সেই সব কাহিনীর বিবরণ যখন মন্ত্রীদের কানে পৌঁছিত তখন তাঁহারা ঐ সব পদস্থ কর্মচারীদের উপর প্রীত হইতেন না।

যাঁহারা প্রবীণ ভারতীয় আই. সি. এস. ছিলেন তাঁহাদের অবসর গ্রহণের সময় যেমন যেমন উপস্থিত হইতে লাগিল তেমনি তেমনি বড় পদ খালি হইতে লাগিল। মন্ত্রীদের তোষামোদ করিতে পারিলে ঐ সব পদ পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া কোন কোন কর্মচারী মন্ত্রীদের সকল প্রকার প্রস্তাবে অত্যধিক উৎসাহের সহিত সায় দিতে লাগিলেন। ইহাতেও কম ক্ষতি হইল না। কর্মচারীদের কর্তব্য দণ্ড বা পুরস্কারের কথা বিবেচনা না করিয়া নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধিমত যথার্থ পরামর্শ দেওয়া। তাঁহারা সে কর্তব্য পালন না করিলে বিভ্রাট বাধে।

ভারতের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সংসাধনের জন্য মন্ত্রীরা যে নীতি ও কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা কার্যকরী করিবার জন্য কর্মচারীরা গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু কাজের পরিমাণের সীমা ছাড়াইয়া গেলে অকাজই বেশি হয়। এই সব বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সরকার ডাঃ আপেলবি নামক আমেরিকান বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সামর্থ্যের

বাহিরে অনেক বড় বড় কাজ করা হইয়াছে। যাঁহাদের শক্তির উপর সাফল্য নির্ভর করে এমন সব পদস্থ ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত অধিক সময় করিয়া খাটাইয়া লওয়া হইয়াছে; বড় বেশি সংখ্যক ব্যাপারের উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে বলা হইয়াছে এবং বিফলতা সত্ত্বেও কোনমতে কার্যসূচী পূরণ করিবার অত্যধিক জেদ ধরিয়া বড় রকম সাফল্য লাভ করা হইয়াছে। (Great achievements of recent years have been made beyond the capacity of the Indian administrative system. By working key personnel very excessive hours, by giving special attention to a very disproportionate number of transactions by stubborn persistence of programmetic officials in the face of frustration, great results have been achieved.)

মন্ত্রীরা যেখানে বিভিন্নস্থানে পরিদর্শন উপলক্ষ্যে ঘুরিয়া বেড়ান, বক্তৃতাদানে অধিকাংশ শক্তি ও সময় ব্যয় করেন সেখানে তাঁহারা ফাইল পড়িবার সময় পান না। এরূপক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে প্রায়ই ফাইলের উপর লিখিতে হয় "যেরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে আমি সম্মত আছি"। বলাবাহুল্য এরূপ ঘটিলে প্রকৃত ক্ষমতা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতেই যাইবে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এখন মন্ত্রীদের সহিত ঐ সব কর্মচারীদের বিরোধ আর বড় একটা

নবম অধ্যায়

আংশিক রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

রাজ্যপালের যোগ্যতা ও নিযুক্তি : ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সংবিধান রচনাপরিষদ প্রাদেশিক সংবিধান কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন করিয়া স্থির করেন যে রাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা রাজ্যপালকে নির্বাচন করা হইবে। ঐ সময়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছিলেন যে ঐ ভাবে নির্বাচিত রাজ্যপাল মন্ত্রীদের উপর এবং প্রদেশের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। ঐ সময় পর্যন্ত আমাদের নেতারা স্থির করিতে পারেন নাই যে ভারতের শাসনপ্রণালী সংসদীয় হইবে কি আমেরিকার মতন হইবে। তারপর যখন সিদ্ধান্ত করা হইল যে আমাদের দেশে সংসদীয় প্রণালীই অনুসরণ করা হইবে তখন অর্থাৎ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাজ্যপালকে নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা বদলাইয়া দেওয়া হইল। সংসদীয় ব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই যথার্থ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তাই শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সি উক্ত পরিষদে বলিলেন যে রাজ্যপালের মতন গৌণ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিতে এত পয়সা খরচ ও হাঙ্গামা করা বৃথা। রাজ্যপালকে যদি নির্বাচিত করা হয় তাহা হইলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দাবি করিতে পারেন, কারণ মুখ্যমন্ত্রী একটি মাত্র নির্বাচন কেন্দ্র হইতে নিযুক্ত হইয়াছেন, আর রাজ্যপাল সমগ্র রাজ্যের লোকের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হইলে রাজ্যপাল কেন্দ্রের অনুগত হইয়া চলিবেন এবং ভারতীয় সংহতিসাধনে তৎপর হইবেন। এই সব কারণে রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইল। রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্তি প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা নিযুক্তি।

রাজ্যপালকে নির্বাচন করিবার সিদ্ধান্ত কেন বদলানো হইল ?

রাজ্যপালের যোগ্যতা সম্বন্ধে শুধু বলা হইয়াছে যে তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং তাঁহার বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই। তিনি সংসদের বা রাজ্যের আইনসভার সদস্য হইতে পারিবেন না। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির খুসি অনুসারে (during his pleasure) উক্ত পদে বহাল থাকেন ; তবে সাধারণতঃ তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পাঁচবৎসর অতীত

রাজ্যপালের যোগ্যতা

হইলেও রাজ্যপালকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ চালাইতে বলা হইয়াছে। রাজ্যপাল মাসিক ৫৫৫০ টাকা বেতন ও নানাবিধ ভাতা পান এবং ব্রিটিশ আমলের সুবিস্তৃত লাটসাহেবের ভবনে বিনা ব্যয়ে বাস করিতে পান।

বেতনাদি

সংবিধানে উল্লিখিত না থাকিলেও প্রথা দাঁড়াইয়াছে যে রাজ্যপালকে কোন রাজ্যে নিযুক্ত করিবার পূর্বে সেই রাজ্যের কেবিনেট, বিশেষ করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি লওয়া হয়। ইহার ফলে মুখ্যমন্ত্রীর সহিত রাজ্যপালের বিরোধ বাধিবার আশঙ্কা কম হয়। কিন্তু যখন নির্বাচনের ফলে বা অন্য কোন কারণে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তন হয় তখন আর রাজ্যপালের সহিত নূতন মুখ্যমন্ত্রীর সদ্ভাব থাকিবেই একথা জোর করিয়া বলা যায় না। রাজ্যপালের বেতনাদি একত্রীকৃত কোষ হইতে দেয় (**charged on the Consolidated Fund**) এবং উহা লইয়া বিধানসভায় ভোটাভুটি হয় না।

সাধারণতঃ যে রাজ্যে রাজ্যপাল নিযুক্ত হন তিনি সেই রাজ্যের বাহিরের লোক হইয়া থাকেন। বাহিরের লোক কোন বিশেষ জোটবন্দীর প্রভাব হইতে

বাহিরের লোককে কেন রাজ্যপাল করা হয়?

মুক্ত ও নিরপেক্ষ হইবেন আশা করা যায়। মহীশূরে এবং জম্মু-কাশ্মীরে ঐ দুই রাজ্যের প্রাচীন রাজবংশের বংশধর যথাক্রমে রাজ্যপাল ও সদর-ই-রিয়াসৎপদে নিযুক্ত বা নির্বাচিত হইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গলার রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়াছিলেন।

রাজ্যপাল পদে এ পর্যন্ত যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই রাজনৈতিক দলভুক্ত, বিশেষ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের লোক। কেহ

কি ধরনের ব্যক্তি রাজ্যপাল হন?

অবসরপ্রাপ্ত বা অবসর গ্রহণোন্মুখ আই, সি, এস বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকও ছিলেন। এ পর্যন্ত তিন জন মহীয়সী মহিলাকেও রাজ্যপালের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক যাহাতে রাজ্যপালের পদ লাভ করেন সে দিকেও প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু যাঁহারা অসাধারণ কার্যদক্ষ তাঁহারা রাজ্যপাল হইতে চাহেন না; কেননা রাজ্যপালের ভোগ-ঐশ্বর্য প্রচুর থাকিলেও দেশের উন্নয়নমূলক কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ সামান্য। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে উত্তর প্রদেশের প্রথম রাজ্যপালরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে পদ গ্রহণ করেন

নাই। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে দেশের অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত কৈলাস নাথ কাটজু প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ও পরে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। সুতরাং ক্লান্ত ও বৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতাদের জন্য রাজ্যপালের পদ সৃষ্টি হইয়াছে এই মত ঠিক নহে। সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীদের মধ্য হইতে কখনো কখনো রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, শ্রীযুক্ত কে, সন্তানমকে বিন্ধ্যপ্রদেশের ছোট লাটরূপে, শ্রীযুক্ত ভি, ভি, গিরিকে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল, শ্রীযুক্ত পটাসকারকে মধ্যপ্রদেশের ও শ্রীযুক্ত এন ভি, গ্যাডগিলকে পাঞ্জাবের রাজ্যপালরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইঁহারা খুবই যোগ্য লোক সন্দেহ নাই। কিন্তু নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী রাজ্যপাল হইলে তাঁহাকে নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ছোট হইয়া থাকিতে হয়।

রাজ্যপালের কার্য ও ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতির নামে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কাজ করা হয় তেমনি আঙ্গিক রাজ্যের সব কাজ রাজ্যপালের নামে নির্বাহ করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রে ও আঙ্গিক রাজ্যে সংসদীয় শাসনবিধি প্রচলিত আছে বলিয়া রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও সংবৈধানিক শাসক (constitutional ruler)।

রাজ্যপাল সংবৈধানিক শাসক

সাধারণতঃ তিনি মন্ত্রীদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে সরকারী কাজ করিয়া থাকেন। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ না লইতেও পারেন। কিন্তু এরূপ অবস্থা স্বাভাবিক নহে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সুনীলকুমার বসু ও অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সেক্রেটারীর মামলায় কলিকাতার হাইকোর্ট রায় দেন যে রাজ্যপাল মন্ত্রীদের উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে আর, জে, কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় ঐ মত সমর্থন করিয়া সুপ্রিম কোর্ট বলেন যে, রাজ্যপাল শাসনবিভাগের নামেমাত্র প্রধান; কার্যতঃ তাঁহার অবস্থা ইংলণ্ডের রাজার মতন। এই মৌলিক তত্ত্ব মনে রাখিয়া আমরা প্রথমে রাজ্যপালের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা (Formal Powers) বর্ণনা করিব।

রাজ্যের শাসন সম্পর্কিত ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত আছে। উহা তিনি সরাসরিভাবে বা তাঁহার অধীন কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করেন। তিনি তাঁহার নামে যে সব আদেশ দেওয়া হয় তাহা প্রয়োগ করিবার জন্য নিয়ম করিতে পারেন এবং রাজ্যের কার্যাদি কিভাবে করিলে সুবিধাজনক হয় সে বিষয়ে নিয়ম

তৈয়ারি করিতে পারেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরামর্শ মতন অন্যান্য মন্ত্রীকেও নিযুক্ত করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে কাজ কিভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় সে সম্বন্ধেও তিনি নিয়ম তৈয়ারি করেন। মন্ত্রীরা রাজ্যপালের খুশিমত পদে বহাল থাকেন (hold office during his pleasure)। রাজ্যপাল রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল ও পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সদস্যদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু ঐ সদস্যদিগকে পদচ্যুত করিবার অধিকার তাঁহার নাই। রাষ্ট্রপতি যেমন সংসদের অঙ্গীভূত রাজ্যপালও সেইরূপ রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর একাংশ। রাষ্ট্রপতির মতন তিনিও বিধানমণ্ডলীর ভাষণ দিবার, বাণী প্রেরণ করিবার অধিকারী এবং তিনিউহার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, মুলতুবি রাখিতে পারেন ও ভাঙ্গিয়া দিতে (dissolve) পারেন। রাষ্ট্রপতির মতন তিনিও রাজ্যের বিধান মণ্ডলীর (Legislative) সামনে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ পেশ করিবার অনুমতি দেন এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন খরচা মঞ্জুরির প্রস্তাব বা অন্য কোন অর্থসংশ্লিষ্ট বিল উত্থাপন করা যায় না।

শাসন সম্পর্কিত ক্ষমতা

যখন কোন বিল রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর দ্বারা পাস হয় তখন উহাতে রাজ্যপালের সম্মতির প্রয়োজন হয়। তিনি উহাতে সম্মতি দিতে পারেন, অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্যান্য বিল তিনি বিধানমণ্ডলীর পুনর্বিবেচনার জন্যও পাঠাইতে পারেন, কিন্তু বিধানমণ্ডলী যদি উহা সংশোধিত আকারে অথবা যেমন আছে তেমনি ভাবে পুনরায় পাস করেন তাহা হইলে আর তিনি উহাতে স্বীকৃতি দিতে অসম্মত হইতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির মতন তিনিও বিধানমণ্ডলীর অবর্তমানে অর্ডিনান্স করিতে পারেন। উহা আইনের ন্যায় বলবৎ হইবে। অবশ্য কোন বিষয়ে অর্ডিনান্স করার জরুরি প্রয়োজন থাকিলে তবেই ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করেন। কোন বিষয় জরুরি কিনা তাহা তিনিই বিবেচনা করিবেন, অন্য কাহারও সে বিষয়ে প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই। বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর উহা তথায় উপস্থিত করিতে হইবে। যদি তাঁহারা উহাতে সম্মতি না দেন তাহা হইলে উহা নাকচ হইয়া যাইবে। তাঁহারা সম্মতি দিন বা না দিন অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পরে অর্ডিনান্সের আর কার্যকারিতা থাকিবে না। যে সব বিষয়ে রাজ্যের বিধান-

আইন সম্পর্কিত ক্ষমতা

মণ্ডলীর আইন করিবার এক্তিয়ার আছে সেইসব বিষয়েই রাজ্যপাল অর্ডিনান্স তৈয়ারি করিতে পারেন। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়ে অর্ডিনান্স করিতে হইলে তাঁহাকে রাষ্ট্রপতির আদেশ (instruction) পূর্ব হইতে লইতে হইবে—(ক) যাহার দ্বারা বাণিজ্যের অবাধগতি ব্যাহত হয়, (খ) যে সব কথা কোন বিলে থাকিলে তিনি সাধারণতঃ রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন সেই সব কথা যে অর্ডিনান্সে থাকিবে, (গ) কাহারও সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে সরকার কর্তৃক গ্রহণ বিষয়ক আইন বিষয়ে।

বিচার সম্পর্কীয় ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির মতন রাজ্যপালও দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ হ্রাস করিতে, স্থগিত করিতে কিংবা রহিত করিতে পারেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সহিত রাজ্যপালের ক্ষমতার কয়েকটি পার্থক্য আছে।

রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার তুলনা

রাষ্ট্রপতি বিদেশীয় রাজদূত প্রভৃতিকে দর্শন দেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কে আসেন; কিন্তু রাজ্যপালের সেরূপ কূটনৈতিক (Diplomatic) অধিকার নাই। রাষ্ট্রপতি স্থলসৈন্য, জলসৈন্য ও বিমানবাহিনীর অধিনায়ক, কিন্তু রাজ্যপাল সেরূপ নহেন। রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন, রাজ্যপাল তাহা পারেন না।

মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত রাজ্যপালের সম্বন্ধ: মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত রাজ্যপালের কিরূপ সম্বন্ধ হইবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে রাজ্যপালের ব্যক্তিত্বের উপর। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে দিল্লীতে রাজ্যপালগণের এক সম্মেলন হইয়াছিল।

রাজ্যপালের ব্যক্তিত্ব ও অধিকার

তাহাতে কয়েকজন রাজ্যপাল শুনিয়া বিস্মিত হন যে, সংবিধান অনুসারে তাঁহারা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশাসনিক নানাবিধ ব্যাপার সম্পর্কে খোঁজখবর জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এমন কি দরকার পড়িলে ফাইল চাহিয়া পাঠাইতে পারেন। উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল এইচ, পি, মোদি লিখিয়াছেন যে, তিনি শুধু ফাইলই চাহিয়া পাঠাইতেন না, সময় সময় বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারি ও বিভাগীয় অধ্যক্ষদিগকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। সে সময়ে গোবিন্দবল্লভ পন্থ মহাশয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজ্যপালের এরূপ কার্যে বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। ভি, পি, মেনন লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন উড়িষ্যার রাজ্যপাল ছিলেন সে সময়ে কখনো কখনো তাঁহাকে কেবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্যও আহ্বান করা হইত। অন্য কোথাও অবশ্য রাজ্যপাল কেবিনেটে উপস্থিত থাকেন না।

রাজ্যপাল সাধারণতঃ মন্ত্রিমণ্ডলীর সাহায্য ও পরামর্শ লইয়া শাসনকার্য চালান। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে তিনি নিজের বিবেচনা (discretion) অনুসারে কাজ করিতে পারেন। সংবিধানে রাজ্যপালের নিজের বিবেচনা অনুসারে কাজ করিবার কথা দুইবার মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। আসামের রাজ্যপাল আসামের সরকারের সহিত আসামের স্বশাসিত জনজাতির জেলা-পরিষদের খনির উপস্বত্ব লইয়া কোন বিরোধ দেখা দিলে তিনি নিজের বিবেচনায় (discretion) উহা মীমাংসা করিতে পারেন। জনজাতির অঞ্চল সম্পর্কে যে সকল বিশেষ প্রশাসনিক নিয়ম আছে তাহা কোন বিশেষ জনজাতির অঞ্চল সম্পর্কে প্রয়োগ করা হইবে কিনা তাহাও আসামের রাজ্যপালের বিবেচনাধীন রাখা হইয়াছে। এই দুইটি ক্ষেত্র ছাড়া রাজ্যপালের নিজস্ব বিবেচনার কথা অন্যত্র স্পষ্ট করিয়া বলা না হইলেও তিনি যে বিশেষ বিশেষ স্থলে মন্ত্রীদের বিনা পরামর্শে কাজ করিতে পারেন তাহা অনুমিত হয়।

রাজ্যপালের নিজস্ব বিবেচনা ক্ষমতা (Discretion)

প্রথমতঃ মুখ্যমন্ত্রীর নিযুক্তির সময় যদি বিধানসভায় কোন দলেরই সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে তাহা হইলে রাজ্যপাল নিজস্ব বিবেচনার দ্বারা চালিত হইয়া এমন ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী করিতে পারেন যিনি অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে কোন দলেরই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল না। সেই সময়ে মাদ্রাজের রাজ্যপাল ছিলেন শ্রী প্রকাশ। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন যে তখন শ্রীযুক্ত রাজাগোপালা-চারী মাদ্রাজের বিধানসভা বা বিধানপরিষদের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু রাজ্যপাল শুনিতে পান যে কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত রাজাজীকে মুখ্যমন্ত্রী করিতে চান। রাজ্যপাল নিজে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে বিধান পরিষদের সদস্যরূপে মনোনীত করেন ও মুখ্যমন্ত্রীর পদ প্রদান করেন। রাজ্যপাল ঐরূপ সুযোগ্য ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই মাদ্রাজের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে চলিয়াছিল এবং কংগ্রেসের মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছিল। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর কেরল ও উড়িষ্যাতে কোন দলই একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। সে সময়ে রাজ্যপালই নিজের বিবেচনা শক্তিবলে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাবকে

মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু এক বৎসর পরে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি গণতন্ত্রপরিষদের বিরোধিতার জন্য পদত্যাগপত্র পেশ করেন। রাজ্যপাল ঐ পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন নাই। তিনি গণতন্ত্রপরিষদের নেতার কাছে দাবি করেন যে তাঁহার সমর্থকদের নামের তালিকা পেশ করিয়া তিনি প্রমাণ করুন যে স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তিনি রাজ্যপালের নিকট ঐরূপ প্রমাণ দিতে পারেন নাই বলিয়া মহ্তাব-মন্ত্রিত্বই বজায় রহিল। রাজ্যপাল অসাধারণ দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ সম্ভব হইয়াছিল। কেহ কেহ অবশ্য রাজ্যপালকে কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর জন্য দায়ী করিয়াছিলেন।

সংবিধান অনুসারে রাজ্যপাল রাজ্যের প্রশাসনিক ও বিধানসম্বন্ধীয় ব্যবস্থার বিষয়ে তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং মুখ্যমন্ত্রী উহা দিতে বাধ্য। তিনি নিশ্চয়ই ঐ তথ্য চাহিবার পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবেন না যে উহা চাহিবেন কিনা। সুতরাং এ ব্যাপারও তাঁহার নিজের বিবেচনাধীন। কোন বিষয়ে কোন মন্ত্রী যদি তাঁহার একক সিদ্ধান্তের ফলে কিছু করিতে চাহেন তাহা হইলে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে বলিতে পারেন যে উহা সমগ্র কেবিনেটের বিবেচনার জন্য রাখা হউক। মন্ত্রীরাই অধিকাংশ বিল তৈয়ারি করিতে অগ্রণী হন; সামান্য যে দুই একটি বিল বে-সরকারী সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত হয় তাহাও মন্ত্রীদের সাহায্য না পাইলে পাস হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল যখন কোন বিল বিধানমণ্ডলীর পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত দেন কিংবা সরাসরি নাকচ করিয়া দেন তখন অবশ্যই তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শক্রমে উহা করেন না। মন্ত্রীরা নিজেদের প্রস্তাবিত বা সমর্থিত বিল নাকচ করিবার পরামর্শ কখনই রাজ্যপালকে দিবেন না। তবে ব্রিটিশ রাজার এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতার মতন রাজ্যপালের বিল ফেরত দিবার ও নাকচ করিবার ক্ষমতা এ পর্যন্ত কখনও ব্যবহৃত হয় নাই।

সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালের ক্ষমতা

কেরলের রাজ্যপাল কিন্তু নাম্বুদ্রিপাদ (কম্যুনিস্ট) মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রস্তাবিত শিক্ষাসংক্রান্ত বিল তথাকার আইনসভায় পাস হইবার পর উহাতে সম্মতি না দিয়া রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ লইয়া উহা নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। কেরলের রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার পরামর্শ না লইয়া নিজের বিবেচনাশক্তি বলে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে বিধানসভায়

কেরলের রাজ্যপালের কার্য

সদস্যপদে মনোনীত করিয়াছিলেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে সবচেয়ে বড় দলের নেতা যখন দাবি করেন যে তিনি বিধানসভার পাঁচজন নির্দলীয় সদস্যের সমর্থন পাইবেন, তখন রাজ্যপাল উহা মানিয়া লইতে রাজি হন নাই।

কোন রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলী যদি বিধানসভার আস্থাভাজন হন অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হন তাহা হইলে রাজ্যপাল তাঁহাদিগকে কোন কারণে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। সংবিধানে অবশ্য বিশেষ কোন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা রাজ্যপালকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু

মন্ত্রিমণ্ডলী বরখাস্ত করার ক্ষমতা

ক্ষমতা সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া অনেক পণ্ডিতের অভিমত। রাজ্যপালকে এমন মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করিতে হইবে যাহা বিধানসভার আস্থাভাজন। তিনি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠদলের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলী বরখাস্ত করিয়া দেন তাহা হইলে তখন তখনি তাঁহার পক্ষে বিকল্প মন্ত্রিমণ্ডলী পাওয়া কঠিন হইবে; পাইলেও তাহা বিধান সভার ভোটে টিকিবে না। কিন্তু কোন কোন সংবিধানজ্ঞ বলেন যে, কোন মন্ত্রিমণ্ডলী যদি সংবিধানের বিরুদ্ধে কিংবা ভারতের জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া রাজ্যপাল প্রমাণ পান তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিতে পারেন। কেননা রাজ্যপাল কার্যভার গ্রহণের সময় শপথ লইয়াছেন যে তিনি সংবিধানের সুরক্ষা করিবেন। সেইজন্য কোন মন্ত্রিমণ্ডলী যদি বিদেশী কোন শক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ভারতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে রাজ্যপাল তাঁহাদিগকে বিতাড়িত না করিলে তিনি শপথভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইবেন। এরূপ ঘটনা এখনও উপস্থিত হয় নাই। কোন মন্ত্রিমণ্ডলী যদি ঘুষ লইয়া বা অন্য কোন কারণে রাজ্যের মধ্যে দুর্নীতিদূষিত কার্য করেন, অথচ বিধানসভায় তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তাহা হইলে রাজ্যপাল তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিতে পারেন কি? কেহ কেহ মনে করেন যে, রাজ্যপালের ঐ ক্ষমতা আছে। কিন্তু রাজ্যপাল যদি ভ্রান্ত ধারণা বশে তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করেন তাহা হইলে গণতান্ত্রিক নীতি ক্ষুণ্ণ হইবে।

এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাঁহার এ ক্ষমতা আছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ লইবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া মনে হয়। কেননা প্রকাশম মন্ত্রিমণ্ডলী বিধানসভায় পরাজিত হইলে উহার

পরামর্শক্রমে অন্ধ্রের রাজ্যপাল বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়া ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের পিল্লাই মন্ত্রিমণ্ডলী যখন রাজ্যপালকে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন তখন রাজ্যপাল উহা গ্রহণ করেন নাই। এই দুইটি বিপরীত দৃষ্টান্ত হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ভারতে রাজ্যপাল বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্বন্ধে নিজের বিবেচনাশক্তি (discretion) ব্যবহার করিতে পারেন।

বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নব-নির্বাচন করিবার আদেশ দিবার ক্ষমতা

রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডল এমন কোন বিষয়ে রাজ্যপালকে অর্ডিনান্স জারি করিতে পরামর্শ দিতে পারেন যাহার ফলে তথাকার হাইকোর্টের ক্ষমতা বা এক্তিয়ার কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল অর্ডিনান্স জারি না করিয়া রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য উহা পাঠাইয়া দিতে পারেন। এ বিষয়ে রাজ্যপাল মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন না। রাষ্ট্রপতি যেরূপ উপদেশ দেন তিনি সেইরূপ কার্য করেন।

অর্ডিনান্স জারি করার ক্ষমতা

কোন রাজ্যের রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে সংবিধান অনুসারে সেখানে শাসন চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইলে তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ না লইয়া বা উহা অগ্রাহ্য বলিয়া রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতে পারেন। যখন সংবিধানে এই ধারাটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল তখন মনে করা গিয়াছিল যে কোন রাজ্যে অচল অবস্থা-সৃষ্টি বুঝি অত্যন্ত অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু গত ১২।১৩ বৎসরের মধ্যে ছয়বার রাষ্ট্রপতি এই ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন—১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে পেপসু (পাতিয়ালা ও পূর্বপাঞ্জাবের রাজ্যসংঘ), ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রদেশে, ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে এবং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কেরল রাজ্যে। শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের সামনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বীকার করেন যে, কেরলের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে এক বিস্তৃত রিপোর্ট দিয়া জানান যে, ঐ রাজ্যে কম্যুনিস্ট মন্ত্রিমণ্ডলী এমনভাবে শাসন চালাইতেছেন যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা সেখানে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লেখেন যে কম্যুনিস্টদলভুক্ত গুরুতর অপরাধের অভিযোগে দণ্ডিত অনেক ব্যক্তিকে

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দান

মুক্তি দেওয়া হইয়াছে; পুলিশকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের কর্তব্য কর্ম হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, যে সব কর্মচারী কম্যুনিস্ট ঘেঁষা তাঁহাদিগকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে; ছাত্রদিগকে কম্যুনিস্ট মতবাদ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সমবায় সমিতিগুলিকে কম্যুনিস্টদলের পুষ্টিবিধানের কাজে ব্যবহৃত করা হইতেছে। রাষ্ট্রপতি এই রিপোর্ট পাইয়া কেরলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। সে সময়ে রাজ্যপাল সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতির এজেন্ট হইয়া যান। কেন্দ্রীয় সরকারে একদল এবং কোন রাজ্যসরকারে অন্য দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হন তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ বাধা অসম্ভব নহে।

এইসব ব্যাপার হইতে দেখা যাইতেছে যে, রাজ্যপাল সাক্ষীগোপাল মাত্র নহেন। সংবিধান তাঁহার হাতে প্রচুর ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে। তিনি নিজের বিবেচনাবলে (discretion) অনেক ধরনের কাজ করিতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে একই দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় বহুরাজ্যে রাজ্যপাল তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তবে তিনি যদি কোন কার্য তাহার নিজের বিবেচনা বুদ্ধিতে করেন তাহা হইলে তিনি কেন ঐরূপ করিলেন সে কৈফিয়ৎ দাবি করিবার এক্তিয়ার কাহারও নাই—এমন কি কোন আদালতেও সে প্রশ্ন তোলা যায় না।

রাজ্যপালের সহিত মন্ত্রীদের সম্পর্ক কিরূপ তাহা জানা কঠিন। তবে দুই-চারি জন প্রাক্তন রাজ্যপাল তাঁহাদের স্মৃতিকথা প্রকাশ করায় কিছু কিছু তথ্য জানা যাইতেছে। বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল শ্রী আর. আর. দিবাকর লিখিয়াছেন যে

রাজ্যপাল ও মন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ

হাইকোর্টের জজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করার ব্যাপারে, দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে এবং কয়েকটি বিল লইয়া মন্ত্রীদের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। তপশিলী জাতি ও জনজাতির অবস্থা সম্বন্ধে এবং রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত সাধারণ অবস্থা বিষয়ে তাঁহাকে রাষ্ট্রপতির নিকট যে গোপন রিপোর্ট পাঠাইতে হয় তাহা লইয়াও কিছু মতানৈক্য হইয়াছিল (Indian Nation, ৭ই মে, ১৯৬২)।

আঙ্গিক রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলী: কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা আঙ্গিক রাজ্যের সরকারের দায়িত্ব ও কার্যের গুরুত্ব অনেক কম। তথাপি রাজ্যগুলিতে মন্ত্রীর সংখ্যা কম নহে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে ও বিহারে তিনজন করিয়া মন্ত্রী

ছিলেন। বর্তমান সংবিধানেও কিছু দিন উড়িষ্যায় তিনজন মাত্র মন্ত্রী সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করিতেন। অধ্যাপক সি. নর্থকোট পারকিন্‌সন বলেন যে, ব্রিটেনে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে যেমন পাঁচজনের মন্ত্রিমণ্ডলী ছিল এবং এক একজন যথাক্রমে অর্থ, প্রতিরক্ষা, আইন, পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক দেখিতেন এবং একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিতেন সেইরূপ করিলে শাসন কার্যে বিশেষ অসুবিধা হইবার কথা নহে। ভারতের আঙ্গিক রাজ্যের হাতে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ভার ন্যস্ত হয় নাই, সুতরাং সেখানে তিনজনের মন্ত্রিমণ্ডলী হয়তো অযৌক্তিক নহে। কিন্তু নানা কারণে এরূপ ছোট মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা কোথাও সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেস অধিকাংশ রাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বটে, কিন্তু দলের মধ্যে অনেকেই মন্ত্রিত্বের জন্য লালায়িত। উহা হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহারা জোট পাকাইয়া মন্ত্রীদের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিতে পারেন। কাজেই দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রিত্ব ও ছোটখাট নেতাদিগকে অন্ততঃ একটা উপমন্ত্রিত্ব দিয়া খুশি রাখিতে হয়। কাজ না থাকিলেও কাজ বা বিভাগ সৃষ্টি করিয়া মন্ত্রীদিগকে উহার ভার সমর্পণ করিতে হয়। সংবিধানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে এক জন মন্ত্রীর উপর বিশেষ করিয়া ঐ প্রদেশের জনজাতির, তপশিলী জাতির ও অনুন্নত শ্রেণীদের কল্যাণমূলক কার্যের ভার দিতে হইবে।

মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানো হয় কেন?

আঙ্গিক রাজের মন্ত্রিমণ্ডলীতে তিন শ্রেণীর মন্ত্রী থাকেন। কেবিনেটের সদস্য পর্যায়ের মন্ত্রী, কেবিনেটে বসিবার অধিকার নাই এমন মিনিস্টার অব স্টেট বা রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী। ইহাদের বেতন ও ভাতার কিছু পার্থক্য আছে। তবে সকলেই সরকারী নিবাসস্থল ও সরকারী খরচে মোটর গাড়ি পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ মন্ত্রীরা ১৫০০ টাকা মাসিক বেতন গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর যে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল তাহাতে ৩১ জন সদস্য ছিলেন এবং তাঁহাদের বেতন ও ভাতা বাবদ বছরে এগার লক্ষ টাকা খরচ বরাদ্দ ছিল। চীনের সহিত অঘোষিত যুদ্ধ বাধিবার পর দেশের মধ্যে দাবি উঠে যে এই জাতীয় সঙ্কটের সময় মন্ত্রীদের দরুণ ব্যয় বাহুল্য হ্রাস করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ব্যয় হ্রাস সর্বাংশে কর্তব্য; কিন্তু যেখানে মন্ত্রীর প্রয়োজন আছে সেখানে তাঁহাদের সংখ্যা কমাইয়া ব্যয়সঙ্কোচের তিনি পক্ষপাতী নহেন।

মন্ত্রী সংখ্যা হ্রাস করিবার দাবি

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের নববর্ষের দিনে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর সংখ্যা একেবারে একত্রিশ হইতে নয়জনে কমাইয়াছেন। তিনি অবশ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে এত কম মন্ত্রী লইয়া যদি কাজ চালানো অসুবিধা হয় তাহা হইলে তিনি মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়াইবেন। পাঞ্জাবের দেখাদেখি আরও দুই একটি রাজ্যে মন্ত্রীর সংখ্যা কমাইবার দাবি উঠিয়াছে।

আজকাল (১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে) বিভিন্ন রাজ্যে নিম্নলিখিত সংখ্যক মন্ত্রী আছেন :

রাজ্য	কেবিনেটমন্ত্রী	রাষ্ট্রমন্ত্রী	উপমন্ত্রী	মোট	গড়ে কত সংখ্যক অধিবাসীর প্রতি একজন মন্ত্রী
অন্ধ্র	১০	৬	×	১৬	২২, ৪২, ৩৭৪
আসাম	১০	২	৩	১৫	৭, ৯০, ৬৭০
বিহার	১০	৪	৮	২২	২১, ১১, ৬১৮
গুজরাত	৮	×	৮	১৬	১২, ৮৮, ৮৩০
জম্মু ও কাশ্মীর	১১	×	×	১১	৩, ২৫, ৭৮০
কেরল	১১	×	×	১১	১৫, ৩৪, ১০৯
মধ্যপ্রদেশ	১১	×	৪	১৫	২১, ৫৯, ৬২৫
মাদ্রাজ	৯	×	×	৯	৩৭, ৩৮, ৯৫০
মহারাষ্ট্র	১৭	×	১৪	৩১	১২, ৭৭, ৫৫৪
মহীশূর	৯	×	২	১১	২৬, ৪০, ৬৪৩
উড়িষ্যা	৭	×	×	৭	২৫, ০৬, ৩৭৭
পাঞ্জাব	৯	×	×	৯	২২, ৫৫, ৩৫০
রাজস্থান	৮	×	১০	১৮	১১, ১৯, ২৩১
উত্তর প্রদেশ	১৭	৪	১১	৩২	২৩, ০৪, ৭৭৮
পশ্চিমবঙ্গ	১৬	১১	১০	৩৭	৯, ৪৫, ০৭১

লোকসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে বেশি মন্ত্রী (উপমন্ত্রীসহ) আছেন জম্মু ও কাশ্মীর, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে এবং মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা সবচেয়ে কমসংখ্যক মন্ত্রী লইয়া কাজ চালাইতেছেন।

বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীতে নারীর সংখ্যা এইবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর যে সব মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল তাহাতে নারীদের মধ্যে

কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় একজন করিয়া মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গে একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজ্যে দশজন উপমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর নারীদের মধ্য হইতে পশ্চিমবঙ্গে দুইজন, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মহীশূর, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশ এক একজন করিয়া মন্ত্রী, অন্ধ্রদেশে একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজ্যে দশজন উপমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্রিটেনের গত শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীতে দুইজন নারী মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু এখন একজনও নাই।

নারী মন্ত্রীর সংখ্যা

আঙ্গিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর ক্ষমতা (Powers of State Legislatures) : প্রত্যেক আঙ্গিক রাজ্যে স্বতন্ত্র বিধানমণ্ডলী আছে। দশটি রাজ্যে বিধানমণ্ডলীর দুইটি সদন, বিধান সভা ও বিধানপরিষদ আছে। কিন্তু বাকী ছয়টি রাজ্যে মাত্র বিধানসভা আছে। রাজ্যতালিকায় ও যুগ্মতালিকায় যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সব বিষয়ে বিধানমণ্ডলী আইন করিতে অধিকারী। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আইন পেশ করিতে হইলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আগে হইতে লইতে হয়। যদি কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলী এমন কোন বিল উপস্থিত করিতে চাহেন যাহার দ্বারা জনস্বার্থের খাতিরে রাজ্যের ভিতরকার কিংবা অন্য রাজ্যের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বাধানিষেধ প্রযুক্ত হইব তাহা হইলে প্রথমে রাষ্ট্রপতির অনুমতি চাহিতে হইবে। তিনি যদি অনুমতি দেন তাহা হইলে ঐ বিল বিধানমণ্ডলীতে পেশ করা যাইবে। হাইকোর্টের এক্তিয়ার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন ধরনের আইনও পেশ করিতে হইলে ঐ ভাবে প্রথমে রাষ্ট্রপতির অনুমতি লওয়া প্রয়োজন।

বিধানমণ্ডলীর ক্ষমতার সীমা

অন্য এক ধরনের বিল আইনে পরিণত করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং তাঁহার অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত উহা কার্যকরী হইবে না। রাজ্যসরকার যদি কোন বিলের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার করিতে চাহেন তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনার জন্য বিলটি পাঠাইতে হয়। যুগ্মতালিকাভুক্ত (Concurrent list) কোন বিষয়ে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী যদি এমন কোন আইনের প্রস্তাব করেন যাহা পূর্বে সংসদের তৈয়ারি করা কোন আইনের প্রতিকূল হয় তাহা হইলেও উহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হয়।

রাষ্ট্রপতির পূর্বসম্মতি

রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে যদি রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয় সাময়িকভাবে সংসদের এক্তিয়ারে রাখা হউক বলা হয় তাহা হইলে ঐ সময়ের জন্য রাজ্যের বিধানমণ্ডলী উহার উপর কোন আইন করিতে পারিবেন না।

রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সাময়িকভাবে কেন্দ্রীয় বিষয়ভুক্ত হইবার নিয়ম

রাষ্ট্রপতি যখন কোন আঙ্গিক রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন চালানো অসম্ভব বলিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন তখন সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর সমগ্র ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত হইতে পারে। যখন রাষ্ট্রপতি দেশের বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন তখন সংসদ প্রয়োজন অনুযায়ী রাজ্যতালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন করিতে পারে। সে সময়ে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী বর্তমান থাকিতে পারে। কিন্তু রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন করিবার একচেটিয়া অধিকার আর তাঁহাদের থাকে না।

সাংবিধানিক প্রণালীতে শাসন চালানো অসম্ভব বলিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা

এই সব বাধানিষেধ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী তাহার নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। কিন্তু হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট কোন মোকদ্দমা বিচার করিবার সময় ঐ বিধানমণ্ডলীর দ্বারা তৈয়ারি আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে। সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য থাকিলে ঐ বিচারালয় বিশেষ কোন আইনকে অবৈধ বলিতে পারে।

আইনের বৈধতা বিষয়ে বিচারালয়ের ক্ষমতা

বিধানসভার সংগঠন: আঙ্গিক রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ রাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু কোন রাজ্যের রাজ্যপাল যদি দেখিতে পান যে তথাকার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সংখ্যা যথোপযুক্ত হয় নাই তাহা হইলে তিনি কয়েকজনকে প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করিতে পারিবেন। এইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও মহীশূর রাজ্যে এক একজন করিয়া ও পশ্চিমবঙ্গে চারজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে মনোনীত করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন নারীও আছেন।

সংবিধানে বলা হইয়াছে যে কোন রাজ্যের বিধান সভার সদস্য সংখ্যা পাঁচ-শতের অধিক এবং ষাটের কম হইবে না। সংসদ আইন করিয়া স্থির করিয়াছে যে বিভিন্ন রাজ্যে নিম্নলিখিত সংখ্যক সদস্য সরাসরি ভাবে নির্বাচিত হইবেন। মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই তপশিলী

অনুন্নত শ্রেণীর বিশেষ নির্বাচন

জাতি ও তপশিলী জনজাতির (Scheduled Tribes) জন্য কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষিত আছে।

রাজ্য	আসনসংখ্যা	তপশিলী জাতির জন্য সংরক্ষিত	তপশিলী জনজাতির জন্য সংরক্ষিত
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩০০	৪৩	১১
আসাম	১০৫	৫	২৩
বিহার	৩১৮	৪০	৩২
গুজরাত	১৫৪	১০	১৭
কেরল	১২৬	১১	১
মধ্যপ্রদেশ	২৮৮	৪৩	৫৪
মাদ্রাজ	২০৬	৩৭	১
মহারাষ্ট্র	২৬৪	৩৩	১৪
মহীশূর	২০৮	২৮	১
উড়িষ্যা	১৪০	২৫	২৯
পাঞ্জাব	১৫৪	৩৩	×
রাজস্থান	১৭৬	২৮	২০
উত্তরপ্রদেশ	৪৩০	৮৯	×
পশ্চিমবঙ্গ	২৫২	৪৫	১৫

জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভার কথা পরে স্বতন্ত্রভাবে বলা হইবে। মনোনীত সদস্যদের লইয়া পশ্চিমবঙ্গে ২৫৬ জন সদস্য আছেন। লোকসংখ্যার অনুপাতে সদস্যসংখ্যা স্থির করা হয়। মোটামুটি গড়ে প্রত্যেক আসনের জন্য ৭৫০০০ করিয়া ভোটার আছেন। বিধান সভার সদস্যকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। তিনি যদি অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হন বা তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে তিনি আর সদস্য থাকিবেন না। সদস্যের বয়স অন্ততঃপক্ষে পঁচিশ বৎসর হওয়া প্রয়োজন। তিনি যে রাজ্যের বিধানসভার জন্য দাঁড়াইবেন সেখানকার ভোটার হওয়া দরকার। যাঁহারা সরকারের অধীনে কোন লাভজনক কাজে রত আছেন তাঁহারা সদস্য হইতে পারেন না। তবে মন্ত্রীদিগকে এই পর্যায়ে ফেলা হয় না। কেহ যদি দেউলিয়া বা বিকৃতমস্তিষ্ক হন অথবা সংসদের কোন আইন অনুসারে

সদস্যদের যোগ্যতা

প্রার্থী হইবার অযোগ্য ঘোষিত হন তাহা হইলে তিনি নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারিবেন না। কোন ব্যক্তি একই কালে সংসদ ও বিধানসভার কিংবা ঐ রাজ্যের বিধানসভা ও বিধানপরিষদের অথবা বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সভ্য থাকিতে পারিবেন না। কোন নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে যদি তিনি একটি পদে ইস্তাফা না দেন তাহা হইলে তিনি সমস্ত সদস্যপদই হারাইবেন। যদি কেহ সদস্য নির্বাচিত হইবার পর একাদিক্রমে বিধানসভার বিনা অনুমতিতে ষাট দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলেও তিনি সদস্য পদ হইতে চ্যুত হন।

বেতন ও ভাতা

বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ বিভিন্ন হারে ভাতা ও বেতন পান। পশ্চিমবঙ্গে মাসিক দুইশত টাকা করিয়া দেওয়া হয়; বিহারে মাসিক আড়াইশত টাকা ও সরকারী বাসস্থান দেওয়া হয়।

কার্যকাল

বিধানসভা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। তবে রাজ্যপাল তাহার পূর্বেও উহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন করিয়া নির্বাচন করাইবার আদেশ দিতে পারেন। যদি পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়, তাহা হইলে নির্বাচন একবারে এক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিতে পারে। জরুরী অবস্থা শেষ হইবার ছয় মাসের মধ্যে নূতন নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

বিধানসভা নিজেদের সদস্যগণের মধ্যে একজনকে স্পীকার ও একজনকে ডেপুটি স্পাকার নিযুক্ত করেন।

এক সদনীয় বিধানমণ্ডলী

বিধানপরিষদের সংগঠন ঃ সকল রাজ্যে বিধান পরিষদ নাই। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানপরিষদ আছে। জম্মু ও কাশ্মীরেও উহা আছে। কিন্তু আসাম, গুজরাত, উড়িষ্যা, কেরল ও রাজস্থানে বিধানপরিষদ নাই। সংবিধানে লিখিত আছে যে, যে রাজ্যে বিধানপরিষদ নাই সেখানকার বিধানসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সেখানে বিধানপরিষদ স্থাপনার প্রস্তাব পাস করেন তাহা হইলে সংসদ আইন করিয়া সেখানকার জন্য বিধানপরিষদ স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এইরূপ ভাবে বিধানপরিষদ স্থাপন প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের সংশোধন হইলেও সংবিধানে উহাকে ঐরূপ গণ্য করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশে প্রথমে বিধান-পরিষদ ছিল না; কিন্তু পরে উহা এইরূপ প্রণালীতে সৃষ্ট হইয়াছে।

বিধানপরিষদের সদস্যগণের মধ্যে মোটামুটি ⅚ ভাগ অপ্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত

হন এবং এক-ষষ্ঠাংশ রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন। মোটামুটি হিসাবে মোট সদস্যসংখ্যার (১) এক-তৃতীয়াংশ মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গের লোকাল বোর্ড ও ছাউনি বোর্ড (Cantonment Boards) ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। বিহারে, মধ্য প্রদেশে, উত্তর প্রদেশে ও পাঞ্জাবে Notified Area কমিটিও নির্বাচনে যোগ দেয়। মাদ্রাজে প্রথম শ্রেণীর পঞ্চায়েতও ভোট দিতে পারে। (২) সদস্য সংখ্যার এক-দ্বাদশাংশ সদস্য তিন বৎসর বা তাহার বেশি আগে যাঁহারা স্নাতক হইয়াছেন তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত হন। (৩) অন্য এক-দ্বাদশাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Secondary Schools) ও তাহার চেয়ে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমন শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হন যাঁহারা অন্ততঃ তিন বৎসর ধরিয়া শিক্ষকের কাজ করিয়াছেন। বিধানসভার সদস্যগণ তাঁহাদের সভার সদস্য নহেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচন করেন। এই নির্বাচন এক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে হয় বলিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিছু কিছু সদস্য নির্বাচন করিবার সুযোগ পান। বাকী এক-ষষ্ঠাংশকে রাজ্যপাল মনোনীত করেন। এইরূপ মনোনীত ব্যক্তিরা সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান, সমবায় আন্দোলন ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হইবেন। নীচে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা দেওয়া হইতেছে—

বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যদের নির্বাচন

মনোনীত সদস্য

রাজ্য	স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান হইতে নির্বাচিত	স্নাতকদের দ্বারা নির্বাচিত	শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত	বিধানসভার দ্বারা নির্বাচিত	মনোনীত সদস্য	মোট সংখ্যা
অন্ধ্র প্রদেশ	৩১	৮	৮	৩১	১২	৯০
বিহার	৩৪	৮	৮	৩৪	১২	৯৬
মধ্যপ্রদেশ	৩১	৮	৮	৩১	১২	৯০
মাদ্রাজ	২১	৬	৬	২১	৯	৬৩
মহারাষ্ট্র	২২	৭	৭	৩০	১২	৭৮
মহীশূর	২১	৬	৬	২১	৯	৬৩
পাঞ্জাব	১৭	৪	৪	১৮	৮	৫১
উত্তরপ্রদেশ	৩৯	৯	৯	৩৯	১২	১০৮
পশ্চিমবঙ্গ	২৭	৬	৬	২৭	৯	৭৫
জম্মু ও কাশ্মীর	২১	৭	×	২	৬	৩৬

বিধানপরিষদের সদস্য হইবার যোগ্যতা হইতেছে ভারতীয় নাগরিকত্ব, অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়স এবং রাজ্যের বিধান সভার ভোটার তালিকাভুক্ত থাকা। যাঁহারা মনোনীত হইবেন তাঁহাদের সচরাচর সেই রাজ্যের বাসিন্দা হওয়া দরকার।

সদস্যের যোগ্যতা

বিধানপরিষদের প্রত্যেক সদস্য ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত হন বটে, কিন্তু পরিষদের সকল সদস্য এককালে কখনও নূতন হইবার আশঙ্কা নাই। কেননা সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের পালাক্রমে কার্যকাল শেষ হয় এবং দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য পুরাতন হন। এইভাবে বিধানপরিষদ চিরস্থায়ী।

কার্যকাল

বিধানপরিষদের সদস্যগণ নিজেদের ভিতর হইতে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন।

বিধানমণ্ডলীতে বিধানপরিষদের স্থান বা উভয় সদনের মধ্যে সম্বন্ধ (Place of Legislative Council in the State Legislature or the relation between the two Houses).

বিধানসভার তুলনায় বিধানপরিষদের মর্যাদা ও ক্ষমতা অনেক কম। বিধান-পরিষদ মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। মন্ত্রিমণ্ডলী সমবেতভাবে কেবলমাত্র বিধানসভার নিকট তাঁহাদের কার্যের জবাবদিহি করিতে বাধ্য (১৬৪।২ ধারা)।

মন্ত্রীদের উপর ক্ষমতা

অর্থ সম্পর্কিত বিল কেবলমাত্র বিধানসভাতেই উত্থাপিত করা যায়। বিধান সভায় উহা পাস হইবার পর বিধান পরিষদে পাঠানো হয় বটে, কিন্তু বিধানপরিষদ কেবলমাত্র সংশোধন বিষয়ক প্রস্তাব করিতে পারে; উহা গ্রহণ করা না করা বিধানসভার মর্জির উপর নির্ভর করে। বিধানপরিষদ যদি অর্থসংক্রান্ত বিল পাইবার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে উহা বিধান পরিষদের সম্মতি লাভ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এই ধরনের বিলে সংসদের লোকসভার সহিত রাজ্যসভারও এইরূপ সম্বন্ধ।

অর্থ সম্পর্কিত বিলের উপর ক্ষমতা

কিন্তু সাধারণ আইনসংক্রান্ত বিলে লোকসভার সহিত রাজ্যসভার সমান অধিকার। সংসদে উভয় সদনের মধ্যে মতভেদ হইলে তাঁহাদের যৌথ অধিবেশন ডাকা হয়। আঞ্চিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। এখানে

সাধারণ বিল পাস করার ব্যাপারেও বিধানপরিষদ বিধানসভার মত শেষ পর্যন্ত মানিতে বাধ্য। এইরূপ একটি বিল যখন বিধানসভায় পাস হইবার পর বিধানপরিষদের নিকট যায়, তখন পরিষদ (১) উহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন বা (২) উহার সংশোধন করিতে পারেন বা (৩) চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারেন। যদি তিন মাসের মধ্যে তাঁহারা মতামত প্রকাশ না করেন তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া হয় যে তাঁহারা উহাতে সম্মত নহেন অথবা (৪) তাঁহারা বিধানসভা যে আকারে উহা পাস করিয়াছেন সেই আকারেই উহা পাস করিতে পারেন। শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে কোন গোলমালই ওঠে না। কিন্তু প্রথমোক্ত তিনটি পন্থার যে কোনটি যদি তাঁহারা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে বিধানসভা পুনরায় ঐ বিল লইয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বিধানপরিষদের প্রস্তাবিত সংশোধন মানিয়া লইতেও পারেন, নাও পারেন। যদি মানিয়া না লইয়াই তাঁহারা বিলটি পুনরায় পাস করিয়া বিধান-পরিষদের নিকটে পাঠান, তাহা হইলে বিধানপরিষদ পুনরায় উহা গ্রহণ করিতে, অগ্রাহ্য করিতে বা সংশোধন করিতে পারেন। তাঁহাদের মতামত প্রকাশের জন্য এইবারে মাত্র একমাস সময় দেওয়া হয়। এবারে ঐ বিল ফিরিয়া আসিলে বিধানসভা যদি উহা পাস করেন তবে বিধানপরিষদের আপত্তি সত্ত্বেও উহা আইনে পরিণত হয়।

সাধারণ বিল সম্বন্ধেও সাবদ্ধ ক্ষমতা

এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে বিধানপরিষদের ক্ষমতা হাউস অব লর্ডসের চেয়েও কম। সাধারণ বিলে যদি লর্ডসভা কমন্সসভার প্রস্তাবে সম্মত না হয় তাহা হইলে ঐ বিলটি কমন্স সভায় একের পর এক দুইটি অধিবেশনে (Sessions) পাস হওয়া দরকার এবং অন্ততঃ একবৎসর অতীত হওয়া প্রয়োজন। লর্ডসভা যেখানে কোন বিল এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে পারে, আমাদের দেশের বিধানপরিষদ প্রথম বারে তিন মাস ও দ্বিতীয় বারে একমাস একুনে চারমাস মাত্র উহা স্থগিত রাখিতে পারে। ভারতবর্ষে বিধানসভার একই অধিবেশনে বিলটি দুইবার পাস করানো যাইতে পারে। তাহার পর আর বিধানপরিষদ ঐ বিলকে আইনে পরিণত করা রোধ করিতে পারে না।

হাউস অব্ লর্ডসের চেয়ে বিধান পরিষদের ক্ষমতা কম

বিধানপরিষদ বজায় রাখার যৌক্তিকতা : বিধানপরিষদ জনসাধারণের দ্বারা সরাসরি ভাবে নির্বাচিত হয় না। ইহাতে অপ্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত

ও মনোনীত সদস্য থাকেন। তাই ইহার হাতে অত্যন্ত অল্প ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। যাঁহারা বিধানপরিষদ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে, মাত্র চার মাস কাল যে প্রতিষ্ঠান কোন বিলকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে সে প্রতিষ্ঠান রাখিবার প্রয়োজন কি? যদি কোন বিলে জনসাধারণের ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে লোকে কাগজে-পত্রে বা সভাসমিতিতে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে পারেন। জনমতের গতি বুঝিয়া রাজ্যপাল ঐ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য বিধানসভার নিকট পাঠাইতে পারেন। ইহাদের বক্তব্য এই যে, রাজ্যপালের দ্বারাই যখন কোন বিলের ফলাফল বিবেচনার ব্যবস্থা রহিয়াছে তখন আবার শুধু শুধু বিধানমণ্ডলীর একটি দ্বিতীয় সদন রাখিবার প্রয়োজনীয়তা কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, রাজ্যপালের একার বিবেচনা অপেক্ষা পরিষদের সদস্যদের সমবেত মতামত অধিক মূল্যবান। সকল রাজ্যপাল তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে সমান সজাগ নহেন। বিধানপরিষদ রাখার বিরোধীরা বলেন যে, জ্ঞানীগুণী লোক ঐরূপ কম ক্ষমতাযুক্ত সদনের সদস্য হইতে চাহেন না। যখন উহার জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া কঠিন হয় তখন দরিদ্র দেশের অর্থ অনর্থক অপব্যয় করিয়া উহা রাখিবার প্রয়োজন কি? এই দুই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে অনেক ধীর বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গোলমাল ও হাঙ্গামা পোহাইতে চাহেন না, অথচ তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি দেশের আইন তৈয়ারির কাজে বা শাসন ব্যাপারে লাগাইতে চাহেন। এরূপ ব্যক্তিরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রভাবে বিধানসভা কর্তৃক সহজেই বিধানপরিষদে নির্বাচিত হইতে পারেন অথবা রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইতে পারেন। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, অনেক সময়ে বিধানপরিষদের আইনজ্ঞ ও সুপণ্ডিত সদস্যেরা কোন কোন বিলের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছেন এবং বিধানসভা তাঁহাদের প্রস্তাবিত সংশোধন মানিয়া লইয়াছেন।

বিধানপরিষদের বিরুদ্ধে যুক্তি

উত্তর—
জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সাহায্য পাওয়া যায়

মুখ্যমন্ত্রী দুই-একজন বিজ্ঞব্যক্তিকে বিধানপরিষদে নির্বাচিত বা মনোনীত করাইয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্রিমণ্ডলীতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের দুইজন বিশিষ্ট মন্ত্রী বিধানপরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিধান-

পরিষদের অস্তিত্ব না থাকিলে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী মাদ্রাজের ও শ্রীযুক্ত মোরারজি দেশাই বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী হইতে পারিতেন না।

যাঁহারা মন্ত্রী হন না এমন অনেক সদস্য প্রশ্ন তুলিয়া ও বিতর্ক করিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সরকারের ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দ্বিতীয় সদন বজায় রাখিবার সবচেয়ে বড় কারণ হইতেছে রাজনৈতিক। নির্বাচনের সময়ে নেতৃবৃন্দ অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট হইতে নানারকম সাহায্য লইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য দ্বিতীয় সদনের সদস্যগিরির কিছু অংশ (অর্থাৎ বিধানসভা হইতে নির্বাচিত এবং মনোনীত সদস্যের পদ) দেওয়া হইয়া থাকে। বিধানপরিষদ উঠাইয়া দিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইবে।

বিধানপরিষদের উপযোগিতা

কিন্তু এত সুবিধা সত্ত্বেও কোন সময় বিধানসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দাবি করিলে সংসদ বিধানপরিষদ রহিত করিতে পারেন। ইহার জন্য আর বিশেষ কিছুই করণীয় থাকে না। কিন্তু একবার যেখানে বিধানপরিষদ কায়েম করা হইয়াছে সেখানে আর উহা উঠাইয়া দিবার কোন দাবি এ পর্যন্ত তোলা হয় নাই। বরং অন্ধ্র প্রদেশের মতন যেখানে আগে বিধানপরিষদ ছিল না সেখানে উহা স্থাপন করা হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রাক্তন বোম্বাই প্রদেশকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইলে মহারাষ্ট্রবাসীরা বিধানপরিষদ চাহিলেন কিন্তু ব্যবসায়ে সুনিপুণ গুজরাতীরা উহা স্থাপন করিয়া ব্যয় বৃদ্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

বিধানপরিষদ লোপ করিবার পদ্ধতি

বিলকে আইনে পরিণত করার পদ্ধতি : বিল দুই প্রকারের। কতকগুলির সহিত আর্থিক ব্যাপারের সংস্রব আছে—সেগুলিকে Money Bill বলে। অন্য বিলগুলির সহিত আর্থিক ব্যাপারের কোন সংস্রব নাই। কোন্ ব্যাপারটি অর্থসংক্রান্ত এবং কোন্ ব্যাপার নহে, তাহা স্থির করিবার ভার বিধানসভার স্পীকার মহোদয়ের উপর। আর্থিক বিল পাস করার প্রণালী কেন্দ্রীয় সংসদের প্রণালীর অনুরূপ।

আর্থিক বিল

রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া কোন আর্থিক বিল বিধানমণ্ডলীতে পেশ হইতে পারে না। অর্থাৎ অর্থ সংক্রান্ত বিল প্রস্তাব করিবার ভার একমাত্র মন্ত্রীদের উপর। সাধারণ সদস্যরা কোন খরচ-খরচা কমাইবার বা রহিত করিবার প্রস্তাব করিতে পারেন কিন্তু উহা কমাইবার

সাধারণ সদস্যদের এক্তিয়ারের সীমা

প্রস্তাব করিবার এক্তিয়ার তাঁহাদের নাই। কর স্থাপনের প্রস্তাবও মন্ত্রীরাই আনিতে পারেন, সদস্যরা উহার বিরোধিতা করিতে পারেন মাত্র।

অর্থসম্বন্ধীয় কোন বিল বিধানপরিষদে প্রথমে উত্থাপন করা যায় না। বিধানপরিষদ ঐরূপ বিল বিধানসভার নিকট হইতে পাইলে ১৪ দিনের মধ্যে উহা তাঁহাদের সংশোধনী প্রস্তাব মত পাঠাইয়া দিতে বাধ্য। তাঁহারা যদি ১৪ দিনের মধ্যে না পাঠান তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া হয় যে উহাতে তাঁহাদের মত আছে। তাঁহাদের সংশোধনী প্রস্তাব বিধানসভা ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পারেন বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

বিধানপরিষদের ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ

প্রত্যেক বৎসরের সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থসচিব রাজ্যের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে একটি বিবরণ বা বাজেট পেশ করেন। উহাতে ব্যয়ের তালিকা দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখানো হয়। কতকগুলি ব্যয় একত্রীকৃত কোষ হইত দেয় (charged upon the consolidated fund) বলা হয়। উহার মধ্যে ধরা হয় (ক) রাজ্য পালের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি (খ) বিধান সভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা এবং যেখানে দ্বিতীয় সদন আছে সেখানে তথাকার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের বেতন ও ভাতা (গ) দেয় ঋণ সম্বন্ধীয় সুদ ইত্যাদি (ঘ) হাইকোর্টের বিচারকদের ও পাবলিক সার্ভিস কমিসনের সদস্যদের বেতন ও ভাতা (ঙ) কোন আদালতের বিচারে সরকারের দ্বারা দেয় বলিয়া যে টাকা দাবি করা হয় (চ) অথবা অন্য কোন খরচ যাহা বিধানমণ্ডলী এই পর্যায়ে ফেলিতে চায়। এই সব খরচ লইয়া বিধানমণ্ডলীতে আলোচনা চলিতে পারে কিন্তু ভোটাভুটি হইবে না। অন্যান্য সমস্ত খরচে আলোচনা ও ভোট লওয়া বিষয়ে কোন বাধানিষেধ নাই।

একত্রীকৃত কোষ হইতে দেয় অর্থের তালিকা

খরচা মঞ্জুরী হইবার পর সরকার একটি Appropriation Bill পেশ করে। যে সব খরচা পূর্বেই পাস হইয়াছে তাহা একত্রীকৃত কোষ হইতে দিবার জন্য উহাতে অনুমোদন করা হয়। উহার উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনা চলে না। সুতরাং এইটি পাস করা একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র।

সাধারণ বিল প্রথমে বিধানসভায় বা বিধানপরিষদে উপস্থিত করা যায়। প্রত্যেক সদনে সংসদীয় বিল পাসের পদ্ধতি অনুসারে উহার আলোচনা ও বিচার হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমে বিলটি উত্থাপন করা হয় এবং উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। তারপর একটি

সাধারণ বিল পাস করাইবার পদ্ধতি

নির্দিষ্ট দিনে উহার মূল নীতি লইয়া বিতর্ক করা হয়। তারপর ঐ বিলটি যদি গৃহীত হয় তাহা হইলে Select Committee তে দেওয়া যাইতে পারে বা জনমত সংগ্রহের জন্য উহা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার আদেশ দেওয়া যাইতে পারে। শেষোক্ত প্রণালী সাধারণতঃ মন্ত্রীরাও পছন্দ করেন না, কেননা তাহাতে অনর্থক দেরী হয়। Select Committee হইতে বিলটি সংশোধিত হইয়া আসিলে উহা লইয়া প্রত্যেক ধারা অনুসারে (clause by clause) আলোচনা হয়। ইহার পর শেষ পাঠের সময় কেবল মাত্র শাব্দিক পরিবর্তন প্রস্তাব করা যাইতে পারে কিন্তু উহার ফলে বিলের উদ্দেশ্য বা অর্থ কিছুর যেন পরিবর্তন না ঘটে।

বিধানসভায় পাস হইবার পর যদি বিধানপরিষদে কোন সাধারণ বিল যায় তাহা হইলে বিধানপরিষদ উহাতে সংশোধন আনিতে পারেন বটে কিন্তু সেই সংশোধন বিধানসভা নাও মানিয়া লইতে পারেন। তাঁহারা পুনরায় ঐ বিল অপরিবর্তিত আকারে পাস করিয়া বিধানপরিষদের নিকট প্রেরণ করেন। বিধানপরিষদ এক মাসের মধ্যে যদি উহাতে সম্মত না হন তাহা হইলে তাঁহাদের আপত্তি সত্ত্বেও উহা পাস হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। প্রথমবারে যখন বিলটি পাঠানো হয় তখন তিন মাসের মধ্যে বিধানপরিষদ মতামত প্রকাশ করিতে বাধ্য। আর দ্বিতীয় বারে একমাসের মধ্যে উহা দিতে বাধ্য। এইভাবে বিধানপরিষদ কোন বিলকে মাত্র চার মাসের জন্য ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন।

বিধানপরিষদের বাধা দিবার ক্ষমতা কতটুকু

উভয় সদন হইতে পাস হইবার পর বিলটি রাজ্যপালের নিকট পাঠানো হয়। রাজ্যপাল (ক) উহাতে সম্মতি দিতে পারেন (খ) সম্মতি না দিতে পারেন (গ) উহা পুনর্বিবেচনার জন্য বিধানমণ্ডলীর নিকট পাঠাইতে পারেন অথবা (ঘ) রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখিতে পারেন। হাইকোর্টের এক্তিয়ার কোন প্রকারে হ্রাস করিবার কোন প্রস্তাবমূলক বিল পাস হইলে রাজ্যপাল ঐ ভাবে উহা সংরক্ষিত করিতে বাধ্য। রাজ্যপাল অর্থসংক্রান্ত বিল পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত দিতে পারেন না, কিন্তু গ্রহণ করিতে অথবা উহাতে অসম্মতি জানাইতে পারেন। তাঁহার নিজের সুপারিশেই যে বিল উত্থাপিত হইয়াছে তাহাও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে কেন দেওয়া হইল বুঝা যায় না। এ পর্যন্ত কোথাও কোন রাজ্যপাল অর্থসংক্রান্ত বিলে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। সাধারণ বিল একবার যদি রাজ্যপাল বিধান

রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির সম্মতি

মণ্ডলীতে ফেরত পাঠান এবং উহা যদি পুনরায় বিধানমণ্ডলী কর্তৃক পাস হয় তাহা হইলে উহা মানিয়া লইতে রাজ্যপাল বাধ্য।

রাজ্যপাল যেসব বিল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখেন সে বিলে তিনি সম্মতি দিতে পারেন, অসম্মতি দিতে পারেন অথবা রাজ্যপালকে বলিতে পারেন যে উহা পুনরায় বিবেচনার জন্য বিধানমণ্ডলীতে প্রেরণ করা হোক। এরূপ ক্ষেত্রে বিধানমণ্ডলী ঐ বিল ছয়মাসের জন্য পুনর্বিবেচনা করিয়া রাজ্যপালের নিকট পাঠান, রাজ্যপাল পুনরায় উহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতি কিন্তু এবারও উহাতে অসম্মতি দিতে পারেন। রাজ্যপালের ন্যায় তিনি দ্বিতীয় বারে পাস করা বিল মানিতে বাধ্য নহেন। রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই না দিয়া চুপচাপ বসিয়াও থাকিতে পারেন। অনির্দিষ্ট কালের জন্য এরূপ করিলে বিলটি কার্যতঃ নাকচ হইয়াই যায়।

বিল অগ্রাহ্য করা বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অধিকার রাজ্যপাল অপেক্ষা অধিক

আঙ্গিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর কার্যপদ্ধতি ঃ আঙ্গিক রাজ্যের বিধান-মণ্ডলীর কার্যপদ্ধতি অনেকটা সংসদীয় কার্যপদ্ধতির অনুরূপ। এখানেও শতকরা দশজনের উপস্থিতি না থাকিলে কোন কার্য অনুষ্ঠিত হইতে পারেনা। এই ন্যূনতম সংখ্যাকে কোরাম বলে। কিন্তু বিধানপরিষদের বেলায় বলা হইয়াছে যে শতকরা দশজন অথবা সর্বসাকুল্যে দশজনের উপস্থিত থাকা দরকার—যেটি বেশি হইবে সেইটিই ধরিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পরিষদে সর্ব-সাকুল্যে ৭৫ জন সদস্য আছেন কিন্তু সেখানে ৭ বা ৮ জন সদস্য থাকিলে কার্য চলিবে না। অন্ততঃ দশজন উপস্থিত থাকা দরকার।

কোরাম্

স্পীকারের উপর যদি কোন সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব তুলিতে চান তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, আসামে এক-চতুর্থাংশ এবং উত্তর প্রদেশে এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের প্রাথমিক সমর্থন প্রয়োজন হয়। ঐরূপ সমর্থন পাইবার পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা উহা সমর্থিত হইলে স্পীকারকে পদচ্যুত করা হয়।

স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

স্পীকার সর্বজনমান্য ব্যক্তি। প্রত্যেক সদস্যের তাঁহার নিরপেক্ষতার প্রতি আস্থা থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ স্পীকারের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব উঠে না। তবে উড়িষ্যায় ১৯৫৪ সালে ১০ই এপ্রিল একবার ঐরূপ প্রস্তাব আনা

হইয়াছিল। কিন্তু উহা মাত্র ৪৮ জন সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল এবং ৬৯ জন সদস্য উহার বিরোধিতা করায় ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

উড়িষ্যার দৃষ্টান্ত

আঞ্চিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতেও মন্ত্রীদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ঐ প্রশ্নের সংখ্যা প্রায়শঃই খুব বেশি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে বিহারের বিধানমণ্ডলীর ৩১১ জন সদস্য ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের বাজেট অধিবেশন কালে ১৫৭৭টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উহার উত্তর ছাপা হইয়াছে বড় বড় দুই খণ্ড ১০৪৮ পৃষ্ঠার পুস্তকে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রশাসনিক ব্যাবস্থা সম্বন্ধে তথ্য জানিবার আগ্রহ সদস্যদের প্রবল। ইহার দ্বারা দেশের লোকে শাসন ব্যাপার সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি কথা জানিতে পারেন। বিভিন্ন বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরাও তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকেন।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

সংসদের তুলনায় আঞ্চিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর কায অনেক কম। সেইজন্য ইহাদের অধিবেশন সংসদের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

কেহ কেহ মনে করেন যে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কর্মদক্ষ ব্যক্তিরা সংসদে নির্বাচন প্রার্থী না হইয়া আঞ্চিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে নির্বাচিত হইবার চেষ্টা করেন। আঞ্চিক রাজ্যে মন্ত্রিত্ব পাওয়া যতটা সহজ, কেন্দ্রীয় সরকারে ততটা নহে। আমাদের দেশের জনসাধারণ আঞ্চিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর কার্যকলাপ বিষয়ে যতটা আগ্রহ দেখান, সংসদ সম্পর্কে ততটা নহে। এই যুক্তি কতকটা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। সংসদের সদস্যদের বেতন ও ভাতা অধিক, সম্মানও অধিক। সেইজন্য উপযুক্ত ব্যক্তিরা আঞ্চিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলী অপেক্ষা সংসদেরই সদস্যপদের প্রার্থী হন।

বিধানমণ্ডলীতে কি ধরনের লোক নির্বাচন চাহেন

সংসদের তুলনায় আঞ্চিক রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে গোলমাল, হট্টগোল এবং বিসদৃশ আচরণ কিছু বেশি হয়। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে উত্তর প্রদেশের বিধান সভায় সমাজতন্ত্রী দল এরূপ বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করিয়া ছিলেন যে বাধ্য হইয়া স্পীকার মহোদয় মার্শালকে আদেশ দেন যে ঐ দলের দলপতিকে হাতে করিয়া তুলিয়া বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হউক। এরূপ ঘটনা বৃটিশ পার্লামেন্টে দুই একবার ঘটিয়াছে। জাপান, ইটালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও সংসদের মধ্যে তুমুল হট্টগোল, হাতাহাতি এবং ঘুঁসাঘুঁসি পর্যন্ত ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বিধানমণ্ডলীতে নিয়ম আছে যে স্পীকার বা পরিষদের চেয়ারম্যানের দণ্ড (mace) যতক্ষণ টেবিলের উপর থাকিবে ততক্ষণ সভার কার্য চলিবে। একবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডলীর একজন সদস্য তুমুল বিতর্কের সময় টেবিলের উপর হইতে দণ্ডটি লইয়া দৌড় মারিয়াছিলেন।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ সংবিধান : ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল তখন পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের সহিত যোগ দেয় নাই। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে একদল সৈন্য পাকিস্তানের দ্বারা সমর্থিত হইয়া কাশ্মীর আক্রমণ করে। সেইসময়ে বাধ্য হইয়া কাশ্মীরের মহারাজা ভারতের সহিত জম্মু ও কাশ্মীরকে যুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ভারতসরকার ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সৈন্যদল পাঠাইয়া আক্রমণকারীদের হটাইয়া দেয়। পরে সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীরের প্রশ্নটি উত্থাপিত হইলে সংঘ সিদ্ধান্ত করে যে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ভারতীয় এবং পাকিস্তানী সৈন্যদল গুলিগোলা ছোঁড়া বন্ধ করিবেন। ইহার ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি আজাদ কাশ্মীর সৈন্যদলের হাতে রহিয়া যায়। এইসব ঘটনার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান গঠন বিষয়ে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে।

পূর্বাভাষ

ভারতের অন্যান্য রাজ্য তাহাদের সংবিধান ভারতীয় সংবিধান হইতেই পাইয়াছে। ঐ সংবিধানের রদবদল করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সংসদের আছে, রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর নাই (কেবলমাত্র বিধানপরিষদ স্থাপন বা উচ্ছেদ সম্বন্ধে রাজ্যের বিধানসভার প্রস্তাব করিবার ক্ষমতা আছে)। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর তাহার নিজের সংবিধান নিজেই গঠন করিয়াছে এবং উহার রদ বদলও নিজে করিতে পারে। তবে জম্মু ও কাশ্মীর যে ভারতের অঙ্গীভূত, ভারতীয় সংবিধানের এই প্রথম ধারাটির কোন পরিবর্তন হইতে পারিবে না। ভারতীয় সংবিধানের কোন্ কোন্ ধারা জম্মু ও কাশ্মীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে তাহা রাষ্ট্রপতি কাশ্মীরের সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। জম্মু ও কাশ্মীরের যেমন নিজস্ব সংবিধান আছে তেমনই নিজস্ব পতাকাও আছে।

সংবিধানের পরিবর্তন

জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানের নির্দেশক নীতি ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশক (Directive Principles) নীতি অপেক্ষা ব্যাপকতর। ভারতীয় সংবিধানের

সমাজতন্ত্র স্থাপনের কোন কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের নির্দেশক নীতিতে সমাজের সমাজতান্ত্রিক নীতি স্থাপন ও সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

নির্দেশক নীতি

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিবার কথা আছে। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রে প্রত্যেক স্থায়ী বাসিন্দার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত বিনা মূল্যে দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিবেন। ঐ সংবিধানে নারীদের অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা যাহাতে সমান কাজের জন্য পুরুষের সঙ্গে সমান হারে বেতন পান এবং সামাজিক, রাজনৈতিক শিক্ষা ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পান তাহার জন্য রাষ্ট্র হইতে চেষ্টা করা হইবে বলা হইয়াছে।

অন্যান্য আঙ্গিক রাজ্যের রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের যিনি রাষ্ট্রের প্রধান তাঁহার উপাধি সদর-ই-রিয়াসত্ এবং তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যের ভোটের দ্বারা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য তাঁহার নির্বাচন রাষ্ট্রপতির দ্বারা স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। সদর-ই-রিয়াসতের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাঁহাকে ঐ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে এবং তাঁহার বয়স অন্ততঃ ২৫ বৎসর হওয়া প্রয়োজন। কাশ্মীরের রাজবংশের বংশধর শ্রীযুক্ত করণ সিং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সদর-ই-রিয়াসত্ পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা অন্যান্য রাজ্যের রাজ্যপালের তুল্য।

সদর-ই-রিয়াসত

সংবিধান অনুসারে শাসনকার্য চালান অসম্ভব মনে হইলে অন্যান্য রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে সে সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ঐরূপ ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। জম্মু ও কাশ্মীরের বেলায় রাষ্ট্রপতি ঐরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন না—সদর ই-রিয়াসত্ রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে নিজেই এরূপ ঘোষণা করিতে পারেন। ঐ ঘোষণা একাদিক্রমে ৬ মাস কাল বলবৎ থাকিতে পারে। ঐ রূপ ঘোষণার পর সদর-ই-রিয়াসত্ হাইকোর্ট ছাড়া আর অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নিজের হাতে লইতে পারেন। জম্মু ও কাশ্মীরে আর্থিক কারণে রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার অধিকার নাই। আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক

জরুরী অবস্থা ঘোষণা

আক্রমণের আশঙ্কায় রাষ্ট্রপতি নিজে স্বেচ্ছায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন না তবে সদর-ই-রিয়াসতের অনুরোধ বা সম্মতিক্রমে পারেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা একশত হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আজাদ কাশ্মীর ফৌজের হাত হইতে কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ পুনরুদ্ধার না করা যায় ততদিন পর্যন্ত ৭৫ জন সদস্য লইয়াই কাজ চালান হইবে। এইসব সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানে আছে যে সদর ই-রিয়াসত যদি মনে করেন যে নারীরা যথোপযুক্ত সংখ্যায় নির্বাচিত হন নাই তাহা হইলে তিনি দুইজনের অনধিক নারীকে মনোনীত করিতে পারিবেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে যে বিধানসভা নির্বাচিত হইয়াছে তাহাকে একজনও নারী সদস্য নাই এবং সদর-ই-রিয়াসতও কাহাকেও মনোনীত করিবার প্রয়োজন বুঝেন নাই।

বিধানসভা

জম্মু ও কাশ্মীরের বিধান পরিষদে ৩৬ জন সদস্য আছেন, তাহার মধ্যে ২২ জন বিধানসভার দ্বারা, ৬ জন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান দ্বারা, দুইজন শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন এবং ৬ জন সদর-ই-রিয়াসত দ্বারা মনোনীত হইবেন। জম্মু ও কাশ্মীরের স্নাতকদের বিধানপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের কোন অধিকার নাই। অন্যান্য রাজ্যে বিধানপরিষদের মনোনীত সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানপরিষদের ৬ জন মনোনীত সদস্যের মধ্যে তিনজনের অনধিক সদস্য শিক্ষা ও সামাজিক ব্যাপারে অনগ্রসর শ্রেণীদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন।

বিধানপরিষদ

কাশ্মীরীরা ভারতীয় নাগরিক, তবে যাহারা পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের ফিরিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সেখানে করা হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য সরকারী কাজে নিযুক্তি, স্থাবর-সম্পত্তি অর্জনের এবং সরকারী সাহায্য পাইবার বিশেষ ব্যবস্থা করা ইয়াছে।

নাগরিকতা

ভারতীয় সংসদ নিবর্তন মূলক আটক সম্বন্ধে (Preventive detention) কোন আইন পাস করিলে উহা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না।

নিবর্তন মূলক আইন

জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে যুগ্মতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে (Concurrent list) থাকিবে না। নিখিল ভারতীয় বিষয় বলিয়া ঘোষিত সকলগুলি বিষয়ে জম্মু ও

কাশ্মীরের বেলায় কেন্দ্রীয় বিষয় বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। অন্যান্য বিষয়ের সহি নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে কেন্দ্র আইন করিবেন তাহা কাশ্মীরে বেলায় প্রযোজ্য হইবে—প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি সৈন্যদল, অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ প্রভৃতি, আনবিক শক্তি, যুদ্ধ ও সন্ধি, নাগরিকত্ব রেলপথ, বিমান পথ, ডাক ও তার বিভাগ, মুদ্রা ও নোট ও বৈদেশিক মুদ্রা বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, বীমা, ফটকা বাজার, কৃষিছাড়া অন্য আয়কর আমদানি শুল্ক, করপোরেশান ট্যাক্স ইত্যাদি।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানেব অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে এখানে ভারত সরকারকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (Residuary Powers) তাহ ছাড়া আর সমস্ত ক্ষমতাই জম্মু ও কাশ্মীরের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

অবশিষ্ট ক্ষমতা জম্মু ও কাশ্মীরের

ভারতের অন্যান্য আঙ্গিক রাজ্যের সম্বন্ধে ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে যে সমস্ত ক্ষমতার কথা রাজ্য তালিকায় বা যুগ্ম তালিকায় উল্লেখ করা হয় নাই, সে ক্ষমতাগুলি ভারত সরকারের হাতেই থাকিবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা সংবিধান সংশোধন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন কবিতে পারেন। ঐ প্রস্তাব যদি উভয় সদনে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে উহা পাস কবা হইল বলিয়া জানিতে হইবে। উহাতেও অবশ্য সদর-ই-রিয়াসতের সম্মতির প্রয়োজন। সংশোধনী প্রস্তাবে কাশ্মীরকে ভাবত হইতে পৃথক করিবার কথা বলা চলিবে না এবং জম্মু ও কাশ্মীরের শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্বকে খাটো করা চলিবে না।

সংবিধান সংশোধন

১৯৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জম্মু ও কাশ্মীর হইতে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করিবার কোন নিয়ম ছিল না। কিন্তু ঐ বৎসরের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ঐ ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্টে একজন প্রধান বিচাবপতি ও অন্য দুইজন বিচারপতি আছেন। তাঁহাদের ক্ষমতা অন্যান্য রাজ্যের হাইকোর্টের অনুরূপ।

আদালত

সদর-ই-রিয়াসত ও প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতিকে নিযুক্ত করেন।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অন্যান্য আঙ্গিক রাজ্য অপেক্ষা অধিকতর আত্মকর্তৃত্ব ভোগ করিতেছে।

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল—

আমাদের সংবিধান প্রস্তুত হইবার পর হইতে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের রাজ্যপুনর্গঠন কাল পর্যন্ত 'গ' শ্রেণীভুক্ত আজমীঢ়, ভূপাল, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং বিন্ধ্যপ্রদেশের যেমন স্বতন্ত্র আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ রাখিবার ব্যবস্থা ছিল, বর্তমান সময়ের কেন্দ্রশাসিত হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, গোয়া, দমন ও দিউ এবং পণ্ডিচেরি প্রভৃতি অঞ্চলে সেইরূপ করিবার জন্য ভারতীয় সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে প্রস্তাব করা হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৫৬ হইতে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোন আইনসভা ছিল না। তবে হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরায় এক একটি Territorial Council ছিল। দিল্লী নগরীর জন্য তাহার পৌরনিগমই (Municipal Corporation) একমাত্র স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতেও দিল্লীতে স্বতন্ত্র আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ স্থাপনের কোন প্রস্তাব করা হয় নাই। সেজন্য তথায় কেহ কেহ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন যে কলম্বিয়া জেলায় অবস্থিত সেখানেও কোন স্বতন্ত্র আইনসভা ও মন্ত্রিমণ্ডলী নাই।

নূতন আইনসভা ও মন্ত্রিমণ্ডলীর ব্যবস্থা

দিল্লীর শাসন ব্যবস্থা

দিল্লী ব্যতীত অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য যে আঞ্চলিক পরিষদ (Territorial Council) ছিল তাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটে মণিপুর ও ত্রিপুরায় ত্রিশ জন করিয়া ও হিমাচল প্রদেশে ৪১ জন সদস্য নির্বাচিত হইতেন। শেষোক্ত ৪১টি আসনের মধ্যে আবার ১২টি আসন তপশিলভুক্ত জাতিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এইসব পরিষদের ক্ষমতা অনেকটা জেলা বোর্ডের ক্ষমতার অনুরূপ ছিল। পরিষদ কোন কোন বিষয়ে উপনিয়ম তৈয়ারি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার উহাতে যে কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারিতেন। পণ্ডিচেরিতে ৩৯ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এক প্রতিনিধি সভা ছিল।

আঞ্চলিক পরিষদ

প্রত্যেক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল শাসন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। দিল্লী, মণিপুর, ত্রিপুরা ও পণ্ডিচেরিতে তাঁহার উপাধি Chief Commissioner এবং হিমাচল প্রদেশে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর। প্রধান শাসক

ইচ্ছা করিলে আঞ্চলিক পরিষদকে শিক্ষা প্রণালী, পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষার স্তর প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কোন নির্দেশ দিতে পারিতেন। তিনি আঞ্চলিক পরিষদকে যে কোন কাজ হইতে বিরত হইবার আদেশ দিতে পারিতেন; অবশ্য তিনি কেন ঐরূপ আদেশ দিতেছেন সে সম্বন্ধে কারণ লিখাইয়া জানাইতে হইত। যাহা হউক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এতদিন পর্যন্ত স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা অল্পই ছিল।

শাসন কর্তার ক্ষমতা

দশম অধ্যায়

নির্বাচন প্রণালী ও রাজনৈতিক দল

ভারতীয় নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ও বিশালত্ব ঃ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্র হইতেছে ভারতবর্ষ। পৃথিবীর অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশে এত অধিক সংখ্যক লোক স্বাধীনভাবে ভোট দিয়া নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন না। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হইবার পর ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে সর্বপ্রথম এদেশে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী ভোট দিবার অধিকার পাইলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এদেশে যে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনবিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে শতকরা তিনজন মাত্র ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনবিধি অনুসারে ঐ অধিকারকে কিছুটা ব্যাপক করিয়া শতকরা চৌদ্দজন নরনারীকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাগল, দেউলিয়া ও গুরুতর অপরাধে অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিত অপরাধী ছাড়া আর সকল প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী ভোট দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোট

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে যে দ্বিতীয় নির্বাচন ঘটে তাহাতে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় নির্বাচনে উহা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া ২১ কোটি ৬০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। প্রতি পাঁচ বৎসর পর পর দুই কোটির অধিক ভোটারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনের নির্বাচনের সময় সেখানে সর্বসমেত সাড়ে তিন কোটির সামান্য কিছু বেশি ভোটার ছিলেন। আমাদের দেশের নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি নির্বাচন কমিসন আছে। উহা যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তেমনি নির্বাচনের ব্যবস্থা উন্নততর হইতেছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে চার সপ্তাহ কাল সময় লাগিয়াছিল ; ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে সেই স্থানে ১৯ দিনের মধ্যেই সব কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে দশ দিনের মধ্যেই প্রায় সকল কেন্দ্রেরই নির্বাচন সমাপ্ত হইয়াছিল।

ভোটারের সংখ্যা

আমাদের দেশের ভোটারের সংখ্যা বিপুল বটে, কিন্তু অধিকাংশ ভোটার তাঁহাদের নবলব্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য ব্যগ্র নহেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে

শতকরা ৪৫·৩ জন, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ৪৭·৭ জন ও ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ৫১·৯ জন ভোটার ভোট দিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ৪৭·৭ জন শতকরা ভোট দিয়াছিলেন, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে উহা কমিয়া ৪৫·৮ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হইতেছে। তবে ব্রিটেনের মত শতকরা ৭৮ জনে ভোট দিবে আশা করিলে কতকগুলি অসুবিধা দূর করা প্রয়োজন। পল্লীঅঞ্চলে ভোটদানের কেন্দ্র দূরে দূরে অবস্থিত। ভোটারদিগকে পায়ে হাঁটিয়া বহুদূর হইতে আসিতে হয়। ভোটারদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিরক্ষর। তাঁহারা নির্বাচনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু শহর অঞ্চলে দেখা গিয়াছে যে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য কোনরূপ উৎসাহ দেখান না। অশিক্ষিত নরনারীদের সহিত লাইন করিয়া দাঁড়ানো কেহ কেহ অসম্মানজনক মনে করেন; কেহ বা ভাবেন হাজার হাজার ভোটারদের মধ্যে তাঁহার একটি ভোটের কতটুকুই বা মূল্য! আবার কেহ কেহ নিতান্ত আলস্য-বশতঃ ভোটকেন্দ্রে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভোটের অধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য জনসাধারণ বেশ উদ্‌গ্রীব। তাঁহারা অনেকে দূর দূর গ্রাম হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া ভোটকেন্দ্রে রৌদ্রের মধ্যে ধৈর্যের সহিত দাঁড়াইয়া থাকিতে একটুকুও বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ করেন না।

শতকরা কতজন ভোট দেন

ভোটারদের ঔদাসীন্যের কারণ

ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর ও নারীর ভোটের সমান অধিকার বিদ্যমান। তবে কয়েকটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনগণের জন্য কতকগুলি আসন সংরক্ষিত আছে। সেগুলিতে শুধু তাঁহারাই নির্বাচিত হইতে পারেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লোকসভা ও আঙ্গিক রাজ্যগুলির বিধানসভার কতকগুলি কেন্দ্রে দুইটি করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু উহাতে অনেক অসুবিধা দেখিয়া ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া প্রত্যেক দ্বি-সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচনকেন্দ্রকে রদ করিয়া এক-সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনকেন্দ্রে পরিণত করা হইয়াছে। এইভাবে লোকসভার ৯১টি ও রাজ্যের বিধানসভাগুলির ৫৮৪টি কেন্দ্রকে এক-সদস্যযুক্ত নির্বাচনক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার ফলে কিন্তু তপশিলী জাতি ও জনজাতিদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ

এদেশে ভোটারের তালিকায় নাম তুলিবার জন্য নাগরিকদের উৎসাহের প্রাবল্য দেখা যায় না। সরকারী কর্মচারীরা তালিকা প্রস্তুত করিয়া আদালতে, মিউনিসিপ্যালিটিতে বা করপোরেশন অফিসে রাখিয়া দেন ও লোককে বিজ্ঞাপিত করেন যে যাঁহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে বা ভুলভাবে ছাপা হইয়াছে তাঁহারা যেন অমুক তারিখের ভিতর যথারীতি যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করেন। অন্যান্য দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা যেমন বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া যোগ্য ব্যক্তিদিগকে ভোটার তালিকাভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন, এখানে সে রকম বড় একটা হয় না। কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দলের অত সংখ্যক কর্মী নাই কিন্তু কংগ্রেসের কর্মীরাও নূতন ভোটার তালিকাভুক্ত করিতে উৎসাহী নহেন। আর জনসাধারণ কাজ কামাই করিয়া ভোটার হইবার জন্য ছুটাছুটি করিবার ও হাঙ্গামা পোহাইবার মতন কষ্ট স্বীকার করিতে রাজী নহেন। কাজেই ভোটার তালিকায় বেশ কিছু নাম বাদ পড়িয়া যায়। ব্রিটেনের ৫ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের মধ্যে যদি ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক ভোটার হন তাহা হইলে ভারতবর্ষের ৪৪ কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃ ২৮ কোটি ভোটার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানকার ভোটার সংখ্যা জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম অর্থাৎ ব্রিটেনের অনুপাতে যত হওয়া উচিত ছিল তাহার চেয়ে ছয় কোটির কম। ভারতে অবশ্য শিশুর জন্মহার বেশি বলিয়া জনসংখ্যার মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্কের অনুপাত কিছু বেশি। জনসাধারণের ঔদাসীন্যের জন্য নির্বাচন কমিসনকে দোষ দেওয়া বৃথা। ভারতবর্ষের মতন প্রকাণ্ড দেশের ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা বুঝানো সহজ নহে।

ভোটার তালিকায় অনেকের নাম থাকে না

ভারতবর্ষে একই সময়ে এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চিক রাজ্যের আইনসভার প্রথম সদনের প্রতিনিধিদের নির্বাচন হয়। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ হয় না। ভোটারকে প্রথমে বিধানসভার সাদা রংয়ের ব্যালটপত্র দেওয়া হয়। উহাতে বিভিন্ন প্রার্থীর নাম এবং নামের পাশে একটি করিয়া ছবি থাকে। নিরক্ষর ভোটার নাম পড়িতে পারিবেন না, কিন্তু ছবি দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন। কাহারও নামের পাশে জোড়া বলদ, কাহারও বা কাস্তে ও ধানের গুচ্ছ, কাহারও বা প্রদীপ, কাহারও বা ছাতা, সাইকেল, উট, হাতি প্রভৃতি।

ভোটারের হাতে একটি ছোট্ট রবার স্ট্যাম্প দেওয়া হয়। তিনি যে প্রার্থীকে ভোট দিতে চাহেন তাঁহার নামের বা ছবির গায়ে ঐ মোহরের ছাপ দিয়া ভোটের বাক্সে ঐ ব্যালটপত্র ফেলিয়া দিতে হয়। তারপর তাঁহাকে আবার লোকসভার লাল্‌চে রংএর ব্যালটপত্র দেওয়া হয়। উহাও তিনি মোহরাঙ্কিত করিয়া ভোটের বাক্সে নিক্ষেপ করেন।

নিরক্ষর ভোটারের ভোটদান

প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন প্রার্থীর জন্য বিভিন্ন ভোটের বাক্স ছিল এবং তাহার উপর প্রার্থীর প্রতীকের ছবি থাকিত। এবারে ঐ হাঙ্গামা দূর করিয়া প্রতি কেন্দ্রে একটি করিয়া বাক্স রাখা হইয়াছিল। ইহার ফলে বিশ লক্ষের অধিক বাক্স বাঁচিয়া গিয়াছে। আড়াই লক্ষ নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য তথাপি আড়াই লক্ষ ভোটের বাক্সের প্রয়োজন হইয়াছিল। এক একটি ভোটের কেন্দ্রে নয়শত জন ভোটারের ভোট দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার ফলে কোন কেন্দ্রেই বেশি ভিড় হয় নাই এবং কোথাও ভোটারদিগকে ভোট দিবার জন্য বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হয় নাই।

পূর্ব পূর্ব নির্বাচনে কিছু সংখ্যক ভোটার একবার নিজের নামে ভোট দিয়া আসিয়া আবার কিছুক্ষণ বাদে অন্যের নামে ভোট দিবার চেষ্টা করিতেন। এবারে উহা বন্ধ করিবার জন্য ভোটারদের হাতের আঙুলে স্থায়ী কালির চিহ্ন দেওয়া হইয়াছিল। যাঁহার আঙুলে ঐ চিহ্ন আছে তাঁহাকে আর ভোট দিতে দেওয়া হয় নাই।

জুয়াচুরি বন্ধ করার উপায়

নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়: নির্বাচন আরম্ভ হইবার কয়েক মাস আগে হইতেই কে কে নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন বা কাহাকে কোন দল প্রার্থীরূপে মনোনীত করিবেন তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা সুরু হয়। কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইবার জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখা যায়, কেননা কংগ্রেসের প্রার্থীদের অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচিত হইবার বেশ কিছু সম্ভাবনা থাকে। কংগ্রেসের উচ্চ কর্তৃপক্ষ প্রার্থী মনোনয়নের কয়েকটি নীতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি-গুলির উপর প্রাথমিক মনোনয়নের ভার দিয়া থাকেন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা অপেক্ষা দেশের জন্য কারাবরণ প্রভৃতি নির্যাতনকে প্রার্থীর যোগ্যতায় মাপকাঠিরূপে স্থির করা হইয়াছিল। তাহার ফলে কংগ্রেসদলের প্রতি-নিধিদের মধ্যে অধিকাংশই জেলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বলিয়া লোকসভায় ও বিধান-সভায় নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় নির্বাচনের সময়ে আবার তাঁহারা আইন

সভার কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসের অধিনায়কেরা স্থির করেন যে তাঁহাদের দলের এক-চতুর্থাংশ প্রতিনিধি নূতন লোক হওয়া প্রয়োজন। তাঁহারা আরও বলেন যে, কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ১৫ জন মহিলা হওয়া চাই। কার্যকালে কিন্তু শতকরা ৭ জনের বেশি মহিলা প্রার্থী তাঁহারা দাঁড় করাইতে পারেন নাই। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মনোনয়নের বিরুদ্ধে অমনোনীত প্রার্থীরা কংগ্রেসের হাইকম্যাণ্ড বা বড় কর্তাদের নিকট আপিল করেন। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ অল্প বা অধিক পরিমাণে অনিবার্য হইয়া পড়ে।

কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দলও প্রার্থী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করেন। তবে যে সব দল হইতে খুব কম প্রার্থী নির্বাচিত হইয়া থাকেন সে সব দলের মনোনয়ন পাইবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিরা যথেষ্ট আগ্রহ দেখান না। অনেকে আবার কোন দলেরই মনোনয়ন চাহেন না; তাহারা নির্দলীয় প্রার্থীরূপে দাঁড়াইতে চাহেন। পশ্চিমের সুপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে নির্দলীয় প্রার্থীর সংখ্যা খুব কম, কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত প্রার্থীরা বুঝিতে পারেন নাই যে দলের সাহায্য না পাইলে নির্বাচিত হওয়া খুবই কঠিন এবং নির্বাচিত হইলেও আইনসভায় যাইয়া বিশেষ কোন কাজ করা যায় না। নারসিসাস্ যেমন নিজের চেহারা দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইতেন, তেমনি অনেকে নিজের নাম কাগজে ছাপা হইতেছে দেখিয়া ও প্রাচীরপত্রে এবং মাইকে ঘোষিত হইতেছে শুনিয়া মোহিত হন এবং ঐ পুলক অনুভবের আশায় নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়াও নির্বাচনপ্রার্থী হন। কিন্তু ইহাতে শুধু যে তাঁহাদের নিজের অর্থ ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটে তাহা নহে, উপযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনেও বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তাঁহারা না দাঁড়াইলে হয়তো তাঁহাদের সমর্থকেরা অন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দিতেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে লোকসভায় ২৭ জন ও আঙ্গিক রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে ২৯৯ জন নির্দলীয় প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন।*

যাঁহারা কোন দলের দ্বারা মনোনীত হন অথবা নিজেরাই নির্দলীয় প্রার্থীরূপে

* অন্ধ্র ৫০, আসাম ২০, বিহার ১২, গুজরাত ৮, জম্মু ও কাশ্মীর ১, কেরল ৫, মধ্য প্রদেশ ৩৮, মাদ্রাজ ৫, মহারাষ্ট্র ১৫, মহীশূর ৩৭, উড়িষ্যা ৭, পাঞ্জাব ২১, রাজস্থান ২২, উত্তর প্রদেশ ৬১, পশ্চিমবঙ্গ ২৭।

দাঁড়াইতে মনস্থ করেন, তাঁহাদের প্রথমে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে হয়। কোন বিধানসভার প্রার্থীর নাম সেই বিধানসভার ভোটারের তালিকায় থাকা চাই। এক রাজ্যের ভোটার আসিয়া অন্য রাজ্যের বিধানসভার জন্য প্রার্থী হইতে পারেন না। কিন্তু যে কোন রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম থাকিলে লোকসভায় নির্বাচন প্রার্থী হওয়া যায়। মনোনয়ন পত্র দাখিল করিবার একটি ছাপা ফর্ম থাকে। তাহাতে প্রার্থীর নাম-ধাম প্রভৃতির সহিত তাঁহার সমর্থকের নাম সই থাকা চাই। একটি মনোনয়ন পত্র কোন কারণে অগ্রাহ্য হইয়া যাইতে পারে আশঙ্কায় প্রার্থীরা একাধিক মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। কিন্তু কেহই চারটির বেশি মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে পারেন না।

মনোনয়ন পত্র দাখিল করিবার সময় প্রত্যেক প্রার্থীকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা ট্রেজারিতে আমানত জমা করিবার চালান জমা দিতে হয়। বিধানসভার সাধারণ প্রার্থীদিগকে ২৫০ টাকা ও লোকসভার প্রার্থীকে ৫০০ টাকা জমা দিতে হয়। তবে তপশীলী শ্রেণী বা তপশীলী জনজাতিদের প্রার্থীকে বিধানসভার জন্য ১২৫ টাকা ও লোকসভার জন্য ২৫০ টাকা জমা দিতে হয়। যতজন লোক ভোট দিবেন তাঁহাদের এক-অষ্টমাংশ ভোটও যাঁহারা পাইবেন না তাঁহাদের আমানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। এরূপ নিয়ম করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহাদের ভোট পাইবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম তাঁহারা যেন প্রার্থীরূপে না দাঁড়ান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বহু প্রার্থী নির্বাচনক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে লোকসভার জন্য ১৯৮৩ জন প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৪৫৯ জন নির্দলীয় প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু মাত্র ২৭ জন নির্দলীয় ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারিয়াছিলেন। অধিকাংশ প্রার্থীরই আমানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল।

মনোনয়ন পত্র দাখিলের পর রিটার্নিং অফিসার ঐগুলি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। যাঁহাদের মনোনয়ন পত্রে কোন ভুলত্রুটি পাওয়া যায় না তাঁহারা প্রার্থী বলিয়া ঘোষিত হন। কিন্তু তাঁহাদিগকে নাম প্রত্যাহারের জন্য কয়েক দিন সময় দেওয়া হয়। ঐ সময়ের মধ্যে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা নির্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া যাইতে পারেন।

কখনো কখনো এমন হয় যে, একটি কেন্দ্রে কয়েকজন প্রার্থী প্রথমে দাঁড়াইলেন। তারপর একজন ছাড়া অন্য সকলে নাম প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার দরুণ সেই এক ব্যক্তি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইলেন বলিয়া ঘোষিত হন। কোন কোন

ক্ষেত্রে অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দিয়া নাম প্রত্যাহার করানো হয়। এরূপ ঘটিলে সাধারণ ভোটদাতারা তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের লোকসভার নির্বাচন ব্যাপারে ১০ জন, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ১২ জন এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মাত্র তিনজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিনের ২৪ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত প্রার্থীরা সভা-সমিতি করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়া ও মাইক লাগাইয়া ভোট প্রার্থনা করিতে পারেন। এদেশে অধিকাংশ ভোটার নিরক্ষর। তাই পুস্তক-পুস্তিকা প্রভৃতি বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা এখানে নাই। চোখের পরিবর্তে কানের নিকট আবেদন করিবার প্রবৃত্তি অধিক দেখা যায়। তবে তাঁহাদের নিবেদন কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে না। অনেক ক্ষেত্রেই ভোটারেরা সংকল্প করেন যে অধিক চীৎকারকারীদিগকে তাঁহারা ভোট দিবেন না।

নির্বাচনে খরচ ও অবৈধ কার্যের তালিকাঃ নির্বাচনে দাঁড়াইয়া কেহ নিজের খেয়াল মত যথেচ্ছ খরচা করিতে পারেন না। সরকার হইতে খরচের পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকসভার কোন প্রার্থী পঁচিশ হাজার টাকার বেশি এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার কোন প্রার্থী সাত হাজার টাকার বেশি ব্যয় করিতে পারিবেন না। বিভিন্ন রাজ্যের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তথাকার বিধান-সভার প্রার্থীদের ঊর্ধ্বতম খরচের সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেহ ভোটারদিগকে ভোটদানের স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বা তথা হইতে তাঁহাদের বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না। কোন প্রার্থী কোন ভোটারকে খানাপিনা বা অন্য কোন বাবদ কোন টাকা পয়সা দিতে পারিবেন না। কোন্ বাবদ কি কি খরচ করা হইয়াছে, কাহাকে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা রসিদসহ হিসাবের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে। যে দিন ভোটের ফল প্রকাশিত হইয়াছে সেইদিন হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট যদি কেহ হিসাব দাখিল না করেন, তাহা হইলে নির্বাচিত হইয়া থাকিলে তাঁহার নির্বাচন বাতিল হইয়া যাইবে। আর যাঁহারা নির্বাচিত হন নাই তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে নির্বাচনপ্রার্থী হইতে দেওয়া হইবে না। অবশ্য এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও গোপনে কোন কোন প্রার্থী নির্ধারিত খরচের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়

করিয়া থাকেন। দল হইতে প্রার্থীদের অনেক খরচা নির্বাহ করা হয়। তবুও নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে নির্বাচনে দাঁড়ানো কঠিন।

নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতে যাইয়া কেহ যদি কোন ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা বা জাতির উল্লেখ করেন তবে আইনতঃ তিনি দণ্ডনীয় হইতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ জাতি ও ধর্মের প্রভাবে অনেকেই ভোট দিয়া থাকেন। গত তিনটি নির্বাচনেই দেখা গিয়াছে যে অনেক রাজ্যে লোকে নিজের জাতির প্রার্থীদিগকে ভোট দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য জাতিভেদের উপর বড় একটা জোর দেওয়া হয় না।

একদল যদি কোন নির্বাচনী সভা আহ্বান করেন তাহা হইলে অন্যদলের পক্ষে সেখানে যাইয়া হট্টগোল করা বা হাঙ্গামা করা বে-আইনী। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক দলকে ভোট যোগাড় করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়। সরকারী কর্মচারীরা নির্বাচন ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিতে বাধ্য। তাঁহারা যদি কোন ব্যক্তি বা দলকে সাহায্য করিয়াছেন প্রমাণিত হয় তাহা হইলে ঐ নির্বাচন বাতিল হইয়া যাইতে পারে। কোন দল সরকারী যানবাহন লইয়া বা রাষ্ট্রীয় পতাকা ব্যবহার করিয়া প্রচার কার্য করিতে পারিবেন না। আকাশবাণী নির্বাচন ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। মোটের উপর ভারতবর্ষে নির্বাচন ব্যাপার সম্পূর্ণ গণ-তান্ত্রিক। ইহাতে জোর জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না।

নির্বাচন কমিসন (Election Commission) : সংবিধানে (৩২৪ ধারা) লিখিত আছে যে, রাষ্ট্রপতির, উপরাষ্ট্রপতির, সংসদ ও আঞ্চিক রাজ্যের আইন সভার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি নির্বাচন কমিসন থাকিবে। উহাতে একজন প্রধান নির্বাচন কমিসনার ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দিষ্ট কয়েকজন সদস্য থাকিবেন। তাঁহারা সকলেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি বোম্বাই ও পাটনাতে একজন করিয়া আঞ্চলিক নির্বাচন কমিসনার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রধান নির্বাচন কমিসনারকে সাহায্য করিতেন। দ্বিতীয় নির্বাচনের পূর্বে কিন্তু দিল্লীতেই তিনজন ডেপুটি নির্বাচন কমিসনার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সে সময়ে কোন আঞ্চলিক কমিসনার নিযুক্ত করা হয় নাই। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে একজন প্রধান নির্বাচন কমিসনার ও একজন ডেপুটি নির্বাচন কমিসনার ও একজন সম্পাদক লইয়া নির্বাচন কমিসন গঠিত হইয়াছিল।

প্রধান নির্বাচন কমিসনারের মর্যাদা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের ন্যায়। তবে তিনি ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন না। তাঁহার কার্যকাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। তাঁহার নিরপেক্ষতা বিষয়ে যদি কোন অভিযোগ আসে, তাহা হইলে যে পদ্ধতিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারককে অপসারিত করা যায়, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে প্রধান নির্বাচন কমিসনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারেন। তিনি কোন মন্ত্রীর আজ্ঞাবহ নহেন। তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত প্রত্যেকটি কাজের ব্যবস্থা করিবার মালিক। নির্বাচনের পর যে সব নির্বাচনী মামলা উপস্থিত হয়, তাহার বিচার করিবার জন্য ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ বিচারালয় গঠন করিবার ভারও তাঁহার উপর।

প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া নির্বাচনের অধ্যক্ষ (Chief Electoral Officer) থাকেন। রাজ্যের একজন প্রবীন ও বিচক্ষণ সরকারী কর্মচারীকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি যদি নির্বাচন ব্যাপারে সকল সময় দিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার অধীনে কেবলমাত্র নির্বাচনের কাজ করিবার জন্য একজন সহকারীকে নিযুক্ত করা হয়। কোন কোন রাজ্যে প্রত্যেক জেলার জন্য একজন করিয়া District Election Officer আছেন; কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে জেলার কোন পদস্থ কর্মচারীকে নির্বাচনের কাজের ভার দেওয়া হয়। বিধানসভার প্রত্যেকটি নির্বাচনকেন্দ্রের জন্য একজন করিয়া নির্বাচনবিষয়ক রেজিস্ট্রেসন কর্মচারী থাকেন। তাঁহার কাজ হইতেছে প্রতি বৎসর ঐ কেন্দ্রের ভোটারের তালিকায় নূতন ভোটারের নাম সন্নিবেশ করা ও মৃত ভোটার প্রভৃতির নাম হটাইয়া দেওয়া। যাঁহারা ২১ বৎসর বয়সে উপনীত হন তাঁহাদের উচিত ঐ কর্মচারীর নিকট আবেদন করিয়া নিজ নিজ নাম ভোটারের তালিকায় উঠাইবার ব্যবস্থা করা।

নির্বাচনকেন্দ্রের সীমা ও সংখ্যানির্ধারণ কমিসন (The Delimitation Commission): কোন্ রাজ্যের কতজন প্রতিনিধি লোকসভায় থাকিবেন, সেখানকার বিধানসভায় কতজন সদস্য রহিবেন, এসব ব্যাপার প্রতি দশ বৎসর পর পর যে আদমসুমারি হয় তাহার তথ্য অনুসারে নির্ধারিত হয়। এই কাজের ভার দেওয়া হয় The Delimitation Commission নামক এক সংস্থার উপর। উহাতে তিনজন সদস্য থাকেন। একজন হইতেছেন প্রধান নির্বাচন কমিসনার;

আর দুইজন সদস্য হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান অথবা ভূতপূর্ব বিচার-পতি হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সভাপতি হন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমে এই কমিসন নিযুক্ত হয়। তাঁহারা লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যসংখ্যা বণ্টন ও তপশীলী জাতি ও জনজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন প্রভৃতির সংখ্যা লইয়া অনেকগুলি আদেশ জারি করেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যপুনর্গঠন আইন পাসের সময় ঐ সব আদেশের অনেক রদবদল করা হয়। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির ফল ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর বাহির হইয়াছে। এখন উক্ত কমিসন নূতন করিয়া সদস্যসংখ্যাদি নির্ধারণ করিবেন; কিন্তু ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে যাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ নির্ধারণের আওতায় পড়িবেন না। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পূর্বে নূতন করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে লোকসভায় প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির করা হইবে। সেই সময়ে বিভিন্ন বিধানসভার সদস্যসংখ্যা নিরূপিত হইবে এবং নির্বাচন কেন্দ্রগুলির সীমা প্রয়োজন হইলে নূতন করিয়া টানিয়া দেওয়া হইবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল: ভারতবর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। সকলকে একটিমাত্র দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয় নাই। আবার ব্রিটেন ও আমেরিকার মতন এখানে একটি দলের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত ও অন্য দলের উপর ঐ দলের বিরোধিতা করিয়া বিকল্প সরকার গঠনের ভার প্রদত্ত হয় নাই। এখানে ছোটবড় অনেকগুলি দল বর্তমান। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একমাত্র কংগ্রেস দলই ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, জনবলে গরীয়ান্ ও ধনবলে প্রতাপান্বিত। দেশকে স্বাধীন করিবার অনেকখানি কৃতিত্ব এই দলের। তাই কংগ্রেস ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে হইতে আজ পর্যন্ত অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করিতেছেন। সংসদীয় নিয়ম অনুসারে কোন সদনের মোট সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ এক-দশমাংশ সদস্য যদি কোন বিরোধী দলে থাকেন তাহা হইলে তাহাকে opposition party বলা যায়। কিন্তু তাহার কম হইলে উহাকে Opposition group মাত্র বলা হয়। ভারতীয় সংসদে এ পর্যন্ত কোন বিরোধী পার্টি নাই, বিরোধী গ্রুপ মাত্র আছে।

কংগ্রেসের প্রাধান্য

অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদ্ বলেন যে, ভারতের গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভের ব্যবস্থার জন্য কংগ্রেসের কর্তব্য তাহার বিরুদ্ধ দলকে গঠিত হইবার সুযোগ দেওয়া। কংগ্রেস সুযোগ দিতেছেন না অথবা কোন দলের প্রচারকার্যে বাধা দিতেছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। কংগ্রেসকে

কিন্তু কংগ্রেস অন্যান্য দলকে দমন করেন না

পরাজিত করিবার মতন শক্তি যদি অন্য কোন দল অর্জন করিতে না পারেন তাহা হইলে সে দোষ কংগ্রেসের নহে।

কংগ্রেস মধ্যপন্থী ; অতিরিক্ত পরিমাণ সংরক্ষণশীল নহেন, আবার উগ্রধরনের বিপ্লবসাধনের পক্ষপাতীও নহেন। ইহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল, সংরক্ষণশীল, মৃদু অথবা প্রচণ্ড বিপ্লববাদী দল গঠিত হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের প্রথম নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রাতারাতি ৭৭টি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে মাত্র আটটিকে নিখিল ভারতীয় সংগঠন বলা যায় এবং চৌদ্দটিকে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান আখ্যা দেওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস, স্যোশালিষ্ট, কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টি, কম্যুনিষ্ট দল, জনসংঘ, অকালীদল, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিষ্ট গ্রুপ) ফরোয়ার্ড ব্লক, (রুইকার গ্রুপ) হিন্দু মহাসভা, রাম রাজ্য পরিষদ, তপশীলী জাতিসংঘ (Scheduled Castes Federation), বলশেভিক দল, বিপ্লবী কম্যুনিস্ট দল, বিপ্লবী সোস্যালিস্টদল, গণতন্ত্র পরিষদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস শতকরা ৪৫ ভোট পাইয়া শতকরা ৭৪টির বেশি আসন অধিকার করেন। কিন্তু সোস্যালিস্ট দল শতকরা ১০·৫ ভোট পাইয়া মাত্র শতকরা ২·৪৫টি আসন লাভ করেন। কম্যুনিস্ট পার্টি ভোট পাইয়াছিলেন শতকরা ৫টি, আসন অধিকারও করিয়াছিলেন শতকরা ৫·৩১ টি। কিন্তু অন্যদিকে কৃষক মজদুর দল শতকরা ৫·৮৭ ভোট পাইয়া মাত্র শতকরা ২·০৪ টি আসন লাভ করেন। অন্যান্য দলগুলির মধ্যে গণতন্ত্র পরিষদ শতকরা একটিরও কম ভোট পাইয়া শতকরা একটি আসন অধিকার করেন। অন্য কোন দল শতকরা একটি আসনও পান নাই। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সংগঠন প্রণালী ও কার্যনীতি আলোচনা করিলে তাহাদের সাফল্যের ও অকৃতকার্যতার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে।

অন্যান্য দল

বিভিন্ন দলের সাফল্য

তিনটি নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল লোকসভায় কতগুলি আসন পাইয়াছিলেন তাহার তুলনামূলক বিচার নীচের তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে।

দলের নাম	লোকসভায়	আসনেরসংখ্যা
	১৯৫২	১৯৫৭-১৯৬২
কংগ্রেস	৩৬৩	৩৭১-৩৬১

দলের নাম	লোকসভায়	আসনেরসংখ্যা
প্রজাসোস্যালিস্ট দল	২৬	২০-১২
কম্যুনিস্ট দল	১৭	২৭-২৯
জনসংঘ	৩	৪-১৪
স্বতন্ত্র	×	×-১৮

কংগ্রেস দল ঃ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক দলমাত্র ছিল না ; শোষিত ও শৃঙ্খলিত জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে বিদ্যমান ছিল। যাঁহারাই দেশের উন্নতি ও স্বাতন্ত্র্য কামনা করিতেন তাঁহারাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলেও ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইহার কোন নিজস্ব গঠনপ্রণালী (Constitution) ছিল না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেস রাজনৈতিক দলরূপে নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নাই। মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কংগ্রেসী সদস্য লইয়া স্বরাজ্য দল গঠন করেন। ঐ দল বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভায় শক্তিশালী হইয়াছিল কিন্তু বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাত, অন্ধ্র ও মাদ্রাজের কংগ্রেসী দল আইনসভায় প্রবেশ করিতে রাজী হন নাই। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ও নগরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক কমিটি (Primary Committee) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

কংগ্রেসের নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতরণ

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস রাজনৈতিকদলরূপে বিভিন্ন প্রদেশের বিধানসভায় প্রবেশ করে। ঐ সময়ে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মুসলিম লীগ ও উদারনৈতিক দল। কিন্তু শেষোক্ত দল বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও তিনটিতে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী দল রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পর কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশে যে নির্বাচন হয় তাহাতে কংগ্রেস শতকরা ৫৯টি আসন, মুসলিম লীগ শতকরা ২৭টি আসন এবং অন্যান্য দল বা ব্যক্তি মাত্র শতকরা ১৪টি আসন অধিকার করেন। কংগ্রেস আসাম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপশ্চিম, সীমান্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মধ্য-

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কংগ্রেসী দল

প্রদেশ, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন। মুসলিম লীগ কেবলমাত্র বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনে সমর্থ হয়।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের সমর্থক ছিলেন। যতদিন পর্যন্ত না দেশ স্বাধীন হইয়াছিল ততদিন তাঁহারা এক হইয়া কাজ করিতেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ঐক্যবন্ধন ভাঙ্গিয়া গেল। প্রথমে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সমাজতন্ত্রীরা (Socialists) কংগ্রেস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পরে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আচার্য কৃপালনীর নেতৃত্বে কৃষক মজদুর প্রজাদলের সমর্থকেরা কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন। আচর্য কৃপালনী দশবৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং একবার উহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন

এই ভাঙ্গনের মুখে কংগ্রেস নিজের ঘর মেরামতের ব্যবস্থা করিলেন। অন্ততঃ আঠারো বছর বয়স হইয়াছে এমন যে কোন নরনারী চার আনা বছরে চাঁদা দিয়া সদস্য হইতে পারেন। কিন্তু ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সদস্যদের মধ্যে সক্রিয় (Active) ও প্রাথমিক (Primary) এই দুই শ্রেণীর সদস্য করা হইল। সক্রিয় সদস্যেরাই নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারিবেন ও স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সম্পাদক, সভাপতি, কার্যকরী সমিতির সদস্য প্রভৃতি হইতে পারিবেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের অধিবেশনে কংগ্রেস নিয়ম পরিবর্তন করিয়া বিধান করিলেন যে সক্রিয় সদস্যদের বয়স অন্ততঃ একুশ বৎসর হইবে এবং তাঁহাদিগকে সদাসর্বদা খাদি পরিধান করিতে হইবে, মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে হইবে, ছুঁৎমার্গ পরিহার করিতে হইবে, অন্যের ধর্মমতের প্রতি সশ্রদ্ধ হইতে হইবে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ দিবার নীতি মানিতে হইবে এবং বিনা পারিশ্রমিকে প্রত্যহ কিছু সময় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যে ব্যয় করিতে হইবে। এই উচ্চ আদর্শ যদি সকলে অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে দেশের দুঃখদুর্দশা অনেক হ্রাস পাইত। কিন্তু কংগ্রেসের ভিতর অধিকাংশ স্থলেই দলাদলি, রেষারেষি বর্তমান। কোথাও কোথাও নেতৃত্ব লইয়া বিবাদ এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে যে কংগ্রেসের একজন সদস্য চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে অন্য এক সদস্য আইনসভায় নির্বাচিত না হইতে পারেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষমতা ভোগ করিলে দলের মধ্যে এরূপ বিবাদবিসম্বাদ পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়।

কংগ্রেসের সদস্যদের শ্রেণীভেদ

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস নিম্নলিখিত রূপ ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন—স্বাধীন ভারতের দুইটি প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সংসদীয় প্রথায় এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন এবং শিল্পায়িত ও ক্রম-বর্ধমান অর্থনৈতিক এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাহার ফলে ন্যায় ও সমান অধিকার-মূলক সামাজিক অবস্থা স্থাপিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে অর্ধ-সামন্ত যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সৃজনশীল উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। কংগ্রেসী সরকারের চেষ্টায় স্কুল কলেজে পড়ুয়াদের সংখ্যা বার বৎসরে ২৪০ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৪৬০ লক্ষ হইয়াছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে উহা ৬৫০ লক্ষে পৌঁছিবে। স্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারতবাসীর গড়ে আয়ুষ্কাল ছিল ৩২ বৎসর, এখন নানাবিধ উন্নতির ফলে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৪৭·৫ বৎসর। কংগ্রেস গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করিয়া পঞ্চায়েত রাজ ও সামূহিক উন্নয়ন ব্লক স্থাপন করিতেছে।

কংগ্রেসের লক্ষ্য

কংগ্রেস অধিকতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ক্রমে ক্রমে সরকারী মালিকানায় অধিকতর সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কিন্তু তৎসঙ্গে অধিকতর উৎপাদনের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকেও উৎসাহ দেওয়া হইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত শিল্প বাণিজ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকিবে।

আদর্শ

নির্বাচনী ইস্তিহারে কংগ্রেস ঘোষণা করেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িতে বা কমিতে দেওয়া হইবে না। যতদূর সম্ভব সরকারী তত্ত্বাবধানে ব্যবসা পরিচালিত হইবে। করবৃদ্ধি এমন ভাবে করা হইবে যাহাতে আর্থিক বৈষম্য দূরীভূত হয়। চাষের জমির যেমন ঊর্ধ্বসীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে তেমনি নগর অঞ্চলে ব্যক্তিগত আয়ের একটা ঊর্ধ্বসীমা বাঁধিয়া দিবার কথা চিন্তা করা হইতেছে।

আর্থিক নীতি

কংগ্রেস নিরস্ত্রীকরণের সমর্থন করে ও ঔপনিবেশিকতার উচ্ছেদ কামনা করে। দেশের সংহতি ও সীমান্তের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য দেশবাসীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কংগ্রেস সমর্থন করে। পাকিস্তান বা চীনের দ্বারা অধিকৃত ভারতীয় এলাকাগুলি হইতে আক্রমণ উচ্ছেদ করা হইবে। কিন্তু চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী ভারত ঐ উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাধন করিবার চেষ্টা করিবে।

নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে পর্তুগীজদের হাত হইতে গোয়া প্রভৃতি স্থান উদ্ধার করার দরুণ কংগ্রেসের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। কংগ্রেসের ধনবল, জনবল, দৃঢ় সন্নিবদ্ধ সংগঠনও তাহার জয়লাভের সহায়ক হইয়াছিল।

কংগ্রেসের সাফল্য

কংগ্রেস লোকসভার ৪৯৪টি নির্বাচনমূলক আসনের মধ্যে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ৩৬১টি আসন অধিকার করিয়াছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের তুলনায় এই সংখ্যা মাত্র দুইটি ও ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের তুলনায় মাত্র ১০টি কম। ১৯৫২ কংগ্রেস ক ও খ তালিকাভুক্ত রাজ্যগুলির বিধানসভার ৩০৫৫টি আসনের মধ্যে ২০৮৯ টি আসন অধিকার করিয়াছিল। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৯০৮ টি আসনের মধ্যে তাহারা ১৮৯৩ টি আসন পাইয়াছিল। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন আঙ্গিক রাজ্যের বিধানসভার ও হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরার স্থানীয় পরিষদের ৩২৮০ সংখ্যক সদস্যের মধ্যে ১৯৮৪ টি আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৪৭·৭৪ ভোট পাইয়াছিল, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে উহা শতকরা ৪৫ টি ভোটে দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের তুলনায় কংগ্রেস ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে ৭৮টি, পশ্চিমবঙ্গে ৫টি ও আসামে ৮টি বেশি আসন অধিকার করিতে পারিয়াছে। কিন্তু গত বারের নির্বাচনের তুলনায় মধ্য প্রদেশে ৯০টি, উত্তর প্রদেশে ৩৮টি, মাদ্রাজে ১৩টি, বিহারে ২৫টি এবং পাঞ্জাবে ৩০টি আসন কম পাইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কংগ্রেস বিধানসভার প্রায় এক হাজারটি আসনে পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস প্রত্যেকটি রাজ্যে ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিষদে কংগ্রেসের আপেক্ষিক শক্তি বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর বিভিন্ন দলের ফলাফল

রাজ্য	মোট সদস্য সংখ্যা	কংগ্রেস	স্বতন্ত্র	কম্যুনিস্ট	প্রজা সোসালিস্ট	জনসংঘ	সোস্যালিস্ট
অন্ধ্র	৩০০	১৭৮	১৯	৫১	×	×	২
আসাম	১০৫	৭৯	×	×	৬	×	×
বিহার	৩১৮	১৮৫	৫০	১২	২৯	৩	৭
গুজরাত	১৫৪	১১৩	২৬	×	৭	×	×

রাজ্য	মোট সদস্য সংখ্যা	কংগ্রেস	স্বতন্ত্র	কম্যুনিস্ট	প্রজা সোস্যালিস্ট	জনসংঘ	সোস্যালিস্ট
জম্মু ও কাশ্মীর	৭৫	—	×	×	×	×	×
কেরল	১২৬	৬৩	×	২৭	১৯	×	×
মধ্যপ্রদেশ	২৮৮	১৪৩	২	১	৩৩	৪১	১৪
মাদ্রাজ	২০৬	১৩৯	৬	২	×	×	১
মহারাষ্ট্র	২৬৪	২১৫	×	৬	৯	×	১
মহীশূর	২০৮	১৩৮	৯	৩	২০	×	×
উড়িষ্যা	১৪০	৮৩	×	৪	১১	×	৪
পাঞ্জাব	১৫৪	৯০	৩	৯	×	৮	৫
রাজস্থান	১৭৬	৮৮	৩৬	৫	২	১৫	২৪
উত্তর প্রদেশ	৪৩০	২৪৯	১৫	১৪	৩৮	৪৯	×
পশ্চিমবঙ্গ	২৫২	১৫৭	×	৫০	৫	×	×
হিমাচল প্রদেশ	৪১	৩২	৪	×	×	×	×
মণিপুর	৩০	১৫	×	×	×	×	৫
ত্রিপুরা	৩০	১৭	×	১৩	×	×	×

এই সংখ্যা ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ৬৭ জন সদস্য ; বিহারে ঝাড়খণ্ড দলের ২০ জন ; কেরলে মুসলিম লীগের ১১ জন ; মধ্য প্রদেশে রামরাজ্য পরিষদের ১০ জন ও হিন্দু মহাসভার ছয় জন ; মাদ্রাজে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘাম দলের ৫০ জন ও ফরোয়ার্ড ব্লকের ৩ জন ; মহারাষ্ট্রে কৃষক ও শ্রমিক (Peasant and Workers Party) দলের ১৫ জন ও রিপাবলিকান দলের ৩ জন ; উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদের ৩৭ জন ; পাঞ্জাবে অকালী দলেব ১৯ জন, রাজস্থানে রামরাজ্য পরিষদের ৩ জন ; উত্তর প্রদেশে হিন্দু মহাসভার ২ জন ও রিপাবলিকান দলের ৮জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের ১৩জন সদস্য আছেন।

ভারতের কম্যুনিস্ট দল : ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কম্যুনিস্ট দল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই দল প্রকাশ্যভাবে হিংসাত্মক বিপ্লব সমর্থন করিত বলিয়া বহুকাল ধরিয়া ইহাকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান করিয়া রাখা হইয়াছিল। যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়াছিল তখন হিটলারের সহিত রাশিয়া সহযোগিতা করিয়াছিল। তাই ভারতীয় কম্যুনিস্টরা তখন যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া উহাতে ব্রিটিশ শক্তিকে

কোন সাহায্য করে নাই। কিন্তু ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যখন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করিলেন তখন ভারতীয় কম্যুনিস্টরা রাতারাতি তাঁহাদের মত বদলাইয়া বলিলেন যে ঐ যুদ্ধ এখন জনযুদ্ধে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং ব্রিটেনকে সাহায্য করা কর্তব্য। কংগ্রেস কিন্তু তখন যুদ্ধোদ্যমের সহিত অসহযোগিতা করিতেছিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস যখন "ভারত ছাড়' রব তুলিল তখন কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসের বিপক্ষতা করিয়া ব্রিটিশ শাসকদের সহায়তা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টিকে আইন-সঙ্গত দল বলিয়া সরকার মানিয়া লইলেন। কিন্তু ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে যখন বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভার নির্বাচন হইল তখন কম্যুনিস্টরা আটটি মাত্র আসন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ করেন। ইহাতে সাফল লাভ না করিতে পারিয়া ১৯৫১-৫২র নির্বাচনের পূর্বে কম্যুনিস্ট পার্টি কার্যনীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন করিল। তাঁহারা হিংসাত্মক বিপ্লব করিবার নীতি ত্যাগ করিলেন এবং সংবিধানের আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন সেই জন্য নির্বাচনের কিছু আগে পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের উপর যে বাধা-নিষেধ (Ban ছিল তাহা উঠাইয়া লওয়া হইল। তখনও সরকার মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও হায়দ্রাবাদে কম্যুনিস্টদিগকে দমন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছিলেন কেরলে ও অন্যান্য কোন কোন স্থানে কম্যুনিস্টরা নির্দলীয় প্রার্থীরূপে বা সংযু বামপন্থী ফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা সুকৌশলে কংগ্রেসে দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া এবং খাদ্যদ্রব্যের ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য জিনিসের মূল্যবৃ নিরোধে অক্ষমতা ও ক্রমবর্ধমান বেকারির কথা বলিয়া অনেক ভোট সংগ্র করিলেন। বস্তুতঃ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের একটি প্রধান বৈশি কম্যুনিস্ট পার্টির সাফল্য। তাঁহারা লোকসভার নির্বাচনে ৫,৩৭০,৩৬১ টি ভো পাইয়া ২৬ টি আসন অধিকার করিলেন। কাজেই তাঁহারাই লোকসভায় প্রধ বিরোধী দল বলিয়া গণ্য হইলেন। আঙ্গিক রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচ তাঁহারা ৬,০৬২,৯৪৩ টি ভোট পাইয়া ১৭৩ টি আসন লাভ করিলেন—যদি তাঁহারা ৫৬৩ টি নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলে ইহার মধ্যে হায়দ্রাবাদে তাঁহারা সমগ্র আসনসংখ্যার শতক ২৪টি, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে শতকরা ২৩·১৪টি, মাদ্রা শতকরা ১৬·৫৩ টি ও পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ১১·৭৬ টি আসন অধিকার করি

ইতিহাস

প্রথম নির্বাচনে সাফল্য

সমর্থ হইয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের একজন তরুণ কম্যুনিস্ট শ্রীরবিনারায়ণ রেড্ডি সমগ্র ভারতের মধ্যে সবচেয়ে শতকরা বেশি ভোট পাইয়া (৭৭%) নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি নির্বাচনের মাত্র ১৪ দিন পূর্বে জেল হইতে খালাস পাইয়াছিলেন।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় নির্বাচনের ফলে কম্যুনিস্ট দলের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রথম নির্বাচনে তাঁহারা শতকরা ৬টি ভোট পাইয়াছিলেন, দ্বিতীয় নির্বাচনে উহা বাড়িয়া প্রায় ৯ টিতে দাঁড়াইয়াছিল। লোকসভায় তাঁহারা ২৭ টি আসন এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় ১৬২ টি আসন লাভ করিলেন। কেরলে ১২৬টি আসনের মধ্যে তাঁহারা ৬০টি, কংগ্রেস ৪৩টি ও প্রজা সোস্যালিস্ট দল ৯টি মাত্র আসন অধিকার করিলেন। কাজেই তাঁহারা কয়েকজন নির্দলীয় সদস্যের সাহায্যে কেরলে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিলেন। কিন্তু নানারূপ অত্যাচার ও অবিচারের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে জুলাই তথায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া নিজের হাতে শাসনভার লইয়াছিলেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনে কেরলে কম্যুনিস্টগণ মাত্র ২৭ টি আসন, কংগ্রেস ৬৩টি ও প্রজা-সোস্যালিস্টগণ ১৯টি আসন লাভ করেন। ফলে তথায় কংগ্রেস ও প্রজা-সোস্যালিস্টগণের কোয়ালিশন শাসন প্রবর্তিত হয়।

দ্বিতীয় নির্বাচনে সাফল্য

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় নির্বাচনের পূর্বে কম্যুনিস্ট দল নিম্নলিখিতরূপ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করে। কংগ্রেস দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। জাতিসংঘের অনুসন্ধানের বিবরণীতে দেখা যায় যে ভারত ইরাক, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি অনুন্নত দেশগুলিরও পিছনে পড়িয়া আছে। তাছাড়া, যে সামান্য কিছু জাতীয় আয় বাড়িয়াছে তাহা বণ্টননীতির ত্রুটির জন্য ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বেকারি বাড়িতেছে, মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঐশ্বর্য বাড়িতেছে। ১৪ বছরে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে না পারাটাই সম্ভবতঃ কংগ্রেসের কৃষিনীতির বিরুদ্ধে তীব্রতম ধিক্কার। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভকালে বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ, তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতে ইহা ৯০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

নির্বাচনী ইস্তাহার

জনসংঘ, হিন্দুমহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, মুসলিম লীগ, জমিয়েত-ই-

ইসলামি ও অকালী দলের মতন সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি পূর্বাপেক্ষা বেশি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণের মনে যে বিক্ষোভ রহিয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে চায় স্বতন্ত্র পার্টি ও এই সাম্প্রদায়িক দলগুলি। কম্যুনিস্ট পার্টি এই শক্তিগুলিকে চরম দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া মনে করে।

সাম্প্রদায়িক নিন্দা

জাতীয় অর্থনীতি হইতে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং বিদেশীদের সম্পত্তির উপর অধিকতর কর বসাইতে হইবে। বৈদেশিক বাণিজ্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়, সাধারণ বীমা, লোহা ও ইস্পাত, কয়লা ও অন্যান্য খনিজপদার্থ, তৈল, চিনি, পাট, চা-বাগান প্রভৃতি বিদেশী নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পের এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জাতীয়করণ চাই। ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

আর্থিক নীতি

রাজ্যপালগণকে প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিতে হইবে। বিধানসভার আস্থাভাজন কোন রাজ্য সরকারকে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি বরখাস্ত না করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাজ্য-গুলিকে আরও বেশি ক্ষমতা দিতে হইবে। কলিকাতার পৌরনির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের অধিকার চাই।

রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার দাবি

কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁহাদের ইস্তাহারের শেষে বলে যে, তাঁহারা নির্বাচনেসংখ্যা-গরিষ্ঠ দল হইলে কি কি কাজ করিবেন তাহার তালিকা তাঁহারা দিতেছেন না—কেবল কি কি নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় তাহার কথা বলিতেছেন (The programme we place before the people is not just a catalogue of things we shall do if people put us in power. It is a programme of unity and action. It is a programme on whose basis all patriotic and democratic forces in our country can unite)। ইহার মধ্যে যেন একটা হতাশার সুর লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই যেন "তদা বিজয়ায় নাশংসে সঞ্জয়" ধরনের মনোভাব এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। কম্যুনিস্ট দল একক তো কংগ্রেসকে হটাইয়া

লাভ করিতে পারিবেনই না—অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের সহযোগিতায় উহা সম্ভব হইবে বলিয়াও তাঁহাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল না।

কম্যুনিস্ট দলের অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের পক্ষে বিকল্প সরকার স্থাপন করা সম্ভব হইবে। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা সফল হয় নাই। দ্বিতীয় নির্বাচনের পরে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ৪৬টি আসন পাইয়াছিলেন, তৃতীয় নির্বাচনের পর উহা ৫০টি হইয়াছে। লোকসভায় তাঁহাদের সদস্য সংখ্যা ২৭ হইতে ২৯ হইয়াছে। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান ও মহীশূর রাজ্যের বিধানসভায় কম্যুনিস্ট সদস্যের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু গুজরাতের মতন রাজ্যে লোকসভার নির্বাচনে তাঁহারা একটি আসনও পান নাই। মহারাষ্ট্র, আসাম ও মাদ্রাজে তাঁহাদের প্রভাব ক্ষীণতর হইয়াছে।

তৃতীয় নির্বাচনের সাফল্য

চীনের আক্রমণের পর হইতে কম্যুনিস্টদের প্রভাব খুব হ্রাস পাইয়াছে। তবে কম্যুনিস্ট দলে বহু আদর্শবাদী যুবক যোগ দিয়াছেন। তাঁহারা কোন প্রকার স্বার্থের খাতিরে দলের প্রতি অনুরক্ত হন নাই। তাঁহাদের সংগঠন শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে কোন প্রকার অজুহাতে তাঁহারা যে শ্রমিকদিগকে ও ছাত্রসমাজকে শান্তিভঙ্গ করিতে উৎসাহ দেন ইহাতে শান্তিপ্রিয় লোকেরা তাঁহাদের প্রতি অপ্রসন্ন হন।

বর্তমান অবস্থা

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল : কংগ্রেসের ভিতর একদল তরুণ সমাজতন্ত্রবাদে আস্থাশীল ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু ও জয়প্রকাশ নারায়ণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে সমাজতন্ত্রীদল (Socialist Party) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে নেহরুজী দক্ষিণদিকে ও জয়প্রকাশ নারায়ণ বামদিকে ঘেঁষিতে থাকেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া যান। আচার্য নরেন্দ্র দেব ইঁহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ইঁহারা গ্রামে গ্রামে কাজ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আচার্য কৃপালনীও কংগ্রেস হইতে বাহিরে আসিয়া কৃষক মজদুর প্রজাদল স্থাপন করেন। ইঁহারা গান্ধীজীর অকৃত্রিম শিষ্য বলিয়া নিজেদের পরিচিত করেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রী দলের সহিত ইঁহাদের নীতিগত বিশেষ বিরোধ ছিল না। উত্তরপ্রদেশের

ইতিহাস

জনপ্রিয় নেতা রফি আহম্মদ কিদওয়াই প্রথমে ইঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম নির্বাচনের পূর্বেই তিনি আবার কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও অনেকে পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ফলে কৃষক মজদুর প্রজাদলের শক্তি অনেক হ্রাস পাইল। প্রথম নির্বাচনের পরে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সমাজতন্ত্রীদলের সহিত কৃষক মজদুর প্রজাদল সম্মিলিত হইয়া প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিলেন।

প্রথম নির্বাচনের পর লোকসভায় প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ২২জন সদস্য ছিলেন। তাঁহারা কম্যুনিস্টদের অপেক্ষা তিন গুণ (৫৮ লক্ষ কম্যুনিস্ট ভোটের স্থলে ইঁহারা ১,৬৬ লক্ষ ভোট) পাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহারা লোকসভায় কম্যুনিস্টদের চেয়ে ৫টি আসন কম পাইয়াছিলেন। এরূপ হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা নিজেদের শক্তি না বুঝিয়া ৪৩২টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়াছিলেন, আর কম্যুনিস্টরা মাত্র ৭০টি ক্ষেত্রে প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভায় প্রজা-সমাজতন্ত্রীরা ২১৩৮ জন প্রার্থী দাঁড় করাইয়া মাত্র ২০৪ জনকে কৃতকার্য করিতে পারিয়াছিলেন। মাদ্রাজে ইঁহারা ৫০টি আসন পাইয়াছিলেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে নির্বাচনের ফলে প্রজা সমাজতন্ত্রীরা ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যে মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রিত্ব কিন্তু এক বৎসরের বেশি টেঁকে নাই।

প্রথম নির্বাচন

দ্বিতীয় নির্বাচনে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল লোকসভায় ১৯টি ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় ১৯৬টি আসন অধিকার করেন। এবারে মাদ্রাজে তাঁহাদের সদস্য সংখ্যা মাত্র ২জন হইল। উত্তর প্রদেশে ৪৪, বোম্বাইতে ৩৭, বিহারে ৩১, পশ্চিমবঙ্গে ২১ ও মহীশূরে ১৮টি আসন তাঁহারা লাভ করেন। ভোটের দিক দিয়া দেখিতে গেলে কংগ্রেস শতকরা ৪৩·৩টি, প্রজাসমাজতন্ত্রীরা ১০·১টি, কম্যুনিস্টরা ৮·৮টি ও জনসংঘ ৩·১টি ভোট পান। কিন্তু ভোটের তুলনায় প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের অধিকৃত আসন কম ছিল।

দ্বিতীয় নির্বাচন

প্রজাসমাজতন্ত্রী দল তৃতীয় নির্বাচনের পূর্বে ইস্তাহারে কংগ্রেসকে নানা দিক দিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহারা যে বিকল্প শাসন গড়িয়া তুলিতে পারিবেন এমন আশ্বাস দেন নাই। তাঁহারা শুধু এইটুকু দাবি করিয়াছিলেন যে, একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা প্রয়োজন। তাঁহারা কংগ্রেসের পররাষ্ট্র-নীতির সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ভারতের সুবিস্তৃত এলাকা পাকিস্তান, চীন ও পর্তুগালের অধিকারে রহিয়াছে। অকর্মণ্য সরকারী

নির্বাচনী ইস্তাহার

নেতৃত্বের ফলে ভারতবাসীকে অপমানের বোঝা বহিতে হইতেছে। ক্রমান্বয়ে মূল্যবৃদ্ধি ও বৈষম্যমূলক করনীতি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানকে নিম্নমুখী করিয়াছে। এই দল সুচিন্তিত করনীতি ও মুদ্রানীতি অবলম্বন করিয়া মূল্যস্তরের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখিতে চাহেন। ইঁহারা জেলার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা, কৃষকদের সস্তায় কৃষিঋণ দিবার ও শস্যবীমা করিবার পক্ষপাতী। অস্ত্র আইন বাতিল করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। চীনা অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চল অবিলম্বে পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই দল মৌলিক শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে চাহে। কিন্তু ছোটখাট ও মাঝারি আকারের শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখা এই দলের ইচ্ছা।

সংগঠন

ইঁহারা দেশের মধ্যে ২২টি প্রাদেশিক সমিতি, চারি শত জেলা সমিতি ও প্রায় দুই হাজার শাখা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। জনপ্রিয় অথচ জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রদীপ্ত কয়েকজন নেতা এই দলে আছেন। তাহা সত্ত্বেও তৃতীয় নির্বাচনে ইঁহারা মোটেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। লোকসভায় ইঁহাদের অধিকৃত আসনের সংখ্যা ১৯ হইতে কমিয়া ১২তে দাঁড়াইল। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় ইঁহারা মাত্র ১৭৯টি আসন পাইলেন। অন্ধ্র, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে ইঁহারা একটি ক্ষেত্রেও জয় লাভ করিতে পারিলেন না। রাজস্থানে মাত্র দুইটি আসন লাভ করিলেন। উত্তরপ্রদেশে

তৃতীয় নির্বাচনে সাফল্য

৩৮জন; মধ্যপ্রদেশে ৩৩, বিহারে ২৯, মহীশূরে ২০, কেরলে ১৯ ও পশ্চিমবঙ্গে ৫জন বিধানসভার সদস্য এই দল হইতে নির্বাচিত হইলেন। এই দলের নেতাদের মধ্যে অশোক মেহতা ও ত্রিলোকী সিংহ নির্বাচনে পরাজিত হইলেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রামমনোহর লোহিয়া প্রজাসোস্যালিস্ট দল হইতে বাহিরে আসিয়া একটি নূতন সোস্যালিস্ট পার্টি স্থাপন করেন। ইহা প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। তৃতীয় নির্বাচনে এই দল লোকসভায় পাঁচটি আসন অধিকার করিল বটে, কিন্তু স্বয়ং লোহিয়াজী পরাজিত হইলেন। ইঁহারা উত্তর প্রদেশে ২৪টি, মধ্যপ্রদেশে ১৪টি ও বিহারে ৭টি আসন লাভ করেন। সম্প্রতি প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সহিত লোহিয়াপন্থী সমাজতন্ত্রী দলের একীভূত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভারতীয় জনসংঘ : জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রথমে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন কংগ্রেস কয়েকটি প্রদেশে শাসনভার পাইয়াছিলেন, তখন কোন কোন হিন্দুর মনে আশঙ্কা জাগিয়াছিল যে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে তুষ্ট করিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র এবং সেইজন্য কংগ্রেসের হাতে হিন্দুদের স্বার্থ হয়তো সুরক্ষিত থাকিবে না। তাই বিপ্লবীনেতা ভি. ডি সভারকার ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ঐ দল বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের সদস্যপদ প্রদান করেন। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য অনেক সদস্য ধৃত হন। সেই সময়ে কংগ্রেস মহলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগের দাবি উঠিয়াছিল। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার ন্যায় কর্মদক্ষ সহযোগীকে ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ক্যাবিনেটের সদস্য রহিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতি তোষননীতি ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের প্রতি সরকারী কার্যপদ্ধতি লইয়া তাঁহার সহিত নেহরুজীর প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে তিনি ক্যাবিনেটের সদস্যপদে ইস্তাফা দেন। তিনি হিন্দুমহাসভার মতন সাম্প্রদায়িক নামযুক্ত প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া না যাইয়া জনসংঘ স্থাপন করিলেন।

ইতিহাস

প্রথম নির্বাচনের কয়েক মাস মাত্র পূর্বে এই দল স্থাপিত হইলেও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ইহা অসামান্য সাফল্য লাভ করিল। লোকসভার নির্বাচনে ইহা শতকরা তিনটির বেশি ভোট পাইল, কিন্তু অনেকগুলি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মাত্র তিনটি আসন দখল করিতে পারিল। রাজ্যের বিধানসভাগুলির নির্বাচনে জনসংঘ ৩৩টি আসন লাভ করেন। লোকসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ একাই একশত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে কংগ্রেসপক্ষ সন্ত্রস্ত থাকিতেন। কিন্তু ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করিলে জম্মু ও কাশ্মীরের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সেখ আবদুল্লা তাঁহাকে বন্দী করেন। গ্রেপ্তার হইবার দুই মাসের মধ্যে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে জনসংঘের খুব ক্ষতি হইলেও ঐ দল ভাজিয়া পড়ে নাই। দ্বিতীয় নির্বাচনে জনসংঘ লোকসভায়

নির্বাচনে সাফল্য

৪৭৮ এবং রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে ৪৬টি আসন লাভ করে। তন্মধ্যে উত্তর প্রদেশে ১৭, মধ্যপ্রদেশে ১০, পাঞ্জাবে ৯ ও রাজস্থানে ৬ জন সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে জনসংঘ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

তৃতীয় নির্বাচনের পূর্বে জনসংঘের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয় যে, সীমান্তের নিরাপত্তার ব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থায় উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ দূর করা, বেকারি নাশ, মূল্যমান স্থির রাখা বিশেষ প্রয়োজন। জনসংঘ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নততর করার প্রতি বিশেষ জোর দেয়। জনসংঘ সংঘাত্মক শাসন অপেক্ষা কেন্দ্রের দ্বারা শাসন স্থাপনের পক্ষপাতী; অথচ রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও চাহে। সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তাঁহারা দেখিতে চান, সেইজন্য সংবিধানের ৩৭০ ধারা (যদ্বারা জম্মু ও কাশ্মীর সম্বন্ধে সংসদের আইন করিবার ক্ষমতাকে সীমিত করা হইয়াছে) তাঁহারা বাতিল করিয়া দিতে চান। জনসংঘ বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণভাবে শাসনবিভাগ হইতে পৃথক করিবেন, অবৈতনিক বিচারকের পদ রদ করিবেন এবং নিবর্তনমূলক আটক আইন উঠাইয়া দিবেন। আর্থিক যোজনায় কৃষিকে প্রথম স্থান দেওয়া হইবে এবং ছোট শিল্প ও ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হইবে। জনসংঘ বৃহৎ শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের পক্ষপাতী। তবে জনসংঘ চায় যে চা, কফি, রবার, খনি, দেশলাই, শস্যাদির তৈল, তামাক ও সাবান শিল্পের জাতীয়করণ হউক। জনসংঘ জোট-নিরপেক্ষ নীতি মানে। তিব্বতের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষা করা ভারতের কর্তব্য বলিয়া জনসংঘ মনে করে।

কার্যনীতি

তৃতীয় নির্বাচনে জনসংঘ আরও অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। লোকসভায় ১৪টি আসন পাইয়াছে। উত্তর প্রদেশের বিধানসভায় ৪৯টি, মধ্যপ্রদেশের বিধানসভায় ৪১টি আসন লাভ করিয়া জনসংঘ ঐ দুই রাজ্যের বিরোধী দলের (Opposition Party) মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রাজস্থানে ঐ দল ১৫টি, পাঞ্জাবে ৮টি ও বিহারে তিনটি আসন পাইয়াছে।

তৃতীয় নির্বাচন

স্বতন্ত্র দল: ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কংগ্রেসের নীতি ও পদ্ধতির বিরোধিতা করিবার জন্য স্বতন্ত্র দল সংগঠিত হয়। কংগ্রেসের সুপ্রসিদ্ধ নেতা চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, অধ্যাপক রঙ্গ, শ্রীযুক্ত মাসানি, শ্রীযুক্ত কে. এম. মুন্সী এবং বিহারের জনতা পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত কামাখ্যা সিংহ প্রভৃতির সহযোগিতায় এই দল স্থাপন করেন। কংগ্রেস যে ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে শিল্পবাণিজ্যের

উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করিতেছে, ইঁহারা তাহা পছন্দ করেন না। ইঁহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চাহেন। সেইজন্য কংগ্রেসী দল তাঁহাদিগকে শুধু সংরক্ষণশীল নহে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন। তৃতীয় নির্বাচনের পূর্বেই বিহারের জনতাপার্টি স্বতন্ত্র দলের সহিত এক হইয়া যায়। নির্বাচনের পর উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদও স্বতন্ত্র দলের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দেয়। গণতন্ত্রপরিষদের প্রধান প্রধান নেতারা হইতেছেন উড়িষ্যার প্রাক্তন রাজন্যবর্গ। জনতা পার্টির নায়ক হইতেছেন রামগড়ের রাজা বাহাদুর। ইঁহাদের পয়সার অভাব নাই। তাহার উপর আবার বড় বড় কয়েকজন শিল্পপতি ইঁহাদের দলে প্রচুর চাঁদা দিয়াছেন। একদিকে ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীর কলমের জোর ও বক্তৃতার প্রভাব, অন্যদিকে প্রচুর আর্থিক শক্তি স্বতন্ত্র দলকে অতি অল্পদিনের মধ্যে একটি প্রভাবশালী সর্বভারতীয় দলে পরিণত করিয়াছে। এই দল লোকসভায় ১৮টি আসন পাওয়ায় দ্বিতীয় প্রধান বিরোধী দল হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভায় স্বতন্ত্র দল ১৭০টি আসন পাইয়াছে। তন্মধ্যে বিহারে ৫০টি, গুজরাতে ২৬টি ও রাজস্থানে ৩৬টি আসন লাভ করায় এইদল ঐ তিনটি রাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পাইয়াছে। উড়িষ্যাতেও গণতন্ত্রপরিষদ স্বতন্ত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সেখানে ঐ দলের হাতে বিরোধী দলের নেতৃত্ব আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র দল কোন আসন পান নাই, কিন্তু অন্ধ্রে ১৯টি, উত্তর প্রদেশ ১৫টি ও মহীশূরে ৯টি আসন পাইয়াছে।

সাফল্যের কারণ

তৃতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্বতন্ত্র দল নিম্নলিখিতরূপ ইস্তাহার প্রচার করে। স্বতন্ত্র পার্টি একটি সৎ ও শক্তিশালী বিরোধী দলরূপে কার্য করিতে চাহে। "প্রজাসমাজতন্ত্রী দল অথবা পঞ্চমবাহিনীরূপী কম্যুনিস্ট দল বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেনি, পারবেও না। গত ২৪ বৎসরে যাহা কিছু হইয়াছে তাহার জন্য কংগ্রেস দলের বিশেষ কৃতিত্ব নাই; ক্ষমতায় আসীন যে কোন সরকার এগুলি করিতে বাধ্য। কংগ্রেস দলের শাসন লাইসেন্স পারমিটের রাজত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; দেশের সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দলের কুক্ষিগত করা হইতেছে। চরম দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। স্বতন্ত্র দলের আদর্শ মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা; ন্যূনতম শাসনই শ্রেষ্ঠ শাসন।" স্বতন্ত্র দল রাষ্ট্র পরিচালিত যৌথ কৃষি ব্যবস্থার বিরোধী। তাঁহারা শিল্পের জাতীয়করণের বিরুদ্ধে। তাঁহাদের মতে,

নির্বাচনী ইস্তাহার

শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা নিয়ন্ত্রণ মাত্র করা, সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা নহে। স্বতন্ত্র দল সকল রকম একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে। সেইজন্য সরকারী ব্যবসা সংস্থার (State Trading Corporation) মতন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের অবসান ঘটানো এই দলের অভিপ্রায়। তাঁহারা পরিকল্পনা কমিসন ভাঙ্গিয়া দিয়া সংসদের উপর পরিকল্পনা রচনার ভার ন্যস্ত করিবার পক্ষপাতী। আভ্যন্তরীণ বাজারকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহারা রপ্তানি করিতে চাহেন না। চীনকে ভারতভূমি ত্যাগে বাধ্য করিতে ও চীন সম্পর্কে কঠোর নীতি গ্রহণ করিতে স্বতন্ত্র দল বদ্ধপরিকর।

হিন্দু মহাসভা: পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বীর সভারকার ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভা স্থাপন করেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভার প্রায় তিন লক্ষ সভ্য ছিল। তৃতীয় নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা লোকসভায় মাত্র একটি আসন, উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় দুইটি ও মধ্যপ্রদেশের বিধানসভায় ছয়টি আসন লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের রাজনৈতিক প্রভাব অকিঞ্চিৎকর হইলেও ইঁহাদের ঘোষিত ইস্তাহারে এক বিশেষ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু আদর্শ রক্ষা করাই হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য। তাঁহারা দেশ ভাগ স্বীকার করেন না এবং অখণ্ড ভারত পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। তাঁহারা পাকিস্তান ও চীনা দস্যুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া জাতিকে শক্তিশালী করিতে চান। প্রত্যেক নাগরিককে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে; কেবলমাত্র দেশরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, অন্যান্য শিল্পের উপর যথাসম্ভব কম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হইবে। যেসব লোক ভারতে বসিয়া ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে এবং চীন, পাকিস্তান বা রাশিয়ার মঙ্গল কামনা করে, সেইসব পঞ্চমবাহিনীর উচ্ছেদ করা হইবে। হিন্দু মহাসভা গো হত্যা নিবারণ করিতে ও হিন্দুদের মন্দির পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প।

ইহার বৈশিষ্ট্য

দ্রাবিড় মুন্নেত্রে কাজাগম্ (Dravida Munnetra Kazhagam): দ্বিতীয় নির্বাচনের কিছু পূর্বে এই দলটি মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দল একদিকে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের প্রাধান্যের বিরোধী, অন্যদিকে উত্তর ভারত যে দক্ষিণ ভারতের উপর সর্দারি করিবে ইহা বরদাস্ত করিতে পারে না। ইঁহারা তামিলভাষাভাষী অঞ্চলগুলিকে ভারত হইতে বাহির করিয়া লইয়া এক স্বতন্ত্র দ্রাবিড়ীস্তান স্থাপন করিতে চাহেন।

উগ্র প্রাদেশিকতা

ভারতবর্ষে যে কত দূর পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা বর্তমান, তাহা এই দলকে প্রচারকার্য চালাইবার স্বাধীনতা দেওয়া হইতে বুঝা যায়। পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্র এইভাবে রাষ্ট্রের সর্বভৌমিকতা নষ্ট করিবার প্রচেষ্টা সহ্য করে না। দ্বিতীয় নির্বাচনের পর এই দল লোকসভায় ২টি ও মাদ্রাজ বিধানসভায় ১৫টি আসন লাভ করে ও মাদ্রাজে দ্বিতীয় প্রধান বিরোধী দল হয়। তৃতীয় নির্বাচনে ইঁহারা মাদ্রাজ বিধানসভায় ৫০টি আসন অধিকার করিয়া প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পাইয়াছেন। ইঁহাদের সাফল্য দেখিয়া সম্প্রতি (১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে) সংবিধানের উনবিংশ ধারা সংশোধন করিয়া ভারত হইতে কোন অংশকে স্বতন্ত্র করিয়া লইবার প্রস্তাবকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার কথা চলিতেছে।

অন্যান্য দল : উপরে বর্ণিত দলগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসীয় ও রুইকার পন্থী), রামরাজ্য পরিষদ, মুসলিম লীগ, তপশিলী জাতি সংঘ (The Scheduled Castes Federation), পাঞ্জাবের অকালী দল, বিহারের ঝাড়খণ্ড দল, মহারাষ্ট্রের কৃষক ও শ্রমিক দল (The Peasants and Workers Party), উত্তর প্রদেশের Republican Party of India-র নাম উল্লেখযোগ্য।

ফরওয়ার্ড ব্লক : ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্তৃক ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। লোকসভার প্রথম নির্বাচনের সময় ইঁহারা প্রায় দশ লক্ষ ভোট পাইয়াছিলেন, কিন্তু আসন একটির বেশি পান নাই। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় ইঁহারা ১৮টি আসন লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে নির্বাচনী ইস্তাহারে, রাজ্যসভা ও বিধানপরিষদগুলির বিলোপ সাধন, Recall প্রথার প্রবর্তন, ব্যাঙ্ক ও বীমার এবং মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ, বৈদেশিক বাণিজ্যের জাতীয়করণ, বেকারি ভাতা প্রদান প্রভৃতি দাবি করেন। লোকসভার তৃতীয় নির্বাচনে ইঁহারা পশ্চিমবঙ্গ হইতে একটি ও মাদ্রাজ হইতে একটি আসন লাভ করেন। মাদ্রাজের বিধানসভায় এই দল ৩টি ও পশ্চিম বঙ্গের বিধানসভায় ১৩টি আসন পাইয়াছেন।

ফরওয়ার্ড ব্লক

রামরাজ্যপরিষদ মূলতঃ হিন্দুদের দল। প্রথম নির্বাচনের সময় বিধানসভায়

জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই দল প্রায় ১২ লক্ষের উপর ভোট পাইয়াছিলেন এবং ৩৪২টি আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করাইয়া মাত্র ৩২ জনকে কৃতকার্য করিতে পারিয়াছিলেন। তৃতীয় নির্বাচনে ইঁহারা মধ্যপ্রদেশের বিধানসভায় দশটি ও রাজস্থানে তিনটি আসন অধিকার করিতে পারিয়াছেন।

রামরাজ্য পরিষদ্

মুসলিম লীগ দল হিসাবে স্বাধীন ভারতে কেবলমাত্র কেরল রাজ্যে বর্তমান আছে। প্রথম নির্বাচনের সময় এই দল লোকসভায় একটি ও বিধানসভায় পাঁচটি আসন পান। দ্বিতীয় নির্বাচনের সময় ইঁহারা কেবলমাত্র কেরল বিধানসভায় ৮টি আসন পান। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ১১ হয়। ইঁহাদের সহায়তা লইয়া কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিয়াছিল।

মুসলিম লীগ

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ডাঃ আম্বেদকর তপশিলী জাতিসংঘ স্থাপন করেন। ইহার মুখপাত্র রূপে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি বড়লাটের Executive Councilএর সদস্য হন এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। তারপর তপশিলী জাতীদের নেতারূপে তিনি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে নেহেরু কেবিনেটে স্থান পান। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি নেহরুজীর সহিত মতানৈক্য বশতঃ পদত্যাগ করেন। প্রথম নির্বাচনের সময় তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু বোম্বাই বিধানসভা হইতে রাজ্যসভার সদস্যপদ পান। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দল লোকসভায় ২টি ও বিভিন্ন বিধানসভায় ১৩টি আসন অধিকার করেন। দ্বিতীয় নির্বাচনে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৬ ও ১৭ হইয়াছিল। তৃতীয় নির্বাচনে ইঁহারা কোন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

তপশিলী জাতিসংঘ

তৃতীয় নির্বাচনে অকালী দল পাঞ্জাবের বিধানসভায় ১৯টি আসন পাইয়া প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পাইয়াছেন। ইঁহারা লোকসভাতেও তিনটি আসন লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা পাঞ্জাবী ভাষাভাষী এক স্বতন্ত্র সুবা দাবি করেন।

অকালী দল

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি বামপন্থী দল—কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (R. S. P), বলশেভিক পার্টি, ভারতের বিপ্লবী কম্যুনিস্ট পার্টি (শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের Revolutionary Communist Party of India) ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক একত্রে মিলিত

হইয়া সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠন করেন। ইঁহারা ইস্তাহারে বলেন যে, সরকারী তথ্য হইতে দেখা যায় যে ধনিক শ্রেণীর উপর তলার শতকরা ২০ ভাগ লোক জাতীয় আয়ের অর্ধেক আত্মসাৎ করেন। অথচ সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোকের মাসে ১৪ টাকা ৬ নয়া পয়সাও ব্যয় করার সামর্থ্য নাই। এই সংযুক্ত দল আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে হটাইয়া মন্ত্রিত্ব দখল করিতে পারিবেন। কিন্তু ইঁহারা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ২৫২টি আসনের মধ্যে মাত্র ৮১টি আসন অধিকার করিতে সমর্থ হন। লোকসভায় ইঁহারা ৩৬টি আসনের মধ্যে ১২টি আসন লাভ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের সংযুক্ত বামপন্থী দল

ভারতীয় রাজনীতিতে বিরোধীদলের ভূমিকা (Role of the Opposition in the Indian Politics) : সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বিরোধী-দল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। যে দল ক্ষমতার আসনে অবস্থিত আছেন তাঁহাদের ভুল ত্রুটি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়া তাঁহাদের জনপ্রিয়তা নষ্ট করিবার চেষ্টায় বিরোধী দল সর্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁহাদের আশা থাকে যে, ঐ দল প্রভাব প্রতিপত্তি হারাইলে বিরোধী দল শাসনক্ষমতা হাতে পাইবেন। কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিবার সময় স্মরণ রাখেন না যে তাঁহারা ক্ষমতার আসনে আসীন হইলে কি করিতেন। ভারতবর্ষে এরূপ অবস্থা সম্ভব হয় নাই। কেননা বিরোধী দল সংখ্যায় সরকারী দলের তুলনায় এত মুষ্টিমেয় যে, তাঁহাদের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতা অধিকার করিবার আশা নিতান্ত অল্প। তাঁহারা জানেন যে, পরের নির্বাচনে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদলে পরিণত হইতে পারিবেন না। সেইজন্য তাঁহারা অনেক অবাস্তব বিষয় লইয়া, কেবল বিরোধিতা করিবার খাতিরেই বিরোধিতা করেন। কখনো কখনো তাঁহারা এমন হল্লা ও গোল-মাল করেন যে, আইনসভায় কাজ চালানো অসম্ভব হয়। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বিরোধী দলের অনেক সদস্য বিশেষ করিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়া থাকেন এবং মন্ত্রীরা উহা অসাধারণ ঔদার্যের সহিত গ্রহণ করেন। বিধানপরিষদ ও রাজ্যসভার বিতর্কে ও আলোচনায় বিরোধী দলের নেতারা সবিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া থাকেন।

বিরোধীদলের বিরোধিতা ও পরামর্শ

এ দেশের বিরোধীদল কথায় কথায় **Adjournment Motion** বা সভা মুলতুবি রাখিবার প্রস্তাব তোলেন। প্রায়ই স্পীকার মহোদয় ঐরূপ প্রস্তাব উঠাইতে

দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। যখন ঐরূপ মুলতুবি প্রস্তাব উঠাইতে দেওয়া হয়, তখনও উহা পাস হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, কেননা সরকারী দলের সকল সদস্য উহার বিপক্ষে ভোট দেন। এ কথা জানিয়া শুনিয়াও বিরোধী দল মুলতুবি প্রস্তাব উঠাইয়া থাকেন। কারণ ঐ অবসরে তাঁহারা গায়ের ঝাল মিটাইয়া সরকারকে গালি দিতে পারেন। কখনো কখনো মুলতুবি প্রস্তাব তোলা লইয়া গভীর সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকসভায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী নোটিশ দেন যে তাঁহারা কলিকাতায় ধর্মঘটকারী শিক্ষকদের প্রতি পুলিসের বলপ্রয়োগের জন্য মুলতুবিপ্রস্তাব আনিতে চান। স্পীকার মহোদয় উহা অনুমোদন করেন না; কিন্তু রাজ্যসভাতে ঠিক ঐ বিষয়েই একটি প্রস্তাব উঠিলে তাহা আলোচিত হইবার অনুমতি পায়। এইজন্য ডাঃ লঙ্কাসুন্দরম্ লোকসভায় এই বলিয়া মুলতুবি প্রস্তাব উঠাইতে চাহেন যে একই বিষয়ে এক সদনে আলোচনার জন্য অনুমোদিত হইল অন্য সদনে হইল না কেন। অবশ্যই তাঁহার এই প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইলে অগ্রাহ্য হয়।

মুলতুবি প্রস্তাব

বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব (Censure motion) প্রায়শঃই আনিয়া থাকেন। কিন্তু বলা বাহুল্য এ ধরনের প্রস্তাব পাস হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না—কেননা সরকারের হাতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা, বিরোধী দলে মাত্র কয়েকজন সদস্য।

অনাস্থা প্রস্তাব

বিরোধী দলের সব চেয়ে প্রিয় কার্য হইতেছে Walkout বা সদনত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যাওয়া। যখনই তাঁহারা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন, তখনই তাঁহারা সভা ছাড়িয়া সদলবলে চলিয়া যান। বিরোধী দলকে সরকারী কাজের বিরোধিতা করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছে—তাঁহারা বিরোধিতা না করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাঁহাদের কর্তব্য কতদূর সম্পন্ন হয় তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ছড়ার গানে আছে—

সদন-ত্যাগ

"এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন
আর এক কন্যা খান
আর কন্যে রাগ করে বাপের বাড়ী যান"।

স্থায়ী কর্মচারীরা রাঁধা বাড়া করেন, মন্ত্রীরা ও তাঁহাদের দলের সদস্যেরা আনন্দ করিয়া খাওয়া দাওয়া করেন, আর বিরোধী দলের সদস্যেরা ঘন ঘন রাগ করিয়া

বাপের বাড়ি যান। কিন্তু মন্ত্রীরা বশীভূত স্বামীর মতন ইহাতে ভয় পান না।

ভারতীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন স্বার্থের চাপ (Pressure of Interest Groups in Indian Politics) : পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের বাহিরে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার স্বার্থসংরক্ষণের জন্য নানারূপ প্রতিষ্ঠান আছে। তাঁহারা সরকার, আইনসভা ও সরকারী কর্মচারীদিগকে এবং সকলের উপরে জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করেন। ভারতে অনুরূপ কোন সংগঠন আছে কিনা সে বিষয়ে কোন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিবিদ্ আজ পর্যন্ত কোন গবেষণা করেন নাই। কিন্তু বিদেশী অধ্যাপক Myron Weiner Indian Pressure Groups সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ, আমেরিকার Vanderbit বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বার্ণার্ড ই ব্রাউন "Organized Business in Indian Polities" এবং শ্রীযুক্ত Richard Z. Kozicki "Indian Interest Groups and Indian Foreign Policy" নামক প্রবন্ধ ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পত্রিকায় (The Indian Journal of Political Science) প্রকাশ করিয়াছেন।

দেশের বিভিন্ন স্বার্থ

শিল্প ও বাণিজ্যের ধনী মালিকগণ তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রথমে সংঘবদ্ধ হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় Chamber of Commerce প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এবং উক্ত সংস্থা আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা ভারতে ইউরোপীয় বণিক ও শিল্পপতিদের সরকারের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়া স্থির করেন যে তাঁহারা ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে লইয়া Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry স্থাপন করিবেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার সহিত Bengal National Chamber of Commerce, বোম্বাইয়ের Indian Merchants' Chamber, ও মাদ্রাজের Southern Indian Chamber of Commerce-এর মতন ১৩৭টি প্রতিষ্ঠান শাখা হিসাবে সংযুক্ত আছে। বোম্বাইয়ের চেম্বার অব কমার্সের আধায় তিন হাজারটি সদস্য প্রতিষ্ঠান আছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব হইতে এই

শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সংগঠন

ফেডারেশন কর নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ, রেলের ভাড়া, শ্রমিকদের সম্বন্ধে আইন কানুন তৈয়ারি প্রভৃতি বিষয় লইয়া সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী ইহার বার্ষিক সম্মেলন উদ্ঘাটন করেন। স্বাধীনতালাভের পর হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু ঐ কার্য সম্পাদন করিতেছেন। ফেডারেশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছে The All-India Organization of Industrial Employers। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। শ্রমিকদিগকে যাঁহারা চাকুরি দেন, তাঁহারা এরূপভাবে সংঘবদ্ধ, কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে অতবড় সংঘশক্তি এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে ফেডারেশনের এক প্রাসাদোপম কার্যালয় নির্মিত হইয়াছে। ইহাতে সভা করিবার মতন হল, লাইব্রেরী, গবেষণাগার প্রভৃতি আছে।

ইউরোপীয় বণিক ও শিল্পপতিরা ব্রিটিশ আমল হইতেই Associated Chambers of Commerce সংগঠন করিয়াছিলেন। স্বাধীনতালাভের পূর্বে ইঁহাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি অসামান্য ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে তাঁহাদের প্রভাব অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইঁহাদের বার্ষিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী বা বাণিজ্যমন্ত্রী অভিভাষণ দেন। এই প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কর্মকর্তাদের সহিত সরকারী মহলের বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। Employer's Federation of India ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট।

ছোট ছোট শিল্পগুলির স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের ভূতপূর্ব দেওয়ান স্যার এম, বিশ্বেশ্বরায়া National Association of Manufacturers সংগঠন করেন। ইহার সহিত দুই সহস্রের অধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট আছে।

বড় বড় শিল্পপতিরা স্বাধীনতালাভের অনেক আগে হইতেই কংগ্রেসকে মোটারকম আর্থিক সাহায্য দিতেন। দেশভক্তির সহিত ব্যবসাবুদ্ধিও ঐরূপ সাহায্য দিতে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিত। কংগ্রেস বিদেশী বর্জন করিয়া স্বদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিতেন। সুতরাং দেশী মিলের মালিকদের প্রচুর লাভ হইত। বিদেশী দ্রব্যাদি আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক স্থাপন করার দরুণও দেশী শিল্পপতিরা লাভবান হইতেন। স্বাধীনতালাভের পর কংগ্রেসের তহবিলে

চাপ দিবার বিভিন্ন প্রণালী

ইঁহাদের চাঁদার হার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় নির্বাচনের পূর্বে টাটাদের প্রতিষ্ঠানগুলি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় তহবিলে ছয় লক্ষ টাকা, বিহারের প্রাদেশিক কংগ্রেসকে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা ও উড়িষ্যার প্রাদেশিক কংগ্রেসকে এক লক্ষ টাকা চাঁদা দেয়। কোম্পানীর আইন বদলাইয়া যৌথকারবারগুলিকে রাজনৈতিক দলে চাঁদা দেওয়া আইনসঙ্গত করা হইয়াছে। মোটা হারে চাঁদা দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস শিল্প ও বাণিজ্যের উপর মোটা হারে নানারূপ কর বসাইয়াছেন বলিয়া একদল শিল্পপতি বিক্ষুব্ধ হইয়া স্বতন্ত্র দলকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কংগ্রেসকে টাকা দেওয়া বন্ধ করিবার হুমকিও দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বিড়লাদের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রতি অবিচল আনুগত্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য অনেক প্রাতষ্ঠান কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র দল উভয়কেই আর্থিক সাহায্য দিতেছে।

শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সংগঠনগুলি রাজনৈতিক দলের কৃতজ্ঞতার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকে না। তাহারা মন্ত্রীদের সহিত ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত দহরম মহরম রাখেন। সংসদের কোন কোন প্রভাবশালী সদস্য তাঁহাদের কার্যকরী সমিতির সভ্য। যাঁহারা তাঁহাদের সভ্য নহেন এমন সংসদের সদস্য-দিগকেও তাঁহারা পরোক্ষভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল করিতে চাহেন। আজকাল ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করা অপেক্ষা জনমতকে অনুকূল করিবার উদ্যম বেশি পরিলক্ষিত হয়। অনেক শিল্পপতি বড় বড় সংবাদ-পত্রের মালিকানা স্বত্ব খরিদ করিয়া লইয়াছেন। এই সব সংবাদপত্র সুকৌশলে প্রচার করিয়া তাঁহাদের উপর করভার যাহাতে বেশি না বাড়ে এবং তাঁহাদের মালিকানা স্বত্বের যাহাতে কোন হানি না হয়, তাহার চেষ্টা করে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন শিল্প-পতি মিলিত হইয়া The Forum for Free Enterprise নামক এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন পূর্বক জনমতকে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা সুশিক্ষিত অর্থনীতিবিদ্‌দিগকে নিযুক্ত করিয়া নানাবিধ পুস্তক পুস্তিকা লিখাইতেছেন, বক্তৃতা দেওয়াইতেছেন ও তাঁহাদের মতগুলি প্রচারের সুব্যবস্থা করিতেছেন। বাণিজ্য ও অর্থনীতির অনেক ছাত্র ও অধ্যাপকেরা শিল্পপতিদের আনুকূল্যে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকাদির উপর নির্ভর করেন।

জনমতকে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা

এইখানে বলা প্রয়োজন যে, পণ্ডিত নেহরু সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশকে

পুনর্গঠিত করিতে বদ্ধপরিকর বলিয়া শিল্পপতিদের প্রচারকার্য সবসময়ে ফলপ্রসূ হয় না। জীবনবীমাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সময়ে এত দ্রুতবেগে ঐ কার্য সম্পাদন করা হইয়াছিল যে, মালিকদের কোন চেষ্টাই উহাকে বাধা দিতে পারে নাই। এক আধজন বড় শিল্পপতি কারাদণ্ডও ভোগ করিতেছেন। তবে শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত সরকারী নীতি কিছুটা যে মালিকদের প্রচারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নও আজ বেশ সংঘবদ্ধ হইয়াছে। শ্রমিকদের নেতারা কিন্তু নিজেরা শ্রমিক নহেন। তথাপি তাঁহারা আন্দোলন করিয়া শ্রমিকদের স্বার্থ অনেকটা বজায় রাখিতেছেন। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে কোন সংঘ নাই এবং উহা গড়িয়া তোলাও খুব কঠিন কেননা তাঁহারা লাখে লাখে দেশের মধ্যে ছড়াইয়া আছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কৃষকেরা দুইচার হাজার একর জমির মালিক, তাই তাঁহাদের পক্ষে সংঘবদ্ধ হইয়া তথাকার সরকারের উপর চাপ দেওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষে বহু কৃষকের জমির পরিমাণ এক একরেরও কম। সরকার অবশ্য চেষ্টা করেন যাহাতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হঠাৎ কমিয়া না যায়। মুদ্রাস্ফীতি ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের সাধারণ ক্রেতাদের কোন সংঘশক্তি নাই, প্রচার চালাইবার উপযুক্ত কোন সংবাদ-পত্র তাঁহাদের হাতে নাই এবং সরকারী মহলে তাঁহাদের কোন প্রভাব নাই। কাজেই তাঁহাদিগকে সব সময়ে নেতা ও উপনেতাদের নিকট ক্রমাগত উপদেশ শুনিতে হয় যে, দেশের জন্য তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ করা কর্তব্য। মালিক ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইলেই অন্য সকলে খালিপেটে হাসিমুখে থাকিবে ইহাই হয়তো তাঁহারা আশা করেন।

শ্রমিক ও কৃষকদের প্রভাব কতটা কার্যকরী?

নির্দলীয় শাসনব্যবস্থা: ভারতবর্ষে নির্দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি বিভিন্ন মহল হইতে উঠানো হইয়াছে। দলগত শাসনপ্রথার নানাবিধ দোষ দেখাইয়া বিভিন্ন মনীষী বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে এমন গণতন্ত্র স্থাপন করা কর্তব্য যাহাতে দলাদলির কোন স্থান না থাকে।

বিপ্লবী নেতা এম, এন, রায় ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার New Humanism নামক গ্রন্থে বলেন যে, দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়। দলের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির নির্দেশে সকলকে চলিতে হয়। এই প্রথায় গণতন্ত্রের পরিবর্তে অভিজাততন্ত্র

সৃষ্টি হয়। যাঁহারা ক্ষমতা হাতে পান, তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত বা অন্যান্য উপায়ে ক্ষমতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। নির্বাচনের সময় তাঁহারা ধাপ্পা দিয়া কাজ উদ্ধার করেন। দলপ্রথা থাকার দরুণ জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে না। সেইজন্য তিনি স্থানীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শাসনযন্ত্র গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী। জনসাধারণ নিজেরা প্রার্থী মনোনীত করিবেন, নির্বাচিত প্রার্থীকে পদচ্যুত (Recall) করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিবে এবং আইনের প্রস্তাবসমূহ জনসাধারণের মতামত লইয়া (Referendum) পাস করানো হইবে। স্থানীয় গণতন্ত্রের হাতে যে সব ক্ষমতা দেওয়া যায় না, সেগুলি আপাততঃ একটি কেন্দ্রীয় পরিষদের হাতে দেওয়া উচিত। ঐ পরিষদ জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত, সচ্চরিত্র ও সাধু-প্রকৃতির লোকদের দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত এবং অর্থনীতিবিদ্, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি পেশার লোকেরা উহার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন।

সর্বোদয় সমাজের নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে দলপ্রথার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সত্য ও বিবেকের অনুশাসনের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থই দলের লোকের কাছে বড় করিয়া দেখা দেয়। তাহারা ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা অধিকার করিতে চায়। জাতিতে জাতিতে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তাহারা বিরোধ বাধাইয়া দেয়। ভেড়ার দলকে মেষচালক নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া যেমন নিরর্থক, তেমনি জনসাধারণকে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া অর্থহীন। সুতরাং তিনি আধুনিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে প্রত্যেক গ্রামে গণতন্ত্র স্থাপনের পক্ষপাতী। তাহারা নিজেদের মধ্যে নির্বিবাদে বসবাস করিতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণও অনুরূপ মতবাদ সমর্থন করেন। তিনি এমন এক ব্যবস্থা চাহেন, যাহাতে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারেন। যেখানে গ্রামীণ গণতন্ত্র সকল কাজ করিতে পারিবে না, সেখানে অবশ্য জেলা পরিষদ, রাজ্যপরিষদ ও সর্বশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদ থাকিবে। প্রার্থী মনোনয়নের ভার দলের হাতে না থাকিয়া জনসাধারণের হাতে থাকিবে। বিধানসভার একটি নির্বাচন ক্ষেত্রে যদি ষাট হাজার ভোটার থাকে, তাহা হইলে এক হাজার করিয়া ভোটার লইয়া ষাটটি নিবাচনকেন্দ্র থাকিবে। একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক কেন্দ্রে ভোটারগণ উপস্থিত হইয়া তিনজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। ষাটটি কেন্দ্রের ১৮০ জন প্রতিনিধি আবার সমগ্র নির্বাচনক্ষেত্রের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। তাঁহারা যদি একজনের নির্বাচন সম্বন্ধে একমত না হইতে পারেন, তাহা

হইলে ভোট দিয়া যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পাইবেন তাঁহাকে নির্বাচন করিবেন।

এই সব উপায় অবলম্বন করিলেও দল প্রথাকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রাইমারির নির্বাচনে দলের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজনৈতিক দলের অনেক দোষত্রুটি আছে বটে; কিন্তু উহা বর্জন করিতে গেলে একনায়কত্ব বা একটি দলের স্বেচ্ছাচার প্রবর্তিত হইবার আশঙ্কা আছে। দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে দলগুলি দলীয়ভাব ত্যাগ করিবার শুভবুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে আশা করা যায়।

একাদশ অধ্যায়

জরুরী অবস্থায় শাসনব্যবস্থা (Emergency Provisions)

জাতীয় সংকটে জরুরী অবস্থা ঘোষণা (Proclamation of Emergency under Section 352) : সহসা কোন আপদ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে করা হইয়াছে। আপদ তিন ধরনের হইতে পারে—জাতীয় সঙ্কট, কোন রাজ্যে সাংবিধানিক সঙ্কট ও অর্থনৈতিক সঙ্কট। জাতীয় সঙ্কট উদ্ভূত হইতে পারে যুদ্ধ হইতে, বিদেশীর আক্রমণ হইতে অথবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হইতে। যুদ্ধ, আক্রমণ বা অন্তর্বিপ্লব বাস্তবক্ষেত্রে বর্তমান না থাকিলেও যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে উহার সম্ভবনা আছে, তাহা হইলেও তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে জরুরী অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে যেখানেই রাষ্ট্রপতির নাম করা হইয়াছে সেইখানেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কাজ করিতেছেন বুঝিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি জাতীয় সঙ্কটে এইরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে, সত্যই কোন বিপদ ঘটিয়াছে কিনা অথবা বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন আদালতের অনুসন্ধান বা বিচার করিবার কোন এক্তিয়ার থাকিবে না। রাষ্ট্রপতির বিবেচনাকেই চরম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সংসদ কর্তৃক জরুরী অবস্থার ঘোষণা সমর্থিত না হইলে উহা দুই মাসের বেশি স্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু সংসদের উভয় সদন যদি উহা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে উহা অনির্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ থাকিতে পারে। রাষ্ট্রপতি যখন খুসি উহা নাকচ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু যে সময়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইল সে সময়ে যদি সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তাহা হইলে দুই মাসের মধ্যে অধিবেশন ডাকিতে হইবে। ব্রিটেনে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পাঁচ দিনের মধ্যে পার্লামেণ্টকে আহ্বান করিতে হয়। কিন্তু ব্রিটেনের তুলনায় আমাদের দেশ আকারে অনেক বড় এবং যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা তেমন ভালো নহে বলিয়া এখানে দুইমাস সময় দেওয়া হইয়াছে। যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণার সময়ে লোকসভা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়া থাকে

তিন ধরনের আপদ

জরুরী অবস্থা কতদিন স্থায়ী হইবে ?

dissolved থাকে) তাহা হইলে রাজ্যসভায় উহা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। রাজ্যসভায় উহা অনুমোদিত হইলে যতদিন না লোকসভার নির্বাচন ও অধিবেশন হইতেছে, ততদিনের পর একমাস সময় পর্যন্ত উহা জারি থাকিবে। নূতন লোকসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার একমাসের মধ্যে যদি উহা তথায় সমর্থিত না হয়, তাহা হইলে জরুরী অবস্থার অবসান ঘটিবে। এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে লোকসভা না থাকিলেও রাজ্যসভা বর্তমান থাকে এবং রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছাড়া আর সকলেই বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি। সুতরাং তাঁহারা আঙ্গিক রাজ্যসমূহের স্বার্থের দিক দিয়া জরুরী অবস্থা থাকা প্রয়োজন কিনা বিচার করিবেন। মোটের উপর কথা হইতেছে এই যে, রাষ্ট্রপতি একা অথবা তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলী নিজেদের খেয়ালখুসি মতন জরুরী অবস্থার ঘোষণা দুই মাসের বেশি বলবৎ রাখিতে পারেন না। জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সংসদের অনুমোদন না পাইলে জরুরী অবস্থা বজায় রাখা যায় না।

জাতীয় সংকটে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে তাহার দুইপ্রকার ফল দেখা দেয়। প্রথমতঃ আঙ্গিক রাজ্যের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হ্রাস পায় এবং আদালতে নালিশ করিলেও সেই ক্ষেত্রে কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না।

আঙ্গিক রাজ্যের আত্মকর্তৃত্বের সংকোচন

কেন্দ্রের শাসনবিভাগ যে কোন আঙ্গিক রাজ্যকে তথাকার শাসনসংক্রান্ত কার্য কিভাবে নির্বাহ করা হইবে সে বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারে এবং সেই নির্দেশ আঙ্গিক রাজ্য মানিতে বাধ্য। সাধারণ সময়ে আঙ্গিক রাজ্যের বিধানসভা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর একক কর্তৃত্ব ভোগ করে—তাঁহারা ঐসব বিষয়ে যে কোন আইন তৈয়ারি করিতে পারেন। কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে কেন্দ্রীয় সংসদ ঐসব বিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতা লাভ করে। ইহার মানে এরূপ নহে যে জরুরী অবস্থায় আঙ্গিক রাজ্যের বিধানসভা থাকিবে না বা তাহার শাসনবিভাগ সম্পূর্ণ কেন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। চীনের আক্রমণের পর ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে অক্টোবর রাত্রিকালে ক্যাবিনেটসভায় স্থির হয় যে ৩৫২ ধারা অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইবে; পরের দিন রাষ্ট্রপতি উহা ঘোষণা করেন। ৮ই নভেম্বর তারিখে সংসদের সামনে উহা পেশ করা হয় ও অনুমোদিত হয়। জরুরী অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাসমূহ যথারীতি কাজ করিতেছে। তবে দেশের

নিরাপত্তার অনুরোধে কেন্দ্রীয় সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও আইন করিতে পারে। জরুরী অবস্থা শেষ হইবার ছয়মাসের মধ্যে ঐসব আইনের মেয়াদ ফুরাইবে। আঙ্গিক রাজ্যগুলির মন্ত্রিমণ্ডলী পূর্বের ন্যায় এখনও কাজকর্ম চালাইতেছে।

জাতীয় সংকটে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র ও আঙ্গিক রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের যে নিয়ম আছে (সংবিধানের ২৬৮ হইতে ২৭৯ ধারা) তাহার পরিবর্তন ঘটাইতে পারিবেন। অর্থৎ কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন বুঝিলে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের কিছুটা লইতে পারিবে। বর্তমান জরুরী অবস্থাতে কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত কোন রাজ্যকে তাহার আয় হইতে বঞ্চিত করে নাই।

রাজস্ব বণ্টন

জরুরী অবস্থার সবচেয়ে গুরুতর ফল হইতেছে এই যে সংবিধানের ১৯ ধারায় নাগরিকদিগকে যে বাক্‌-স্বাতন্ত্র্য, সভা করিবার স্বাতন্ত্র্য, সংঘবদ্ধ হইবার, ভারতের মধ্যে যে কোন স্থলে অবাধে চলাফেরা করিবার, এবং যেখানে খুসি বসবাস করিবার যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে তাহা সীমিত হয়। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে একটি আদেশের (Notification) দ্বারা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নাগরিকদের স্বাতন্ত্র্য অধিকার রক্ষা করিবার যে ক্ষমতা আছে, তাহা সমগ্র ভারতে অথবা তাহার কোন অংশে মুলতুবি (Suspend) রাখিতে পারেন। তাঁহার ঐ আদেশ সংসদের সামনে পেশ করা প্রয়োজন। সংসদ উহা পরীক্ষা করিয়া যদি বুঝে যে উহার দরকার নাই, তাহা হইলে উহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। এই ধারাটি যখন Constituent Assemblyতে আলোচিত হইতেছিল, তখন উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত এইচ. ভি. কামাথ বলেন যে, এইভাবে নাগরিকের স্বাধীনতা হরণ করিবার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার ফলে কোন নাগরিক আর তাঁহার স্বাতন্ত্র্য হারাইলে আদালতের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। "The citizen is denied the right of access to courts of law for making complaints about the violation of not only the rights of individual freedom but all other fundamental rights during the period of emergency." কিন্তু ইহার উত্তরে আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সংকোচ

আবার বলেন যে যুদ্ধের সময়ে বাক্-স্বাধীনতা দিলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে, কেননা এখানে নানা মতের লোক আছে, এমন কি কোন কোন ব্যক্তির দেশের বাহিরের কোন কোন রাষ্ট্রের প্রতিও আনুরক্তি আছে। দেশ স্বাধীন থাকিলে তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিতে পারে। ম্যাগনা কার্টার নীতি মানিয়া যুদ্ধ চালানো যায় না ("A war cannot be fought on principles of Magna Carta".)। বর্তমান জরুরী অবস্থায় অনেক কম্যুনিস্ট নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। তাঁহারা বক্তৃতার দ্বারা বা লেখার দ্বারা দেশের সংহতি নষ্ট করিতেছিলেন বা করিবেন বলিয়া আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর সরকার হস্তক্ষেপ করে নাই। লোকে স্বাভাবিক অবস্থার সময়ে যেমন সভা করিত, শোভাযাত্রা বাহির করিত, বক্তৃতা করিত বা বিনা সেন্সরের অনুমতিতে লেখা প্রকাশ করিত সেইরূপ করিতেছে। অবশ্য ভবিষ্যতে কোন সরকার যে জরুরী অবস্থায় প্রাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে না তাহা বলা যায় না।

ইহা কতদূর যুক্তিযুক্ত ?

সাংবিধানিক জরুরী অবস্থা (Proclamation of Emergency under Article 356) : সমগ্র জাতির জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্তর্বিপ্লবের দরুণ সংকট না আসিলেও কোন একটি আঞ্চিক রাজ্যে এমন পরিস্থিতি উপস্থিত হইতে পারে যে সেখানে সংবিধান অনুসারে কার্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ সাংবিধানিক সংকট চার রকমে উদ্ভূত হইতে পারে। প্রথমতঃ কোন আঞ্চিক রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলী কেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের প্রশাসন সম্পর্কে ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে। ঐরূপ নির্দেশ অমান্য করিলে ঐরাজ্যে সংবিধান অনুসারে শাসন চালানো অসম্ভব হইতে পারে। সংবিধানের ৩৫৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে, ইউনিয়নের কর্তব্য হইতেছে প্রত্যেক আঞ্চিক রাজ্যকে বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হইতে রক্ষা করা এবং দেখা যে প্রত্যেক রাজ্যে সংবিধানের নিয়ম অনুসারে শাসন চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ সেইজন্য যখন রাজ্যের ভিতর গোলযোগের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার মতন হয়, তখন রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ কোন রাজনৈতিক দল কোন রাজ্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়াও শাসনভার

গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতে পারে এবং অন্য কোন দলের মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতি পাস করাইয়া সেখানকার শাসনব্যবস্থা অচল করিতে পারে। চতুর্থতঃ কোন রাজ্যে হয়তো কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারে এবং বিভিন্ন দলের কোন কোয়ালিশন সরকার স্থায়ী হইতে না পারে। এই সব ক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছে বলিয়া রিপোর্ট দিতে পারেন। যদি কোন কারণে রাজ্যপাল তাঁহার রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে এইরূপ রিপোর্ট পেশ করিতে না চাহেন, তাহা হইলেও রাষ্ট্রপতি অন্য প্রকারে খবর পাইয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। এই "অন্যপ্রকারে" (On receipt of a report from the Governor or otherwise) খবর পাওয়াটা কি ধরনের তাহা সংবিধানে খুলিয়া বলা হয় নাই। নিশ্চয়ই উহা গুপ্তচরের (C. I. D.) প্রদত্ত সংবাদ নহে। বিভিন্ন জনসভায় পাস করা প্রস্তাবের ভিত্তিতেও যে রাষ্ট্রপতি কোন রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবেন তাহা মনে হয় না।

কোন মন্ত্রিমণ্ডলী হয়তো কোন রাজ্যের বিধানসভার আস্থাভাজন, তথাপি সেই রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হইলে কেন্দ্রীয় সরকার কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? রাজ্যপাল হয়তো মনে করিতে পারেন যে, বিধানসভায় মন্ত্রিমণ্ডলীর স্বপক্ষে অর্ধেকের কিছু বেশি সদস্য থাকিলেও দেশের জনসাধারণ তাঁহাদের বিপক্ষে এবং সেইজন্য রাজ্যের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

কোন প্রতিকারমূলক পন্থা অবলম্বনের পূর্বে সেখানে বিকল্প মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইতে পারে কিনা, তাহার চেষ্টা তিনি করিতে পারেন। সেরূপ সম্ভব না হইলে রাজ্যপাল কেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে বিধানসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচন ঘটাইতে পারেন। যতদিন নির্বাচন না হয়, ততদিন পুরাতন মন্ত্রিমণ্ডলী কাজ চালাইতে পারেন। কিন্তু ঐ মন্ত্রিমণ্ডলী যদি ঐরূপ করিতে সম্মত না হন, অথবা কোন বিকল্প মন্ত্রিমণ্ডলীও গঠন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে অগত্যা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে হয়।

কোন রাজ্যে সাংবিধানিক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে উহা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। যদি ঐ সময় সংসদের অধিবেশন না হয়, তাহা হইলে দুই মাসের মধ্যে সংসদ ডাকিয়া উহা অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। লোকসভার অস্তিত্ব সে সময়ে না থাকিলে রাজ্যসভার দ্বারা উহা সমর্থিত হওয়া চাই। তারপর যখন লোকসভা নূতন নির্বাচনের পর বসিবে, তখন এক মাসের মধ্যে সেখানেও উহা

অনুমোদিত হওয়া দরকার। এই সব নিয়ম জাতীয় সংকটে জরুরী অবস্থার অনুরূপ। জাতীয় সংকটের বেলায় জরুরী অবস্থার ঘোষণা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উহা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থায়ী হইতে পারে; কিন্তু সাংবিধানিক সংকটে সংসদের অনুমোদনের পর এককালে উহা ছয়মাস মাত্র স্থায়ী হইতে পারে। তাহার পর ঐ ঘোষণা পুনরায় সংসদে পেশ করা যায়। কিন্তু সর্বসমেত তিন বৎসরের বেশি কিছুতেই এই ধরনের জরুরী অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না।

জাতীয় সংকটে ঘোষিত জরুরী অবস্থার সহিত সাংবিধানিক জরুরী অবস্থার অবস্থার আর একটি পার্থক্য এই যে, কোন রাজ্যে এরূপ অবস্থা ঘোষিত হইলে (১) রাষ্ট্রপতি ঐ রাজ্যের সমস্ত অথবা যে কোন কার্যভার নিজের হাতে লইতে পারেন; কিংবা রাজ্যপালকে কিংবা অন্য যে কোন শাসন কর্তৃপক্ষকে সমর্পণ করিতে পারেন। (২) রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করিতে পারেন যে ঐ রাজ্যের জন্য আইন করিবার ক্ষমতা সংসদের উপর অর্পিত হইল এবং তথাকার বিধানসভা কোন আইন পাস করিতে বা অন্য কোন কাজ করিতে পারিবে না। (৩) তিনি অন্য যে কোন প্রাসঙ্গিক আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু সেই রাজ্যের হাইকোর্টের কোন ক্ষমতা নিজের হাতে লইতে পারেন না। জাতীয় সংকটকালে রাজ্যের বিধানসভা ও মন্ত্রিমণ্ডলী বজায় থাকে, কিন্তু সাংবিধানিক জরুরী অবস্থায় উহা মুলতুবি (Suspended) থাকে। শেষোক্ত জরুরী অবস্থার সময়ে যদি লোকসভার কোন বৈঠক না বসে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি ঐ রাজ্যের একত্রীকৃত কোষ (Consolidated Fund) হইতে খরচা মঞ্জুরির আদেশ দিতে পারেন; পরে অবশ্য ঐ আদেশ সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। ঐ সময়ে সংসদের অবর্তমানে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স পাস করিতে পারেন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাঁচবার সাংবিধানিক জরুরী ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে ভার্গব মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করেন এবং কোন বিকল্প মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা সম্ভব হয় নাই। সেই সময়ে রাষ্ট্রপতি সেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া রাজ্যপালের উপর শাসন চালাইবার ভার ও সংসদের উপর আইনসভার কাজের ভার ন্যস্ত করেন। এই অবস্থা সামান্য কিছু দিনমাত্র চলিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের প্রথম নির্বাচনের পর পেপ্সুতে স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা যায় নাই। সেইজন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া তথাকার বিধানসভা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। ছয় মাসের মধ্যে নূতন

নির্বাচনের ফলে সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয়তঃ ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশে তিনটি বিরোধী দলের সদস্য, নির্দলীয় কয়েকজন সদস্য কংগ্রেসের কয়েকজন বিদ্রোহী সদস্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশম্ মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করেন। প্রকাশম্ পদত্যাগ তো করিলেনই, নবনির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত কাজ চালাইতেও অসম্মত হইলেন। এদিকে কোন বিকল্প মন্ত্রিমণ্ডলীও গঠন করা গেল না। কাজেই সেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইল। কিন্তু ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে নবনির্বাচনের পর কংগ্রেসী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইল এবং জরুরী অবস্থার অবসান ঘটিল। চতুর্থতঃ ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়া পদত্যাগ করেন। অন্য কোন দলও মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে পারিলেন না। কাজেই সেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইল। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের পর কম্যুনিস্ট দলে কয়েকজন নির্দলীয় সদস্যের সহযোগিতায় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেন। এ পর্যন্ত যতগুলি রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে এইখানকার সংকটই সবচেয়ে বেশিকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কেননা ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য কেরল রাজ্যে পরিণত হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর-কাল তথাকার রাজপ্রমুখ (রাজ্যপাল) একজন উপদেশকের (Adviser) সাহায্যে শাসনকার্য চালাইয়াছিলেন।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে কেরলে পুনরায় সংকট দেখা দিল। কম্যুনিস্ট দলের সমর্থকসংখ্যা বিরোধী দলের সদস্যদের অপেক্ষা মাত্র দুইটি বেশি ছিল—তাহা হইলেও বিরোধী দলের লোকেরা, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস ও প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সদস্যেরা রাজ্যের মধ্যে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেরলের নানাস্থানে শান্তিশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। রাজ্যপাল ডাঃ রামকৃষ্ণ রাও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট এক সুদীর্ঘ রিপোর্টে জানাইলেন যে, কেরলে সংবিধান অনুসারে শাসন চালানো অসম্ভব। রাষ্ট্রপতি সেইজন্য সেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলেন।

কিন্তু ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে আসামে যখন শান্তিশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং প্রাদেশিক মনোভাব নগ্ন ও বীভৎসরূপে প্রকট হইয়াছিল, তখন বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুরোধ সত্ত্বেও সেখানে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কেরলে কম্যুনিস্ট মন্ত্রিমণ্ডলী ছিল বলিয়া সেখানে জরুরী

অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার তাহার বিরুদ্ধে কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।

অর্থনৈতিক সংকটে জরুরী অবস্থা ঘোষণা (Financial Emergency): সংবিধানের ৩৬০ ধারা রাষ্ট্রপতিকে অর্থনৈতিক কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার ক্ষমতা দিয়াছে। এই ধারাটি প্রথমে সংবিধানের যে খসড়া করা হইয়াছিল তাহাতে ছিল না। সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে কমিটি বসিয়াছিল তাহাও ইহা বিবেচনা করে নাই। কিন্তু ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা লইয়া যখন বিব্রত, তখন ইংলণ্ডের মুদ্রার মূল্য হ্রাস হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও টাকার মূল্য কমানো হইল। এইসব ঘটনার কিছু পূর্বে ভারত সরকার বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারকে মাদক দ্রব্যবর্জনের নীতি কার্যকরী করা সম্বন্ধে কিছু শিথিলতা দেখাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বোম্বাই সরকারকে ঘোড়দৌড় বাজিখেলা নিরোধক বিল পাস করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ও মাদ্রাজ সরকারকে জমিদারি প্রথা লোপ করিবার বিল আপাততঃ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বোম্বাই ও মাদ্রাজের সরকার বলেন যে, ঐসব বিষয় যখন রাজ্যতালিকাভুক্ত, তখন তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন। তাঁহাদের এই প্রকার মনোভাব দেখিয়া ভারত সরকার আর্থিক কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার কথা সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করিলেন।

অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে সংসদের ক্ষমতা জাতীয়সংকটে জরুরী অবস্থা ঘোষণার অনুরূপ। সংসদের দ্বারা অনুমোদিত হইলে ইহার স্থায়িত্ব-কালও অনির্দিষ্ট। তবে রাষ্ট্রপতি যে কোন সময়ে উহা নাকচ করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি যখন বুঝিবেন যে, ভারতবর্ষের বা তাহার কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম (financial stability or credit) নষ্ট হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন তিনি আর্থিক সংকটজনিত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন। এই অবস্থার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন রাজ্য সরকারকে আর্থিক প্রসঙ্গে নীতির নির্দেশ দিতে পারিবেন। উহাতে রাজ্যের যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন ও ভাতা কমাইবার কথা বলা যাইবে। অর্থ সংক্রান্ত কোন বিল (Money Bill) রাজ্যের বিধানসভায় পাস হইবার পর রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোন কর্মচারীর,

এমন কি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণের ভাতা ও বেতন কমাইবার নির্দেশ দিতে পারিবেন। দেশের সমক্ষে কোন আর্থিক সংকট উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য এইসব নিয়ম করা হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ জরুরি অবস্থা ঘোষণা না করিয়া যদি কোন রাজ্যে উহা ঘোষণা করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে সঙ্কট হইতে পারে। কোন রাজ্যের আর্থিক সঙ্কটের কথা রাষ্ট্রপতি কিভাবে জানিবেন সে কথা সংবিধানে বলা হয় নাই। এক্ষেত্রে রাজ্যপালের রিপোর্টের কোন উল্লেখ নাই। এরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হইতে পারে। যাহা হউক এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বা তাহার কোন অংশবিশেষে অর্থনৈতিক কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় নাই।

জরুরী অবস্থাকালীন কেন্দ্রীয় সরকার : জাতীয় সংকটজনিত জরুরী অবস্থার কথা যখন Constituent Assemblyতে বিবেচনা করা হইতেছিল, তখন কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে ঐ অবস্থায় গণতন্ত্র বিলুপ্ত হইবে এবং রাষ্ট্রপতি ডিক্টেটর হইয়া বসিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার সেরূপ নহে। রাষ্ট্রপতি একা কোন কাজ করিতে পারেন না। সংবিধান অনুসারে তাঁহাকে সব সময়েই মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ লইতে হইবে। জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী বজায় থাকিবে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রথম দুইমাস ছাড়া অন্য সময়ে সংসদও বর্তমান থাকিবে। সংসদের, অন্ততঃ রাজ্যসভার অনুমোদন না পাইলে জরুরী অবস্থা টিকিতে পারিবে না। জরুরী অবস্থার সময়েও মন্ত্রিমণ্ডলী সংসদের নিকট দায়িত্বশীল থাকিবেন। কোন কোন বিদেশী পণ্ডিত কল্পনা করিয়াছেন যে, কোন উচ্চাকাঙ্খী রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার সুযোগ লইয়া স্বেচ্ছাচারতন্ত্র প্রবর্তন করিতে পারেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এরূপ আশঙ্কা অমূলক।

তবে একথা ঠিক যে জরুরী অবস্থায় সময় আঞ্চিক রাজ্যসমূহের স্বাতন্ত্র্য খানিকটা ক্ষুণ্ণ হইবে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয় সংহতির জন্য উহা অপরিহার্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

সংবিধানের সংশোধন

সংবিধানের সংশোধন প্রণালী : ভারতের সংবিধান সংশোধন করিবার প্রণালী বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহা একাধারে নমনীয় (flexible) ও অনমনীয় (Rigid)। সংবিধানের সংশোধন বিধিকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) কতকগুলি বিষয় সংশোধন করিবার জন্য ব্রিটিশ সংবিধানের সংশোধনপদ্ধতির মতন অত্যন্ত সহজ নিয়ম করা হইয়াছে। সাধারণ বিল যেমন সংসদের উভয় সদনে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে অর্ধেকের একজন বেশি সদস্যের ভোটে পাস হইলে ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাইলে আইনে পরিণত হইতে পারে, সংবিধানের কতকগুলি ধারা ঠিক সেইভাবে সংশোধন করানো যাইতে পারে। নির্বাচনের আইন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংবিধান, নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমানির্ধারণ (Delimitation of Constituencies) তপশিলী অঞ্চল ও তপশিলী জাতির প্রশাসন সম্পর্কে সংবিধানের ধারাগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত। এই বিষয়গুলি যে সংবিধানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাহা ফ্রান্স দেশের সংবিধান হইতে জানা যায়। সেখানে এই ধরনের বিষয়গুলিকে Organic Law বলা হয়।

(২) সংবিধানের কয়েকটি ধারা উপরে লিখিত প্রণালীতে সংশোধন করা যায় বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইনসভার অনুরোধ, সম্মতি বা পরামর্শ গ্রহণ প্রয়োজন হয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে আঞ্চলিক রাজ্যগুলির নিজ নিজ সংবিধান প্রণয়ন বা সংশোধন করিবার কোন এক্তিয়ার নাই। কিন্তু কোন রাজ্যের সীমা পরিবর্তন করিতে হইলে, একটি রাজ্যের কোন অংশ লইয়া অন্য রাজ্যের সহিত জুড়িয়া দিতে হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের পরামর্শ লইতে হইবে। পরামর্শ মানে কিন্তু সম্মতি নহে। তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং মত না থাকিলেও সংসদ রাজ্যের সীমা পরিবর্তন করিতে পারিবেন। এই উপায়ে অর্থাৎ সংসদের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা (by simple majority) ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে States Reorganisation Act, The Bihar and West Bengal (Transfer of territories) Act, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে The Naga Hills-Tuensang Area

Act ও ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে Bombay Reorganisation Act পাস করানো হইয়াছে।

কোন রাজ্যের বিধানসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এই মর্মে প্রস্তাব পাস করে যে সেখানে বিধানপরিষদ (দ্বিতীয় সদন) স্থাপন করা হউক বা উহা লোপ করা হউক তাহা হইলে সংসদ ঐ বিষয়ে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে আইন পাস করিয়া দ্বিতীয় সদন স্থাপন বা বিলোপ করিতে পারে। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ পরিবর্তনকে সংবিধানের সংশোধন বলিয়া গণ্য করা হইবে না। কোন রাজ্যের বিধানসভা অনুরোধ করিলেই যে উহা অনুসরণ করিয়া সংসদ দ্বিতীয় সদন লোপ করিবেন তাহা বলা যায় না। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের বিধানসভা দ্বিতীয় সদন লোপ করিবার প্রস্তাব পাস করে; কিন্তু ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সংসদ ঐ বিষয়ে কোন আইন তৈয়ারি করে নাই। বোম্বাইপ্রদেশ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিধা-বিভক্ত হইলে মহারাষ্ট্রে দুইটি সদন স্থাপিত হয়, কিন্তু গুজরাতে একটি মাত্র সদনই প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে নবগঠিত মধ্যপ্রদেশের জন্য সংসদ বিধান-পরিষদের ব্যবস্থা করিলেও ঐ রাজ্যের অধিবাসীরা পরে দ্বিতীয়সদনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন বলিয়া সেখানে একমাত্র বিধানসভা লইয়াই কাজ চালানো হইতেছে।

উপরে বর্ণিত দুইটি সংশোধন পদ্ধতির কথা সংবিধানের ৩৬৮ ধারায় বলা হয় নাই। ঐ ধারা অনুসারে প্রধানতঃ দুই উপায়ে সংবিধান সংশোধিত হইতে পারে।

(৩) সংবিধান সংশোধনের সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদের যে কোন সদনে একই মর্মে পেশ করিয়া উভয় সদনে যে সকল সদস্য উপস্থিত থাকিবেন ও ভোট দিবেন তাঁহাদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে উহা পাস করাইতে হইবে; কিন্তু ঐ সংখ্যা যেন প্রত্যেক সদনের সমগ্র সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের বেশি হয়। ধরা যাউক, লোকসভায় ৫২৫ জন সদস্য আছেন, কিন্তু সংবিধান সংশোধনের দিন মাত্র ৩৭৫ জন উপস্থিত হইলেন ও তাঁহারা প্রত্যেকেই ভোট দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ২৫০ জন সংশোধনের পক্ষে ভোট দিলেন। এক্ষেত্রে উহা পাস হইতে পারিবে না, কেননা ২৫০ ভোট ৩৭৫ এর ⅔ অংশ হইলেও সমগ্র সংসদসংখ্যা ৫২৫-এর অর্ধেকের কম। সেই জন্য ঐ সংশোধনী পাস করাইবার জন্য অন্ততঃ ২৬৩টি ভোট প্রয়োজন।

ঠিক ঐভাবে রাজ্যসভাতেও মোট সদস্যের অর্ধেকেরও বেশি এবং উপস্থিত

সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ঐ সংশোধনী পাস করিবেন। তখন রাষ্ট্রপতির নিকট উহা স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হইবে। এই ধরনের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি সংসদের পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন না এবং সম্ভবতঃ প্রথা অনুসারে উহাতে অসম্মতিও দিতে পারেন না। যাহা হউক রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর উহা বলবৎ হইবে।

(৪) ঠিক এইভাবেই সংসদের উভয় সদনে অন্য কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে বিল পাস হইবার পর বিভিন্ন রাজ্যের অন্ততঃ অর্ধেক আইনসভার দ্বারা উহা সমর্থিত (ratified) হওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সংশোধন করিতে গেলে এই প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন—(ক) রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি (খ) কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের প্রশাসনিক ক্ষমতার সীমা (গ) সুপ্রিম কোর্ট ও রাজ্যসমূহের হাইকোর্ট (ঘ) কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে আইন করিবার ক্ষমতা বণ্টন (ঙ) সংসদে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব (চ) সংশোধনের প্রণালী যে ৩৬৮ ধারায় লিখিত হইয়াছে তাহার পরিবর্তন। এইসব বিষয়ে আঞ্চিক রাজ্যগুলির স্বার্থ গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া তাহাদের মত লওয়া প্রয়োজন। এরূপ মত লইবার ব্যবস্থা যদি না থাকিত তাহা হইলে আমাদের সংবিধান স্বাভাবিক অবস্থাতেও (অর্থাৎ জরুরী অবস্থা ছাড়াও) এককেন্দ্রিক হইত। কিন্তু কখন কখনও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে মত প্রকাশের জন্য অত্যন্ত অল্প সময় দিয়া থাকেন। তৃতীয় সংশোধনীতে রাজ্যতালিকাভুক্ত কয়েকটি বিষয় যুগ্ম তালিকায় স্থান দিয়া কেন্দ্রের অধিকার বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যখন পাস করানো হয় তখন কংগ্রেসের উচ্চ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেস দলভুক্ত রাজ্য সরকারদের নিকট আদেশ জারি করিয়াছিলেন। মহীশূর রাজ্য ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকার উহা পাস হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করে—কেননা তখন অর্ধেক রাজ্য সম্মতি পাঠাইয়াছিল। মহীশূর রাজ্যের সরকার এইরূপ ব্যস্ততার নিন্দা করে।

সংবিধান সংশোধনীতে জনসাধারণের হাত: সংবিধান সংশোধনের কার্য জনসাধারণের নির্বাচিত মূলতঃ সংসদের ও আংশিকভাবে রাজ্যের আইনসভার প্রতিনিধিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে উহাতে কোন মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ পায় না। অবশ্য ভারতবর্ষের মতন বিশাল ও জনবহুল দেশে গণভোট বা Referendum প্রবর্তন করা সম্ভব নহে। কিন্তু কংগ্রেস অন্ততঃ নির্বাচনী ইস্তাহারে উল্লেখ করিতে পারে কি ধরনের সংশোধনী প্রস্তাব উহা

উত্থাপন করিতে চাহে। এরূপ করিলে জনসাধারণ অন্ততঃ ভোট দিবার সময় উহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কিছু যুক্তি শুনিতে পাইতেন। ব্রিটেনে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তন আনিতে হইলে হাউস অব কমন্সের নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় এবং জনসাধারণের আদেশ (Mandate) পাইলে তবে ঐরূপ পরিবর্তন-মূলক আইন পাস করানো হয়।

সংবিধান সংশোধনের ইতিবৃত্ত : আমাদের সংবিধান কার্যকরী হইবার পর প্রথম সাত বৎসরের মধ্যে সাতবার সংশোধিত হইয়াছে। ১৯৫১ হইতে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংবিধান চৌদ্দবার সংশোধন করা হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। সংসদে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলিয়া কংগ্রেসী সরকার অনায়াসে সংবিধান সংশোধন করিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না বলিলেই হয়। তাই কার্যকালে দেখা যাইতেছে যে সংবিধানের কিছু রদবদল না করিলে শাসনকার্য চালানো বড়ই কঠিন হয়। দেশের সামনে যেমন যেমন সমস্যা উপস্থিত হইতেছে তাহার সমাধানের জন্য সংবিধানের তেমনি পরিবর্তন করা হইতেছে।

বারংবার সংশোধনের দরকার হয় কেন?

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের ও হাইকোর্টের কয়েকটি রায়ের ফলে দেখা গেল যে, মৌলিক অধিকারের কিছু পরিবর্তন না করিলে অনুন্নতশ্রেণীর উন্নয়নের ব্যবস্থা, দেশের নিরাপত্তা রক্ষা এবং জমিদারি প্রথা রহিত করার আইন করা সম্ভব হয় না। তাই ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই এক-সদন বিশিষ্ট অস্থায়ী সংসদ (Provisional Parliament) ১৫, ১৯, ৮৫, ৮৭, ১৭৪, ১৭৬, ৩৪১, ৩৪২, ৩৭২ ও ৩৭৫ ধারায় অল্পবিস্তর পরিবর্তন করে এবং ৩১ ক ও খ ৩১ নামক দুইটি ধারা ও নবম পরিশিষ্ট সংযোজন করিল। এই সব সংশোধনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে (১) শিক্ষা ও সমাজের দিক দিয়া অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধানের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারিবে (২) বিদেশের মৈত্রীভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার খাতিরে বাক্-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করা চলিবে (৩) যৌথ কারবারের ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রভৃতির অধিকার হ্রাস করা যাইবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সাময়িকভাবে সরকার যে কোন সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবে (৪) জমিদারি প্রথা বিলোপ সম্বন্ধে বিভিন্ন রাজ্যে যে সকল আইন তৈয়ারি করা

প্রথম সংশোধন

হইয়াছে, তাহা বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। শেষোক্ত বিষয় লইয়া অনেক মামলামোকদ্দমা চলিতেছিল এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট বিভিন্ন রকম মত প্রকাশ করিয়াছিল। সংবিধানের এই পরিবর্তনসাধনের পরও সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন তোলা হইয়াছিল যে, এক-সদনভুক্ত সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা আছে কিনা। সুপ্রিম কোর্ট বলে যে, ঐ ক্ষমতা আছে এবং সংশোধন বৈধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংশোধন

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির ফল প্রকাশ পাইলে দেখা গেল যে, প্রত্যেক সাড়ে সাত লক্ষ লোকের জন্য লোকসভায় একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা বজায় রাখিলে লোকসভার সদস্যসংখ্যা ৫০০য়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। তাই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংশোধনী দ্বারা জনসংখ্যার সহিত প্রতিনিধির সংখ্যার অনুপাত বদলানো হইল। ইহাতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যার কমবেশি হইতে পারে বলিয়া এই সংশোধনীটি রাজ্যসমূহের অর্ধেকের মত (Ratification) লইয়া পাস করানো হইয়াছিল।

তৃতীয় ও চতুর্থ সংশোধন

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় সংশোধনীর দ্বারা মানব ও গবাদি পশুর খাদ্য, তুলা ও পাটের উৎপাদন ও সরবরাহ যুগ্ম তালিকায় প্রদত্ত হইল। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন বুঝিলে ঐ সব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা পুনরায় সংবিধানের ৩১, ৩১ক ধারা সংশোধন করা হয় এবং ৩০৫ ধারা ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া বলা হয় যে, রাষ্ট্র একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে পারিবে। সরকার যখন বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের হিতার্থে (for public purpose) কোন সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইবে, তখন আইনে যে ক্ষতিপূরণের হার লেখা থাকিবে তাহার সম্বন্ধে কোন মামলা মোকদ্দমা চলিতে পারিবে না। সরকার যেরূপ ক্ষতিপূরণ দিবে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে।

পঞ্চম সংশোধন

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে আবার একটি (পঞ্চম) সংশোধনীর প্রয়োজন ঘটে। সংবিধানে লিখিত আছে যে, রাজ্যের সীমা প্রভৃতি পরিবর্তন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মতামত শুনিবার সুযোগ দিতে হইবে—কিন্তু রাজ্যসমূহ কতদিনের মধ্যে মতামত প্রকাশ করিবে সে বিষয়ে কিছু লিখিত ছিল না। এবারে সংশোধনী স্পষ্ট করিয়া রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট সময় ঠিক করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ঐ সম্বন্ধে

মধ্যে রাজ্য সরকার মত প্রকাশ না করিলে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন পাস করিতে পারিবে।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ সংশোধনীর দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে খরিদ ও বিক্রয়ের উপর করের হার স্থির করিবার ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে এবং তজ্জন্য ইউনিয়ন তালিকায় ৯২ ক সংখ্যক একটি উল্লেখ সংযোগ করা হয়। ইহার দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারকদিগকে সুপ্রিম কোর্টে ওকালতী করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ঐ ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দেই রাজ্যপুনর্গঠন করা হয় এবং সেইজন্য সপ্তম সংশোধনীর দ্বারা রাজ্যের নাম, সংসদে তাহাদের প্রতিনিধি সংখ্যা, সদনের সংখ্যা প্রভৃতি পুনরায় লিখিত হয় এবং রাজ্যের তিন শ্রেণীর ভেদ উঠাইয়া দেওয়া হয়। রাজ্যপুনর্গঠন কমিসনের সুপারিশ অনুসারে ৩৫০ক এবং ৩৫০ খ নামক দুইটি ধারা সংযোগ করিয়া ভাষাগত সংখ্যালঘুসম্প্রদায়ের স্বার্থ বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সংশোধনীটি খুবই ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ ও সপ্তম সংশোধন

১৯৫৭ ও ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে সংবিধানের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। কিন্তু ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে অষ্টম সংশোধনীর দ্বারা তপশিলী জাতি ও জনজাতির এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য বিধানসভায় ও সংসদে সংরক্ষণের সময় ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী হইতে বাড়াইয়া ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত করা হইল।

অষ্টম সংশোধন

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বেরুবাড়ি অঞ্চল পাকিস্তানকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা নবম সংশোধনীর দ্বারা পাকা করা হয়। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে দশম সংশোধনীতে দাদরা ও নগর হাভেলিকে ভারতের সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং ঐ স্থান দুইটি রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক আইনের দ্বারা শাসন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আবার একাদশ সংশোধনী পাস করা হয়। উহার ফলে উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করিবার জন্য সংসদের উভয় সদনের একত্র অধিবেশন ডাকিবার প্রয়োজনীয়তা লোপ পায়। সংসদের বা বিধানসভার কোন পদখালি থাকিলেও রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন বৈধ হইবে স্থির করা হয়।

নবম, দশম ও একাদশ সংশোধন

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংশোধনী প্রস্তাব পাস হয়।

দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর হইতে গোয়া, দমন ও দিউ ভারতীয় ইউনিয়নের অংশরূপে পরিগণিত হইল। সংবিধানের প্রথম তপশিল পরিবর্তন করিয়া ঐ স্থানগুলিকে অষ্টম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা হইল। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে নাগা পর্বত ও তুয়েনসাং অঞ্চল লইয়া নাগাল্যাণ্ড গঠিত হইল। ইহা ভারতের ষোড়শ রাজ্য হইল। সম্প্রতি আসামের রাজ্যপাল ইহার রাজ্যপাল হইয়াছেন ও আসামের হাইকোর্ট নাগাল্যাণ্ডেরও হাইকোর্টরূপে কাজ করিবে। তবে নাগাল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র বিধানসভা ও মন্ত্রিমণ্ডলী থাকিবে। ইহার আয়তন ছয় হাজার বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা চার লক্ষ মাত্র। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী লোকসভায় প্রস্তাবিত হয়। ইহার দ্বারা কেন্দ্রশাসিত হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, গোয়া-দমন-দিউ এবং পণ্ডিচেরীতে আইনসভা ও মন্ত্রিমণ্ডলী স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লোকসভার সদস্য সংখ্যা প্রথমে ৫০০ ছিল, উহা বাড়াইয়া ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫২০ করা হয়। কিন্তু পর্তুগীজ ও ফরাসীদের নিকট হইতে গৃহীত অঞ্চলগুলিকে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা দিতে হইবে বলিয়া লোকসভার সদস্যসংখ্যা ৫২৫ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে সংসদের উভয় সদনের যৌথ-কমিটিতে স্থির হয় যে, পঞ্চদশ সংশোধনীর দ্বারা হাইকোর্টের বিচারকগণের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ হইতে বাড়াইয়া ৬২ করা হইবে। হাইকোর্টকে কয়েকটি লেখ (Writ) জারি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে এবং স্থায়ী কর্মচারীদের স্বার্থসংরক্ষণের অধিকতর সুবিধা দেওয়া হইবে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য ষোড়শ সংশোধনী সংসদের সামনে পেস করা হইয়াছে। উহার দ্বারা কোন ব্যক্তি বা দলকে ভারতের ঐক্যের হানি হয় এমন কিছু বলিতে বা প্রচার করিতে দেওয়া হইবে না। বর্তমানে মাদ্রাজের একটি রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, উক্তদল দক্ষিণ ভারতে এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করিতে চায়। এইরূপ প্রচার নূতন সংশোধনীর দ্বারা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। সংসদ ও আঞ্চিক রাজ্যের আইনসভায় যাঁহারা নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ভারতীয় ইউনিয়নের সংহতি ও সার্বভৌমিকতা রক্ষার জন্য শপথগ্রহণ করিতে হইবে। ষোড়শ সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের ১৯ (ব্যক্তি-

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংশোধন

ষোড়শ সংশোধন

স্বাতন্ত্র্য) ৮৪ (সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা) ও ১৭৩ ধারা (রাজ্যের আইনসভায় নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা) ও তৃতীয় তপশিল পরিবর্তন করা হইবে।

ভারতের সংবিধানে অনেক খুঁটিনাটি সন্নিবেশ করা হইয়াছে বলিয়া অবস্থার একটু অদলবদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের সংশোধন করিবার প্রয়োজন ঘটে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্বায়ত্তশাসন প্রণালী

স্বায়ত্তশাসনের ক্রমবিকাশ ধারা : ভারতবর্ষে এখনও শতকরা ৮২ জনের বেশি লোক গ্রামে বাস করেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বের অর্থাৎ ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে ৮৮·৬ ভাগ লোক গ্রামে এবং ১১·৪ ভাগ লোক শহরে বাস করিতেন। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছেন। তথাপি শহরের বসিন্দাদের সংখ্যা শতকরা ১৮ জনের কম। এক লক্ষের উপর অধিবাসী আছে এমন শহরের সংখ্যা ১০৭টি মাত্র। গ্রামের লোকেরা যুগযুগান্তর ধরিয়া নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া আসিতেছিলেন। পারসীক, গ্রীক্, শক, হূণ, পাঠান, মুঘল প্রভৃতির আক্রমণের ফলে কত রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু ভারতের গ্রামগুলি তাহাদের স্বায়ত্তশাসনের গুণে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে। তাই গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্যার চার্লস মেটকাফ লিখিয়াছিলেন যে গ্রামীন সমাজগুলি যেন এক-একটি ছোটখাট গণতান্ত্রিক রাজ্য (Republio)। এগুলির মধ্যে সব কিছু আছে এবং ইহারা যেন বৈদেশিক সম্বন্ধের ধার ধারে না।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐতিহাসিক মূল্য

যেখানে কিছুই দীর্ঘস্থায়ী নহে, সেখানে ইহারাই টিকিয়া আছে। গ্রামীন সমাজগুলির সংঘ জনসাধারণের সুখের হেতু এবং তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রধান কারণ। "The village communities are little republics having every thing they want within themselves and almost independent of foreign relations. They seem to last where nothing else lasts. This union of village Communities each one forming a little State in itself, is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence".)।

কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার নীতি অনুসরণ করিলেন। গ্রামগুলির স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। গ্রামের উৎসাহী

ও উদ্যমশীল ব্যক্তিরা শহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। কাজেই গ্রামগুলিতে স্বাভাবিক নেতার অভাব ঘটিল। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, রোগব্যাধির প্রকোপ এবং যাতায়াতের পথঘাটের অভাবে গ্রামগুলির দশা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। অথচ ব্রিটিশ শাসকেরা গ্রামের উন্নতির জন্য কিছুই না করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকটি শহরে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পৌরসভা (Municipal Committee Act of 1842) স্থাপনের নিয়ম করা হয়। কলিকাতার বাহিরে যে কোন শহরের অধিবাসীরা দুই-তৃতীয়াংশ গৃহস্থের সম্মতি থাকিলে মিউনিসিপ্যাল কমিটি স্থাপন করিতে পারিবেন এবং স্বাস্থ্য ও সুবিধার জন্য কর বসাইতে পারিবেন। আইন করিলে কি হইবে একটি মাত্র শহর পৌরকমিটি স্থাপনে রাজী হইলেন, কিন্তু সেখানেও যখন কলেক্টর সাহেব কর আদায় করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন কেহ তো কর দিলেনই না উপরন্তু কলেক্টর সাহেবকে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। তারপর ১৮৫০ হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আইন করিয়া পৌরসভা স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। লর্ড রিপনের শাসনকালে সর্বপ্রথম পৌরসভাকে শাসন ব্যাপারে জনগণকে শিক্ষা দিবার উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। লর্ড রিপনের নীতিকে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার কিন্তু কার্যকরী করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে লিখিত হয় যে গত পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের অগ্রগতি খুবই অপ্রচুর হইয়াছে "in a space of thirty five years the progress in developing a genuine local self-government has been inadequate in the greater part of India".

ব্রিটিশ আমলে গ্রামের দুরবস্থা

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের প্রথম মিউনিসিপাল আইন

গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রস্তাব সর্বপ্রথমে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিসনের রিপোর্টে করা হয়। কিন্তু সে বিষয়ে কোন প্রচেষ্টা দেখা গেল না। ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দের বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে যে রয়াল কমিসন বসিয়াছিল তাহার সুপারিশ অনুসারে ব্রিটেনের ভারতসচিব স্বীকার করেন যে গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে আরম্ভ

পঞ্চায়েতের পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব

করিয়া সকল স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে বে-সরকারী সভাপতি (Chairman) নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ও ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথোচিত সাহায্য করা কর্তব্য। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে বিকেন্দ্রীকরণ কমিসনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার দাবি জানানো হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে পুনরায় ঐ দাবির কথা বলা হয়। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের মধ্যে বাংলা দেশেই সর্বপ্রথম ইউনিয়ন বোর্ড নামক পঞ্চায়েত স্থাপনের আইন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পাস করা হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আইন করা হয়। পাঞ্জাবে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ও আসামে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চায়েত প্রবর্তিত হয়। কিন্তু এই সব ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েত হইতে বিশেষ কিছু সুফল পাওয়া যায় নাই। উপযুক্ত কর্মীর অভাব, সরকার হইতে বিশেষজ্ঞের সাহায্য দিবার কোন ব্যবস্থা না থাকা, গ্রাম্য দলাদলির প্রবৃত্তি এবং সকলের উপরে অর্থের অভাবে কোন প্রদেশেই গ্রামের বিশেষ কিছু উন্নতি হইল না। অবিভক্ত বাংলা দেশের ইউনিয়ন বোর্ডগুলিতে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই উহা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর মত

এদিকে মহাত্মা গান্ধী পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন যে ভারতের স্বাধীনতার সূত্রপাত হইবে গ্রামের পঞ্চায়েত হইতে। গ্রামকে পুনরুজ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠ না করিতে পারিলে ভারতবর্ষের উন্নতি সুদূরপরাহত হইবে। মহাত্মাজী ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, পঞ্চায়েতকে যত বেশি ক্ষমতা দেওয়া হইবে লোকের তত বেশি কল্যাণ হইবে। সুতরাং প্রকৃত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সর্বতোভাবে করিতে হইবে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী স্থাপিত হইবার পর এদিকে কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পর ঐ সব মন্ত্রী পদত্যাগ করায় বিশেষ সুফল দেখা দেয় নাই।

সংবিধানে নির্দেশক নীতি

স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধানের যখন খসড়া তৈয়ারি হইল তখন উহাতে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না দেখিয়া অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ডাঃ আম্বেদকার তাঁহাদের প্রতিবাদের উত্তর দিতে উঠিয়া বলেন যে, "গ্রাম্য পঞ্চায়েতই ভারতের সর্বনাশের মূল হইয়াছিল। গ্রামগুলি আঞ্চলিকতার আবর্জনাস্তূপ এবং অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা

ও সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকূপ ছাড়া আর কি ?" তাঁহার এই উক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অবশেষে সংবিধানের ৪০ সংখ্যক ধারায় নির্দেশক নীতির মধ্যে ঘোষণা করা হয় যে রাজ্যের সরকারগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যবস্থা করিবেন এবং উহাদিগকে এরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিবেন যাহাতে ঐগুলি স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষেত্ররূপে কার্য করিতে পারে। এই নীতি অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে নূতন করিয়া পঞ্চায়েত আইন তৈয়ারি করা হইল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে সামহিক উন্নয়ন (Community Development) পরিকল্পনা অনুসারে গ্রামের আর্থিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নতি করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীবলবন্তরায় মেহতার সভাপতিত্বে একটি অনুসন্ধানকারীর দল (Study Team) পঞ্চায়েত রাজ স্থাপন সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দেয়। তাঁহারা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের (Democratic Decentralisation) উপর জোর দেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে জাতীয়বিকাশ পরিষদ (The National Development Council) ঐ নীতি মানিয়া লন। সেই অনুসারে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে নূতন ধরনের পাঞ্চায়েতরাজ স্থাপিত হইয়াছে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে ঐ সম্বন্ধে আইন পাস করা হইয়াছে এবং গুজরাতে আইন তৈয়ারি হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গেও ঐ ধরনের আইন তৈয়ারি করা যায় কিনা তাহা সরকার বিবেচনা করিতেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত আছে তাহার সহিত উপরে উল্লিখিত অন্যান্য রাজ্যের পঞ্চায়তী রাজের পার্থক্য কি তাহা জানা প্রয়োজন। নূতন ব্যবস্থাকে পঞ্চায়তী রাজ বলে এবং পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাকে শুধু পঞ্চায়েত বলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েতী-রাজ স্থাপনের জন্য আইন তৈয়ারি করা হইতেছে।

পঞ্চায়তীরাজের পদ্ধতি ঃ পঞ্চায়তীরাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের সহিত পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামের উন্নয়ন কার্যের ভার প্রথমতঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর, দ্বিতীয়তঃ উন্নয়ন ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উপর ও তৃতীয়তঃ জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাকে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্ত-শাসনের সংগঠন (Three-tier structure of the self-Governing Institutions) বলা হয়। পঞ্চায়েত শুধু চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতির সাহায্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে না, বা কেবল

তিন স্তরের সংগঠন

মাত্র স্বাস্থ্যরক্ষা ও রাস্তাঘাট তৈয়ারি ও মেরামত করিবে না; কিন্তু পল্লী অঞ্চলের কৃষির উন্নতি করিবে, ছোটখাট শিল্পে অধিকতর লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা করিবে, সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক উন্নতিসাধন করিবে, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রচার করিবে এবং স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তাহার উপায় বিধান করিবে। এই সব উন্নয়নমূলক কার্য বিনা পরিকল্পনায় সাধিত হইতে পারে না। পরিকল্পনা দিল্লী হইতে তৈয়ারি করিয়া গ্রামবাসীদের মাথার উপর বোঝার মতন চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। গ্রামোন্নয়ন ব্লকের সাহায্যে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ নিজ পরিকল্পনা তৈয়ারি করিবেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের জন্য ৫২২৩টি ব্লক প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষে চার লক্ষ ১৬ হাজার গ্রামের জন্য ৩৫৮৯টি ব্লক প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক

পঞ্চায়েত

একটি ব্লকের মধ্যে প্রায় একশতটি গ্রাম আছে। ব্লকের এলাকার আয়তন ১৫০ হইতে ২০০ বর্গ মাইল এবং উহার লোকসংখ্যা ষাট হইতে সত্তর হাজার। এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া এক একটি পঞ্চায়েত গঠিত হয়। দশখানি গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য এক এক জন গ্রামসেবক থাকেন। গ্রামসেবক সরকার হইতে নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য হইতেছে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা ও সহায়তা যাহাতে গ্রামের লোকেরা কাজে আসে তাহার ব্যবস্থা করা। পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সভাপতি বা সরপঞ্চ পদাধিকার বলে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন। ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিতে তাঁহারা ছাড়া কয়েকজন নারী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের ব্যক্তির মনোনয়নের ব্যবস্থা আছে। ব্লক

ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি

বিকাশাধ্যক্ষ এবং কৃষি, পশুপালন, সেচ, সমবায় প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি আট জন বিশেষজ্ঞ বা Extension Officers ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিকে সাহায্য করেন। ঐ সব বিশেষজ্ঞ নিজ নিজ বিভাগের আধুনিকতম পদ্ধতি গ্রামবাসীদিগকে শিখাইয়া দেন এবং গ্রামের লোকের কি সুবিধা বা অসুবিধা হইতেছে, তাহা উচ্চ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনেন। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে আভাসে জানাইয়া দেন যে ঐ রাজ্যের পরিকল্পনা বাবদ এত টাকা ব্যয় করা যাইতে পারে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্লককে তাহাদের প্রয়োজন মত পরিকল্পনা করিতে বলেন।

পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েতসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের অঞ্চলের পরিকল্পনার খসড়া তৈয়ারি করেন। পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি কৃষি, সমবায়, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কুটির শিল্প, পানীয়জলের ব্যবস্থা, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের এলাকার মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা, সাঁকো প্রভৃতি বিষয়ে শুধু পরিকল্পনা করেন না; উহা কার্যে পরিণত করা ও পর্যবেক্ষণ করার ভারও তাঁহাদের উপর। পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েতগুলির সাহায্যে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করেন।

ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উপরে আছে জেলা পরিষদ। ইহাকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ পদাধিকার বলে সদস্য হন। তাঁহারা ছাড়া জেলা হইতে যাঁহারা সংসদে এবং রাজ্যের বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন তাঁহারাও উহার সভ্য হন। জেলা পরিষদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ও বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগের বিশেষজ্ঞের সহায়তা লইয়া ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে তাহাদের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করেন। জেলা পরিষদ জেলা সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য দায়িত্বশীল। কিন্তু ইহার কার্য উপদেশ দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করা নহে।

জেলা পরিষদ

পূর্বে যে সকল জেলাবোর্ড ছিল সেগুলি অধিকাংশ রাজ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সেগুলির সহিত গ্রামের আন্তরিক সংযোগ ছিল না। জেলাবোর্ড গ্রামগুলির উপর সর্দারি করিত; জেলা পরিষদ সখা ও সচিবের মতন গ্রামগুলিকে পরামর্শ দেয়।

জেলাবোর্ডের বিলোপ

ব্লকের গ্রামোন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় তাঁহাদের বেতনের অর্ধেক কেন্দ্রীয় সরকার দেয়। পতিত জমি কর্ষণ-যোগ্য করিবার জন্য সেচের জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে টাকা খরচ হয় তাহার সম্পূর্ণটা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে ধারস্বরূপ দেয়।

ব্যয় নির্বাহ

পঞ্চায়েতের খরচা নির্বাহের জন্য অনেক রাজ্যে জমির খাজনার একাংশ নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাজস্থানের ২৬টি জেলার এক একটি পঞ্চায়েত সমিতিকে জমির খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা যদি সফল হয় তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমেই খাজনা আদায়ের সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত করা হইবে। রাজ্যসরকারের অনেক কাজ এখন পঞ্চায়েত সমিতিকে ঠিকা দেওয়া হইতেছে।

পঞ্চায়েতগুলি এখন একদিকে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার এজেন্ট স্বরূপ। পুরাতন পঞ্চায়েতগুলি কেবলমাত্র স্বায়ত্তশাসনের কয়েকটি মাত্র কাজ করিয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের ইউনিয়ন বোর্ড : ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে অবিভক্ত বাংলায় যে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে ছয় হইতে নয় জন করিয়া সদস্য থাকিতেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হইতেন ও এক-তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। এখন মনোনয়ন প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোট দিবার অধিকার ছিল না, এখনও নাই। যে সব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বছরে ছয় আনা হারে ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী কর বা বছরে আট আনা হারে সেস দেন, অথবা ম্যাট্রিকুলেশন বা অনুরূপ কোন পরীক্ষায় পাস করিয়াছেন তাঁহারাই মাত্র ভোট দিতে পারেন।

সংগঠন

ইউনিয়ন বোর্ডকে রাস্তাঘাট তৈয়ারি ও মেরামত করা, পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা, প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা, জলনিকাশের ব্যবস্থা, সংক্রামকব্যাধির প্রতিরোধ করা প্রভৃতি নানা কাজের ভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু চৌকিদার ও দফাদারদের বেতন দিতেই তাহার প্রায় সমস্ত আয় নিঃশেষিত হইত। রাজ্য-সরকার ও জেলা বোর্ড ইউনিয়ন বোর্ডকে কখনও কখনও কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। কিন্তু ইহার আয়ের প্রধান উৎস ছিল স্থাবর সম্পত্তির মালিকদের উপর ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী কর স্থাপন। তাছাড়া লাইসেন্স ফিঃ, ছোটখাট মামলামোকদ্দমায় যে জরিমানা আদায় হইত তাহা এবং খোঁয়াড়ে (Pound) আটক পশুদের মালিকের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্য হইত তাহা হইতে সামান্য কিছু আয় হইত। এত কম সম্বল লইয়া গ্রামের কোন উন্নতি করা অসম্ভব ছিল।

কার্য

আয়ব্যয়

ইউনিয়ন বোর্ডের ছোটখাট ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু প্রায়ই ঐ বিচার পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। এই সব নানা কারণে ইউনিয়ন বোর্ড তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির স্থানে পশ্চিমবঙ্গে বিশ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত ও চার হাজার অঞ্চল-পঞ্চায়েত স্থাপিত হইবে।

বিচার

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত : ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত বিল পাস হয় এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উহা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইয়া আইনে পরিণত হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পঞ্চয়েতগুলি ঐ আইন অনুসারে নির্বাচিত হইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করে। ঐ বৎসরের আগস্ট মাসের মধ্যে প্রায় তিন হাজার গ্রাম-পঞ্চায়েত ও চার শত অঞ্চল-পঞ্চায়েত স্থাপিত হয়। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে ৪৫৫৬টি পঞ্চায়েত সমগ্র পল্লী সংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ মাত্র গ্রামে স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ সময়ে মধ্যপ্রদেশ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে শতকরা প্রায় এক শত ভাগ গ্রামে পঞ্চায়েত স্থাপিত হয়। মধ্যপ্রদেশের শতকরা ৬৯ ভাগ গ্রামে পঞ্চায়েত ছিল।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তন

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী পঞ্চায়েতের নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার পান। একটি পঞ্চায়েতে নয় জনের কম নহে ও পনের জনের বেশি নহে সদস্য নির্বাচিত হইবেন। সরকার হইতে ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে যে কোন্ পঞ্চায়েতে কত সদস্য থাকিবেন। পঞ্চায়েত যে অঞ্চলে স্থাপিত হইবে সেই অঞ্চলের যে সব ব্যক্তির নাম বিধানসভার নির্বাচক তালিকায় আছে সেই সব ব্যক্তি লইয়া গ্রাম-সভা গঠিত হইবে। পঞ্চায়েতের নির্বাচনের জন্য গ্রাম-সভাকে বিভিন্ন নির্বাচনক্ষেত্রে (Constituencies) বিভক্ত করা হয়। রাজ্যসরকার ইচ্ছা করিলে গ্রামসভার বহির্ভূত যে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে পঞ্চায়েতের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের মনোনীত ব্যক্তির সংখ্যা সমগ্র পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি হইতে পারিবে না। ইঁহারা মতভেদের সময় পঞ্চায়েতে ভোট দিতে পারিবেন না এবং পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদে নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। পঞ্চায়েতের কার্যকাল চার বৎসর মাত্র।

পঞ্চায়েতের সংগঠন

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের তিনটি স্তর (Three tier) আছে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাত্র দুইটি স্তর বর্তমান। পঞ্চায়েতের উপর কেবলমাত্র অঞ্চল পঞ্চায়েত আছে—জেলা পরিষদ এখনও পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয় নাই। গ্রাম সভার প্রতি আড়াই শত সভ্যের অনুপাতে একজন করিয়া প্রতিনিধি অঞ্চল পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হইবেন। যদি কোন গ্রাম সভার দুই হাজার সভ্য থাকে তাহা হইলে উহা অঞ্চল পঞ্চায়েতে আট জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে; কিন্তু অন্য এক গ্রাম-সভায় মাত্র

অঞ্চল পঞ্চায়েত

চার শত সভ্য থাকিলে দুই জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্যগণ একজন প্রধান ও একজন উপ-প্রধান নির্বাচিত করেন। তাঁহাদের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন করিয়া সেক্রেটারি বা কর্মসচিব থাকিবেন। তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন কিন্তু তাঁহার বেতন, ভাতা প্রভৃতি অঞ্চল পঞ্চায়েতের তহবিল হইতে দেওয়া হইবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য

গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, পথঘাট নির্মাণ ও মেরামত, পশুচারণভূমি, কবরস্থান ও শ্মশানঘাট সংরক্ষণ জলনিকাশ, পানীয় জল সরবরাহ, টিকা দেওয়া গ্রাম উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসীদের শ্রমসংগঠন করিতে বাধ্য। রাজ্যসরকার ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়েতকে প্রাথমিক, সামাজিক, বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা প্রদানের, গ্রাম্য দাতব্য ঔষধালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রস্থাপনের, সেচসরবরাহের, জমির উন্নতি বিধানের এবং সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামের জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি পরিচালনার ভার দিতে পারেন। এই সব ক্ষমতা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়ে পঞ্চায়েত ইচ্ছা করিলে কাজ করিতে পারেন, কিন্তু রাজ্যসরকার নির্দেশ দিলে করিতে বাধ্য হইবেন—রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, সমবায় পদ্ধতিতে চাষ প্রবর্তন, সমবায় ভাণ্ডার, কুটির-শিল্পের উন্নয়ন ও উৎসাহদান প্রভৃতি। রাজসরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে যে সব কাজ করিবার ভার দিবেন সেগুলির খরচ অবশ্য সরকার হইতে প্রদত্ত হইবে। কিন্তু যে কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত সরকারের বিনা নির্দেশেই করিতে বাধ্য সেগুলির খরচ পঞ্চায়েত নিজের তহবিল হইতে দিবেন।

আয়

গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজের ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতা নাই। তবে কেহ কিছু চাঁদা দিলে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন এবং পঞ্চায়েতের সম্পত্তি হইতে কিছু আয় হইতে পারে। ইহার তহবিলে টাকা আসে প্রধানতঃ অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রদত্ত অর্থ হইতে।

অঞ্চল পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কার্য

অঞ্চল পঞ্চায়েত তাহার এলাকায় কর বসাইতে পারে, এবং লাইসেন্স প্রভৃতি দিবার ফি আদায় করিতে পারে। অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সম্পত্তি হইতে কিছু আয় হয়। মামলামোকদ্দমায় যে জরিমানা করা হয় তাহার আয়ও ইহার তহবিলে জমা হয়। তবে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের আয়ের প্রধান উৎস হইতেছে রাজ্যসরকারের সাহায্য। জেলা বোর্ড বা অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানও অঞ্চল-পঞ্চায়েতকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন।

অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্যতম প্রধান কার্য হইতেছে নিজের এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য চৌকিদার ও দফাদার নিযুক্ত করা। ইঁহাদের বেতন অঞ্চল পঞ্চায়েতের তহবিল হইতে প্রদত্ত হয়। কিন্তু নূতন নিয়ম অনুসারে ঐ ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশ রাজ্যসরকার হইতে প্রদত্ত হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়েত যখন গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাহায্য দিবে তখন বিবেচনা করা হইবে যে গ্রাম পঞ্চায়েত কতটা অর্থ কর বসাইয়া তুলিতে পারিয়াছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট অঞ্চল পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সরকারের নিকট পাঠাইতে হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়েত ঐ বাজেটের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মন্তব্য করিতে পারে। বাজেট কার্যকরী করিবার মতন টাকা জোগাইবার আংশিক দায়িত্ব অঞ্চল পঞ্চায়েতের, কিন্তু অঞ্চল পঞ্চায়েতের হাতে অর্থ খুব বেশি থাকে না।

সরকারী মনোনয়ন বাঞ্ছনীয় কি ?

কেহ কেহ বলেন যে গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারের মনোনীত সদস্য থাকিলে স্বায়ত্তশাসনের নীতি ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু গ্রামের মধ্যে ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, পশুপালন, পশুচিকিৎসা, সমবায়নীতি প্রভৃতির বিশেষজ্ঞ পাওয়া মুস্কিল। অথচ ঐ ধরনের বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া পঞ্চায়েতের অনেক রকম কাজে চালানো কঠিন হয়। যতদিন না গ্রামগুলিতে যোগ্যতর ব্যক্তিরা বসবাস করিতে থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত সরকারী মনোনয়ন প্রথাকে বর্জন করা অনুচিত হইবে।

ন্যায় পঞ্চায়েত ও উহার ত্রুটি

প্রত্যেক অঞ্চলপঞ্চায়েতে সরকার নোটিশ দিয়া একটি করিয়া ন্যায়-পঞ্চায়েত স্থাপন করিতে পারে। এক-একটি গ্রামসভা সভ্যদের মধ্য হইতে এক একজন বিচারক নির্বাচন করিবে। যদি কোন অঞ্চলপঞ্চায়েতে পাঁচটির কম গ্রামসভা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক গ্রাম-সভা অন্ততঃ একজন বিচারক নির্বাচন করিবে। ন্যায় পঞ্চায়েত ছোট খাট দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার করিতে পারিবে। ন্যায় পঞ্চায়াতেরও কার্যকাল চার বৎসর মাত্র। নির্বাচিত বিচারকেরা নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারেন কিনা, সন্দেহ। সেইজন্য যদি উত্তর প্রদেশের মতন পশ্চিমবঙ্গে সরকার ন্যায় পঞ্চায়েতকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করিত তাহা হইলে ভাল হইত।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের মূলমন্ত্র হইতেছে গ্রামবাসীর উপর, আস্থা

রাখা। তাঁহারা ভুল করিবেন ঠিক, কিন্তু ভুল করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তাঁহারা আত্মনিয়ন্ত্রণে শিক্ষা পাইবেন কিরূপে? সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের দ্বারা পঞ্চায়েতের ক্ষমতা যাহাতে হ্রাস না পায় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

বেশি হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়

পশ্চিমবঙ্গের সামুহিক উন্নয়ন (Community Development in West Bengal): পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সামুহিক উন্নয়ন সাধন করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের ইচ্ছা আছে যে সামুহিক উন্নয়নের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সমবায় সমিতির মাধ্যমে এবং শিক্ষা, রাস্তাঘাট তৈয়ারি, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হউক। সামুহিক উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হইল গ্রামবাসীদিগকে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা এবং তাঁহাদের নিজের উদ্যোগে যাহাতে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা করা। সরকার এজন্য টাকা ব্যয় করিতেছেন, তবে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা প্রয়োজন। গ্রামবাসীরা হয়তো নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করিতে পারেন না, কিন্তু উন্নয়নের কাজে তাঁহারা নিজেদের শ্রমদান করিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাসীরা এইভাবে শ্রমদান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪১টি ব্লক স্থাপন করা হয়। তাহার মধ্যে ১৯০টি ব্লক প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে আছে এবং উহাদের অধীন জনসংখ্যা হইতেছে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ এবং গ্রামের সংখ্যা ২৪৭০০।

উদ্দেশ্য ও বিবরণ

কোন অঞ্চলে ব্লক খুলিবার পূর্বে সেখানকার একটি আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার বিবরণ সংগ্রহ এবং পরিমাপ লওয়া হয়। পুরাপুরিভাবে ব্লক উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করিবার আগে কিছুদিন প্রাক্-সম্প্রসারণ ব্লক (Pre-Extension Block) খুলিয়া সামান্য কিছু কর্মচারী লইয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। তারপর রীতিমত ব্লক খুলিয়া সেখানে প্রথম পাঁচ বছর ধরিয়া যে কাজ করা হয় তাহাকে ব্লকের প্রথম স্তরের কাজ (Stage I) বলা হয়। ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রাম উন্নয়নের জন্য অনধিক বার লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। তারপর আরও পাঁচ বৎসর ব্লকটিকে দ্বিতীয় স্তরে রাখা হয় এবং সে সময়ে উহার জন্য অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। এই দুই স্তরে দশ বৎসর কাজ হইবার পর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণকর বিভাগগুলি-

তিনটি স্তরের কার্য

ব্লকের অগ্রগতি অব্যাহত রাখিবার জন্য আরও অর্থ ব্যয় করিবেন। তবে তখন আর সামূহিক উন্নয়ন তহবিলের সাহায্য পাওয়া যাইবে না। সামূহিক উন্নয়ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তভুক্ত।

সামূহিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি, সেচ, গোমহিষাদি পশুপালন, পতিত জমি উদ্ধার, স্বাস্থ্য শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা, চলাচল ব্যবস্থা, কুটির শিল্পের উন্নতি, বাসগৃহের ব্যবস্থা প্রভৃতি করা হয়? একশতটি গ্রাম লইয়া একটি ব্লক গঠিত হয়। উহার প্রধান হইতেছেন ব্লক বিকাশ অফিসার। দশ বারটি গ্রামের উন্নয়নের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য এক একজন গ্রামসেবক থাকেন। তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাঁহার কাজ হইতেছে একদিকে গ্রামের লোকদের উন্নয়নে সাহায্য করা, অন্যদিকে ব্লক বিকাশ অফিসারের নিকট তাঁহাদের সমস্যার কথা জানানো। ব্লক বিকাশ অফিসারের অধীনে একজন করিয়া কৃষি বিশেষজ্ঞ, সমবায় সমিতির নিরীক্ষক, শিল্প সম্প্রসারণ কর্মী, পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ কর্মী, পশু চিকিৎসক, সাধারণ ডাক্তার ও একজন সর্ববিষয়ের সাধারণ পরিদর্শক (Multi-purpose Overseer) ও সমাজ শিক্ষা সংগঠক থাকেন। এক এক ব্লকে মেয়েদের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য একজন করিয়া মহিলা কর্মীও থাকেন।

কার্যক্রম

বিশেষজ্ঞ

সামূহিক উন্নয়ন কার্য পরিচালনা করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে একজন মন্ত্রী আছেন। তাঁহার অধীনে যে উন্নয়ন কমিসনার থাকেন তিনি উন্নয়ন মূলক কার্যের প্রধান কর্মচারী ও উন্নয়ন বিভাগের সচিব। প্রত্যেক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার এলাকার মধ্যে অবস্থিত সকল ব্লকের গ্রামোন্নয়ন কার্যের জন্য দায়ী। তাঁহার অধীনে একজন জেলার উন্নয়ন কর্মচারী (Development Officer) আছেন। তিনি সমস্ত ব্লক বিকাশ কর্মচারীদের কাজ দেখাশুনা করেন।

সংগঠন

উন্নয়ন কার্যের খরচের মোটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এবং কিছু অংশ রাজ্য সরকার হইতে আসে। গ্রামের লোক চাঁদা তুলিয়া বা কায়িকশ্রম করিয়া উন্নয়ন কার্যে সহায়তা করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস মধ্যে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে ১১৭৩০টি পানীয় জলের কূপ খনন অথবা মেরামত করা হইয়াছে, ৬৭৪,৮৪৩ একর অতিরিক্ত জমিতে সেচের কাজ হইয়াছে, সাথে

ব্যয় নির্বাহ

য়াল লক্ষ মণ রাসায়নিক সার বিতরণ করা হইয়াছে, প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে লিখিতে ও পড়িতে শেখানো হইয়াছে, ৩৭০৩ মাইল কাঁচা রাস্তা তৈয়ারি ও ৭২২৫ মাইল কাঁচা রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সোওয়া কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাড়ে বার কোটি টাকা খরচ করিয়াছে। এই তালিকা গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও গ্রামবাসীদের মধ্যে নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য আন্তরিক উৎসাহ জাগিয়াছে বলা যায় না।

কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে ?

গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনার আপেক্ষিক অসাফল্যের অন্যতম কারণ হইতেছে সরকারী কর্মচারীদের নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতনতা। তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশিতে পারেন না। তাঁহারা নিজদিগকে গ্রামের সেবক না ভাবিয়া গ্রামের হর্তাকর্তা বিধাতা মনে করেন। তাঁহাদের উপর যে যে খাতে যে টাকা ব্যয় করিবার ভার দেওয়া হয় তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। তাই হয়তো কোন বাবদ অনেক টাকা খরচ করা সম্ভব হয় না, অথচ অন্য বাবদ প্রচুর টাকার প্রয়োজন। সরকারী কর্মচারীরা নির্দিষ্ট কাজ অর্থাৎ এতগুলি গৃহ নির্মাণ, এত একর জমিতে সার দেওয়া প্রভৃতির জন্য যতটা উৎসাহী, গ্রামের লোকের মধ্যে উন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতা আনিবার জন্য ততটা সচেষ্ট নহেন। গ্রামবাসীর বহু যুগের ঔদাসীন্য, দৈবের উপর নির্ভরতা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতা সহসা দূরীভূত হইবে আশা করাই অন্যায়। এজন্য চাই অসীম ধৈর্য, অসাধারণ প্রীতি ও সেবার উৎসাহ এবং অবিমিশ্র সততা। গ্রামোন্নয়নের আশা ও গ্রামবাসীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক জাগরণের উপর ভরসা ছাড়িলে ভারতের কল্যাণ সাধন অসম্ভব হইবে।

ত্রুটিবিচ্যুতি

আশা ও ভরসা চাই

জেলা বোর্ড : ইংলণ্ডের কাউন্টি কাউন্সিলের অনুকরণে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পরে ভারতবর্ষের একএকটি জেলায় একটি করিয়া জেলা বোর্ড স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডে একটি কাউন্টির আয়তন নয় শত বর্গমাইলের বেশি নহে; কিন্তু বাংলাদেশে জেলার আয়তন ছিল ২৭০০ বর্গমাইল, মাদ্রাজে প্রায় ছয় হাজার বর্গ মাইল এবং বোম্বাইয়ে প্রায় পাঁচ হাজার বর্গ মাইল। কাউন্টি অপেক্ষা জেলার জনসংখ্যাও অনেক বেশি। কাউন্টি কাউন্সিলের উপর পুলিশের ভার আছে, জেলা বোর্ডের উপর উহা

নাই। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটই ক্লাবের প্রিফেক্টের ন্যায় জেলা বোর্ডের সভাপতিত্ব করিতেন। তাঁহাকে জেলার অসংখ্য কার্য দেখিতে হইত, সঙ্গে সঙ্গে জেলা বোর্ডের কাজের প্রতিও নজর রাখিতে হইত। নির্বাচিত সদস্যেরা সেকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেন না। কাজেই স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ ছিল নিতান্ত সামান্য। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইবার পর হইতে জেলা বোর্ড তাহার সভাপতি নির্বাচন করিবার ভার পাইল। কিন্তু তখনও জেলার শতকরা তিন জনের বেশি লোক জেলা বোর্ডের সদস্যগণকে নির্বাচন করিবার অধিকার পান নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর সংসদে ও বিধানসভার নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট দিবার অধিকার স্বীকৃত হয়; কিন্তু জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচনে ঐ নীতি অবলম্বিত হয় নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা ম্যাট্রিকুলেশন বা অনুরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা এবং যাঁহারা অন্ততঃ ছয় আনা চৌকিদারী ট্যাক্স দেন তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত হন। আবার তাঁহারাই জেলাবোর্ডের সদস্য নির্বাচন করেন। সুতরাং জেলা বোর্ডের সদস্যদিগকে ঠিক জনসাধারণের প্রতিনিধি বলা যায় না। কোন্ জেলা বোর্ডে কয়জন সদস্য থাকিবেন তাহা সরকার ঠিক করিয়া দেন। কিন্তু উহা নয়জনের কম এবং তেত্রিশ জনের বেশি হয় না। এখন জেলা বোর্ডে মনোনয়ন প্রথা বর্তমান নাই; সকলেই নির্বাচিত হন। তাঁহাদের কার্যকাল চার বৎসর। নির্বাচিত সদস্যেরা আবার নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি এবং এক বা ততোধিক সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করেন। জেলা বোর্ডের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য একজন সেক্রেটারি, একজন স্বাস্থ্য-বিষয়ক কর্মচারী (Health Officer), একজন এঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য সাধারণ কর্মচারী থাকেন।

জেলা বোর্ডের উপর জেলার কল্যাণমূলক বিবিধ কার্যের ভার ন্যস্ত আছে বা ছিল। জেলার ভিতর রাস্তাঘাট তৈয়ারি, সাঁকো নির্মাণ ও ঐসবের মেরামত ও সংরক্ষণ করা; লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের জন্য ঔষধ বিতরণ, হাসপাতালের তত্ত্বাবধান করা, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা, আর্থিক উন্নতি করার জন্য কৃষিকার্যের উন্নয়ন, গবাদিপশুর চিকিৎসা ও মড়ক নিবারণের প্রতিকার, কারিগরী শিক্ষার প্রসার, এমন কি দুর্ভিক্ষ ঘটিলে দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে অর্থ ও খাদ্য দান প্রভৃতি বহু বহু কর্তব্য জেলা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। জেলা বোর্ড বিভিন্ন স্থানে

জেলা বোর্ডের কার্য

ডাকবাংলো স্থাপন ও পরিচালনা করিবার এবং হাট বাজার বসাইবার এবং নদীর উপর পার হইবার ব্যবস্থাও করে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে সাহায্যদানেও ইহার অন্যতম কর্তব্য।

এতগুলি গুরুতর কর্তব্যসাধনের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা কখনই জেলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হয় নাই। ইহার আয়ের প্রধান উৎস ছিল পথকর বা Road Cess। উহা জমির খাজনার সহিত আদায় করিয়া সরকার জেলা বোর্ডকে প্রদান করেন। ইহা ছাড়া জেলা বোর্ড খোঁয়াড়, ফেরিঘাট, রাস্তার দুই-পাশের আম, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ হইতে ও হাটবাজার হইতে কিছু টাকা পায়। রাজ্যসরকারও জেলাবোর্ডকে কিছু অর্থ সাহায্য করে। তা' ছাড়া রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া জেলা বোর্ড ঋণগ্রহণ করিতে পারে। জেলা বোর্ডের কাছে যে সব কার্যের প্রত্যাশা করা হয় তাহা উল্লিখিত আয় হইতে সম্পন্ন করা অসম্ভব। পথকরের হার বৃদ্ধি পায় নাই, অথচ রাস্তা মেরামতের খরচা অন্ততঃ পাঁচ গুণ বাড়িয়াছে। কাজেই জেলা বোর্ডের রাস্তার দুর্গতির সীমা নাই। সৌভাগ্যবশতঃ অনেক রাস্তা সংরক্ষণের ভার কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার গ্রহণ করিয়াছে। বহু স্থানের হাসপাতালের ভারও রাজ্যসরকার লইয়াছে। যে সব রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ভার জেলাবোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল সেখানে শিক্ষকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া বেতন পাইতেন না।

অর্থের অনটন

অর্থাভাব ছাড়া জেলা বোর্ডের কর্তৃপক্ষের মধ্যে সততা ও যোগ্যতারও অভাব ছিল। বিনা বেতনের নির্বাচিত ব্যক্তিদের পক্ষে কাজের খুঁটিনাটি দেখা কঠিন। বেতনভুক্ কর্মচারীদের উপর নির্ভর করিলে ঘুসপ্রথা নিরোধ করা কঠিন হয়। খাবার জিনিসে ভেজাল, দুধে জল মেশানো প্রভৃতি নিবারণ করা জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্যকর্মচারীর কর্তব্য, কিন্তু রহস্যজনক কারণে সে কর্তব্য অবহেলিত হয়।

অন্যান্য ত্রুটি

এইসব নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বহু রাজ্যে জেলাবোর্ড বিলুপ্ত বা মৃতপ্রায় হইয়াছে। উহার স্থলে নূতন করিয়া জেলাপরিষদ স্থাপন করা হইয়াছে। জেলাপরিষদের কার্য কিন্তু পরামর্শ দান করা।

লোকাল বোর্ড : ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের মাঝখানে প্রত্যেক মহকুমায় এক একটি লোকাল বোর্ড আছে। উহাতে অন্ততঃ ছয় জন সদস্য থাকেন

এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। লোকাল বোর্ড জেলা বোর্ডের এজেণ্টরূপে কাজ করে। ইহার কোন স্বতন্ত্র আয় নাই। সুতরাং ইহাকে স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে ধরা যায় না।

মিউনিসিপ্যালিটি : পঞ্চায়েত, অঞ্চল-পঞ্চায়েত ও জেলাবোর্ড পল্লী অঞ্চলের সুখসুবিধার জন্য বর্তমান; আর শহরের জন্য আছে মিউনিসিপ্যালিটি। পশ্চিমবঙ্গে ১৪৫টি শহর আছে, তাহার মধ্যে ১২টিতে এক লক্ষের বেশি বাসিন্দা আছে, ১৮টিতে পঞ্চাশ হাজার হইতে এক লক্ষ বাসিন্দা, ৪৭টিতে ২০ হাজার হইতে ৫০ হাজার অধিবাসী, ৩১টিতে দশ হাজার হইতে বিশ হাজার পর্যন্ত, ২৭টিতে পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার এবং দশটিতে পাঁচ হাজারেরও কম অধিবাসী আছে। রাজ্য সরকার যে কোন শহরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা ও চন্দননগরে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন আছে। কলিকাতা ছাড়া হাওড়া, দক্ষিণ শহরতলি, ভাটপাড়া, খড়গপুর, গার্ডেন রীচ, কামারহাটি, দক্ষিণ দমদম, বর্ধমান, বরানগর, আসানসোল ও বালীতে লক্ষাধিক লোকের বাস। এই সব স্থানের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের আয়ও যেমন বেশি কর্তব্যও তেমনি গুরুতর।

পশ্চিম বঙ্গের শহর

মিউনিসিপ্যালিটির কার্যভার মিউনিসিপ্যাল কমিসনারগণের পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে। তাঁহাদের নির্বাচন হয় এমন সব ব্যক্তির দ্বারা যাঁহারা ঐ শহরে নির্বাচনের পূর্বে অন্ততঃ বারমাস ধরিয়া বাস করিতেছেন বা তথায় কোন পেশায় নিযুক্ত আছেন বা ব্যবসা করিতেছেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে শহরের শতকরা ১৪ জন ব্যক্তির ভোট দিবার ক্ষমতা ছিল। এখন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর ও নারীকে ভোটের অধিকার দিবার প্রস্তাব পাস হইয়াছে। কমিসনারগণের সংখ্যা নয় জনের কম এবং ত্রিশ জনের বেশি হইবে না। রাজ্য সরকার প্রয়োজন বুঝিলে তপশীলী জাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কমিসনারগণ চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে হইতে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচন করেন। যে সকল মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকার উপর সেখানে কমিসনারগণ একজন বেতনভুক্ কার্যনির্বাহককে (Executive officer) নিযুক্ত করিতে পারেন। বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটিতে একজন ইঞ্জিনীয়ার ও একজন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মচারী (Health officer) থাকেন।

সংগঠন

মিউনিসিপ্যালিটির কাজকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিবিধ। ব্রিটেনের পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে পুলিশ কাজ করে, ভারতবর্ষের কোথাও মিউনিসিপ্যালিটিকে পুলিশের উপর অধিকার দেওয়া হয় নাই। মিউনিসিপ্যালটি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পায়খানা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি সাফ করা, পানীয় জল সরবরাহ, অস্বাস্থ্যকর স্থানকে বাসোপযোগী করা, জল নিকাশের ব্যবস্থা, টীকা দিয়া সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হইতে লোককে রক্ষা করা প্রভৃতি ব্যবস্থা করে। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, আগুন নেবানোর ব্যবস্থা, বিপজ্জনক পেশাকে নিয়ন্ত্রণ, পথের চলাচলের বাধা-বিপত্তি দূর করা, খাদ্য ও ঔষধাদির বিক্রয় ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা করে। লোকের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট তৈয়ারি, সংরক্ষণ ও মেরামত করা এবং রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য। শ্রমিকদের ও নিজের হরিজন ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ ও বস্তির উন্নতিসাধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও পৌরসভার কার্য। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করা এবং পাঠাগার প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করা ইহার একটি প্রধান কর্তব্য। বিবিধ কর্তব্যের মধ্যে উদ্যান ও পার্ক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা, শ্মশান, কবর, খোঁয়াড় প্রভৃতির ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চবিধ কর্তব্য

এই সব কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য যথেষ্ট আয়ের প্রয়োজন। মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের প্রধান উৎস হইতেছে বাড়ি ও জমির উপর কর। ইহাকে Holding Rate বলে। কয়েক বৎসর পরপর এই করের হার নূতন করিয়া ধার্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি সেবা করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি উহার দাম লন, যেমন, পায়খানা সাফ করা, জল সরবরাহ করা, পথে আলো দেওয়া ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ গাড়িঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি পশু রাখার লাইসেন্স দিয়া কিছু আয় হয়। চতুর্থতঃ মিউনিসিপ্যালিটি বৃত্তি ও ব্যবসার উপর কর বসাইতে পারে। পঞ্চমতঃ মিউনিসিপ্যালিটি হাট বাজার প্রভৃতি বসাইয়া ও নিজস্ব ঘরবাড়ি ও জমি ভাড়া দিয়া কিছু আয় করিয়া থাকে। তবে পশ্চিম বঙ্গের কোন মিউনিসিপ্যালিটিই পাশ্চাত্ত্য দেশের পৌর প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ, যাতায়াতের জন্য ট্রাম বাস প্রভৃতি জোগান দিবার ব্যবসা করিয়া টাকা রোজগার করে না।

আয়ের উৎস

অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটিতেই পথঘাটের অবস্থা শোচনীয়। রাস্তা সময়মত মেরামত করা হয় না; কথনও কদাচিত মেরামত হইলেও তাহা এত খারাপভাবে হয় যে বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে আবার যে-কে সেই দশা; পথে নিয়মিতভাবে ঝাড়ু পড়ে না, রাস্তায় জল দেওয়া খুব কমই হয়। পথের আলো অপ্রচুর। মিউনিসিপ্যালিটির প্রাথমিক কর্তব্য এইভাবে যে অবহেলিত হয় তাহার জন্য কমিসনারগণের অযোগ্যতা, অসাধুতা, দলাদলি প্রভৃতি কিছুটা দায়ী বটে; কিন্তু উহার মূল কারণ হইতেছে পয়সার অভাব। মেথর, ঝাড়ুদার প্রভৃতি হরিজন কর্মীদের বেতন গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে পাঁচগুণ বাড়িয়াছে; রাস্তা মেরামতের সরঞ্জাম প্রভৃতির মূল্যও অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই হারে বাড়ির ও জমির উপর ট্যাক্স বাড়ে নাই। পাঁচ বছর পরপর যে নূতন করিয়া কর নির্ধারিত (assessment) হয়, সে কার্য কিন্তু নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞের দ্বারা করানো হয় না। ব্রিটেনে ঐ কার্যের জন্য সরকারী বিশেষজ্ঞ আছেন। তাঁহারা বিভিন্ন পৌরসভার এলাকায় যাইয়া বাড়ি ও জমির অবস্থান, আয়তন প্রভৃতি দেখিয়া কর স্থির করেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর পৌরসভা হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু আমাদের দেশে এ্যাসেসর কর স্থির করিবার পর পৌরপিতাদের নিকট আপিল করা চলে এবং সে আপিল প্রায়ই ব্যর্থ হয় না।

দোষত্রুটি

ত্রুটিবিচ্যুতির কারণ

অনেক মিউনিসিপ্যালিটিতে কর আদায়ে শৈথিল্য দেখা যায়। উহা নিবারণ করিবার জন্য এখন সুদ হিসাবে জরিমানা আদয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সময়মত টাকা আদায় হয় না। এই বিষয়ে আবার পৌরপিতারাই বেশি দোষী। তাঁহারা নিজে এবং তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গ অনেক সময় ট্যাক্স দিতে অবহেলা করেন।

কর আদায়ের শৈথিল্য

পৌরসভার কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিসনের মতন একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। এখন পৌরপিতারা নিজেদের আশ্রিত ও অনুগৃহীত ব্যক্তিদিগকে যোগ্যতা না থাকিলেও চাকুরি দেন। কর্মচারীদের বেতন এত অল্প যে, তাঁহারা সন্তুষ্টমনে কাজ করিতে পারেন না। ঠিকাদারদের কাজ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। তাঁহারা ভালভাবে কাজ না করিয়াও অনেক সময়ে সুকৌশলে বিল পাস করাইয়া লন। এ বিষয়ে নাগরিকদেরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোন কোন সময়ে দেখা যায়

কর্মচারী নিয়োগ

যে, কোন গলি বা রাস্তা মেরামতের জন্য কিছু ইঁটপাথর প্রভৃতি ফেলা হইল ; দুই চারি মাস বাদে সহসা সেগুলি অন্তর্হিত হইল, অথচ ঠিকাদার একটি মিথ্যা বিল উপস্থিত করিয়া টাকা লইলেন। এরূপ ক্ষেত্রে নাগরিকদের পৌর-প্রতিষ্ঠানে যাইয়া খোঁজ লওয়া দরকার যে, ভুয় বিলের দরুণ টাকা দেওয়া হইল কিনা। নাগরিকেরা যত্ন লইলে মিউনিসিপ্যালিটির অনেক দোষত্রুটি সহজেই সংশোধন করা যায়।

নাগরিকদের সতর্কতা

কলিকাতা করপোরেশন : কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পুণা, আহামেদাবাদ, পাটনা প্রভৃতি বড় বড় শহরে মিউনিসিপ্যালিটির পরিবর্তে করপোরেশন আছে। মিউনিসিপ্যালিটির তুলনায় করপোরেশনের আত্মকর্তৃত্ব অনেক বেশি। রাজ্য সরকার মিউনিসিপ্যালিটির কাজের যতটা নিয়ন্ত্রণ করেন করপোরেশনের কাজের ততটা নহে। রাজ্যের সাধারণ মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত আইন অনুসারে যে কোন শহরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু কোথাও করপোরেশন স্থাপন করিতে হইলে উহার জন্য স্বতন্ত্র একটি আইন পাস হওয়া প্রয়োজন। মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতিকে চেয়ারম্যান বলে ; কিন্তু করপোরেশনের সভাপতিকে মেয়র বলা হয়। করপোরেশনের নির্বাচিত সদস্যগণকে কাউন্সিলর বলে এবং তাঁহারা আবার কয়েকজন অল্ডারম্যান নির্বাচিত করেন। মিউনিসিপ্যালটিতে অল্ডারম্যান নাই।

মিউনিসিপ্যালিটির সহিত করপোরেশনের পার্থক্য

বিভিন্ন করপোরেশনের সদস্য সংখ্যা বিভিন্ন। বোম্বাই সহরে ১০৬ জন, কলিকাতায় ৮৬ জন, মাদ্রাজে ৬১ জন ও পাটনায় ৫২ জন সদস্য আছেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কলিকাতা করপোরেশনে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী ছিল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বারা উহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। ঐ সময়ে নিয়ম হয় যে, যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং ম্যাট্রিক, স্কুল ফাইনাল বা অনুরূপ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং যাঁহারা বস্তি অঞ্চলে মাসে অন্ততঃ ৪ টাকা ও অন্য অঞ্চলে ৮ টাকা ভাড়া দেন তাঁহারা ভোট দিতে পারিবেন। এই নিয়ম থাকায় বহু দরিদ্র ব্যক্তি ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আইন করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর বা নারী করপোরেশনের নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন।

করপোরেশনের সংগঠন

কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড হইতে ৮০ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত

হন। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সভাপতি পদাধিকার বলে করপোরেশনের কাউন্সিলর হন। এই ৮১ জন কাউন্সিলর পাঁচ জন অল্ডারম্যানকে নির্বাচন করেন। ঐ ৮৬ জন সদস্য আবার নিজেদের মধ্য হইতে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। কাউন্সিলরদের কার্যকাল চার বৎসর এবং মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের কার্যকাল এক বৎসর মাত্র। সরকার হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য একজন প্রধান কর্মসচিব (Chief Commissioner) নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করা হয়। করপোরেশনে প্রধান ইঞ্জিনীয়ার, পাবলিক হেলথ অফিসার প্রভৃতি বহু কর্মচারী আছেন।

প্রতিবৎসর করপোরেশন কাউন্সিল, শিক্ষা, হিসাব, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পূর্তকার্য, কর, অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে নয়টি স্থায়ী কমিটি নির্বাচন করে। একজন সদস্য একাধিক কমিটির সদস্য হইতে পারেন না। মহানগরীর ৪।৫টি করিয়া ওয়ার্ড লইয়া এক একটি 'বরো' (Borough) গঠিত হয়। প্রত্যেক 'বরো'র জন্য এক একটি স্থায়ী কমিটি আছে। সংশ্লিষ্ট কমিটিতে বিবেচনা করিবার পর সাধারণতঃ কোন প্রস্তাব করপোরেশন কাউন্সিলের সামনে উপস্থিত করা হয়। কাউন্সিল কাজের মূলনীতি স্থির করিয়া দেন। স্থায়ী কর্মচারীরা উহাকে কার্যে পরিণত করেন।

কমিটি প্রথা

করপোরেশনের কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক। রাস্তাঘাট তৈয়ারি, সংরক্ষণ ও মেরামত করা, রাস্তার নামকরণ করা, শহরে পানীয় জল ও অপরিশ্রুত জল সরবরাহ করা, পথে আলোকদানের ও শহরের জল ও ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা কাজ তো আছেই, তাহার উপর বিভিন্ন এলাকায় পার্ক ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগার, প্রভৃতিকে সাহায্যদান, ভেজাল খাদ্য ও ঔষধের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, হাটে বাজারে পচা মাছ, মাংস বা ফল তরকারি যাহাতে বিক্রয় না হয় তাহার ব্যবস্থা, সংক্রামক-ব্যাধি প্রতিরোধের চেষ্টা, টিকা দেওয়া, হাসপাতাল, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি পরিচালনা বা উহাদিগকে সাহায্যদান, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা, আগুন লাগিলে তাহা দমকলের সাহায্যে নিভাইবার চেষ্টা করা প্রভৃতি অসংখ্য দায়িত্ব করপোরেশনের উপর অর্পিত হইয়াছে। করপোরেশনের বিনা অনুমতিতে কেহ গৃহাদি নির্মাণ করিতে পারেন না। সাধারণ মিউনিসিপ্যালিটিরও ঐরূপ ক্ষমতা আছে। যাহাতে নগরবাসীরা বিশুদ্ধ মাংস পান, সেই উদ্দেশ্যে করপোরেশনের

কর্তব্যাবলী

নিজস্ব পশুহত্যাশালা আছে। করপোরেশন হইতে শ্মশান, কবর ও গোরস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। কারিগরী শিক্ষায় ও দেশের শিল্পকলা প্রভৃতিতে উৎসাহ দেওয়াও করপোরেশনের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত।

আয়ের উৎস

করপোরেশনের আয়ের প্রধান উৎস হইতেছে (১) বাড়ির ও জমির বার্ষিক মূল্য অনুসারে ধার্য কর (rates) (২) জল, আলো, পায়খানা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করার জন্য ঐসব সেবার দামরূপে কর (৩) দোকানাদিঃও বৃত্তি এবং পেশার উপর কর (৪) গাড়ি, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতির উপর কর (৫) রাজ্য সরকার মোটর গাড়ির উপর যে কর আদায় করে তাহার একাংশ (৬) করপোরেশনের বাজার এবং গৃহাদি নিজস্ব সম্পত্তি হইতে আয় (৭) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সাহায্য। এগুলি ছাড়া করপোরেশন রাজ্য সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

অসাফল্যের কারণ

করপোরেশনের বার্ষিক আয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দুই কোটি টাকার বেশি ছিল। এখন উহা অনেক বাড়িয়াছে বটে; জিনিসপত্রের মূল্যও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সবের চেয়েও বড় কথা এই যে দেশ বিভাগের ফলে কলিকাতার উপর জনসংখ্যার চাপ অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। শহরের রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি এত লোকের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। এইসব সমস্যা ছাড়া করপোরেশন পরিচালনায় যথেষ্ট দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও দলাদলির প্রবৃত্তি দেখা যায়।

ভাষার সমস্যা ঃ এক ভাষা দেশের মধ্যে প্রচলিত থাকিলে জাতীয়-ঐক্য ও সংহতি পরিপুষ্ট হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসে ভারতবর্ষে ৮৪৫টি ভাষা উল্লিখিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে নিম্নলিখিত চৌদ্দটি ভাষা সংবিধানে রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে—অসমীয়া, বাংলা, গুজরাতি, হিন্দী, উর্দ্দু, কন্নড়, কাশ্মিরী, মালয়ালাম, মারাঠি, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু।

নিম্নে প্রধান প্রধান ভাষাভাষীদের সংখ্যা প্রদত্ত হইল :—

হিন্দী, উর্দ্দু, হিন্দুস্তানী ও পাঞ্জাবী মিলাইয়া—	১৪,৯৯,৪৪,৩১২
তেলেগু—	৩,২৯,৯৯,৯১৬
মারাঠি—	২,৭০,৪৯,৫২২
তামিল—	২,৬৫,৪৬,৭৬৪
বাংলা—	২,৫১,২১,৬৭৪
গুজরাতি—	১,৬৩,১০,৭৭১
কন্নড়—	১,৪৬,৭১,৭৬৪
মালয়ালম্—	১,৩৩,৮০,১০৯
ওড়িয়া—	১,৩১,৫৩,৯০৯
অসমীয়া—	৪৯,৮৮,২২৬

হিন্দী ভাষাভাষীরা হিন্দীকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কিন্তু সংবিধানে বলা হইয়াছে যে হিন্দীভাষা ও দেবনাগরী লিপি ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা (Official language)। তবে সংবিধান কার্যকারী হইবার পনের বৎসর পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারী পর্যন্ত) ইংরাজি ভাষা ইউনিয়নের সরকারী কাজ চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। রাষ্ট্রপতি ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংরাজীর অতিরিক্ত হিন্দী ভাষাতেও কাজকর্ম চালাইবার নির্দেশ দিবার অধিকার পাইয়াছেন। উক্ত পনের বৎসর পরে সংসদকে কোন নির্দিষ্ট কাজকর্ম চালাইবার জন্য ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে আইন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন ভাষা

সংবিধানে হিন্দীভাষা কিভাবে উন্নত ও সর্বজনপ্রিয় করা যায় সে বিষয়েও উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণভারত, বাংলা প্রভৃতি অ-হিন্দী ভাষী অঞ্চল দাবি করে যে ইংরাজি ভাষাকে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী কাজের ভাষারূপে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাখা হউক। এরূপ করিতে হইলে সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার সংসদের সামনে বলেন যে ভারতের সংহতি রক্ষার জন্য ঐরূপ সংশোধন প্রস্তাব শীঘ্রই আনা হইবে। ইতিমধ্যে চীনা হামেলা বাধিল। দেশের সংকটজনক পরিস্থিতিতে ভাষা লইয়া কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনা যুক্তিযুক্ত হইবে না বলিয়া উহা মুলতুবি রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি একটি বিল উত্থাপন করিয়া ইংরাজীর মেয়াদ আরও দশবৎসর বাড়াইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ইংরাজীর স্থান

বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভা এক বা একাধিক ভাষা অথবা হিন্দীকে সরকারী ভাষা বা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। এরূপ না করা পর্যন্ত ইংরাজিই সেই রাজ্যের সরকারী কাজের ভাষা থাকিবে। ইউনিয়নের সরকারী ভাষায় ইউনিয়নের সহিত বিভিন্ন রাজ্যের কার্যকলাপ চালাইতে হইবে। তবে পরস্পরের মধ্যে আপোষ ব্যবস্থা করিয়া এক রাজ্য অন্য রাজ্যের সহিত হিন্দীতে কাজ চালাইতে পারেন। হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দীকেই সরকারী কাজের মাধ্যম রূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। যে সব কর্মচারীরা হিন্দী জানিতেন না তাঁহাদিগকে হিন্দী শিখিবার জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছিল। যাঁহারা ঐ সময়ের মধ্যে হিন্দী শিখিয়া উঠিতে পারেন নাই তাঁহাদের অনেকের চাকুরি গিয়াছে। মাদ্রাজে তামিল ভাষাকে এবং পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষাকে সরকারী কাজের ভাষা বলা হইয়াছে। মাদ্রাজে সরকারী ভাবে ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে নির্দিষ্ট এক তারিখের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র পঠনপাঠন তামিল ভাষায় হইবে। এইরূপে ভাষা লইয়া বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মন কষাকষি চলিতেছে। প্রশ্নটি শুধু ভাষা ও সংস্কৃতিগত নহে, ইহার আর্থিক গুরুত্বও আছে। যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নহে তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন যে হিন্দীভাষা-ভাষীরা প্রতিযোগিতামূলক চাকুরির ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা করিয়া লইবেন। এই আশঙ্কা দূরীভূত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি হিন্দীভাষাভাষী রাজ্যকে নির্দেশ দেন যে তথাকার

হিন্দীভাষার প্রচার

প্রাদেশিক সরকারী চাকুরির জন্য যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লওয়া হয় তাহাতে হিন্দীভাষার বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না। ঐ সব প্রদেশ ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ঐ নির্দেশ মানিয়া লইয়াছে। এ পর্যন্ত ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিসনের দ্বারা পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় হিন্দীকে বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। ভাষা লইয়া বিরোধ যদি উগ্র আকার ধারণ করে তাহা হইলে ভারতের সংহতি ও গণতন্ত্র বিপন্ন হইবে। গণতন্ত্রের মূল

সহনশীলতা প্রয়োজন

কথা হইতেছে পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতা। হিন্দীভাষা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের যোগসূত্রস্বরূপ হউক ইহা প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তিই স্বীকার করেন। কিন্তু যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নহে তাঁহাদিগকে হিন্দী ভাষা শিখাইবার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া প্রয়োজন। জেহাদের মনোবৃত্তি লইয়া হিন্দী প্রচার করিতে গেলে সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশি হইবে।

অনুন্নত ও তপশিলী জাতি ও জনজাতিসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ: ভারতের জনসমূহের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান একরূপ নহে, তাঁহাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার স্তরও ভিন্ন ভিন্ন। অনুন্নত শ্রেণীগুলিকে যতদিন পর্যন্ত না একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত করা যায়, ততদিন পর্যন্ত ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হইবে না। আমরা আমেরিকার নিগ্রোদের মতন একদল লোককে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিতে চাহি না। তাই আমাদের সংবিধানে নানাবিধ তপশিলী জাতি, জনজাতি (Tribes) ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের (Backward Classes) স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। (১) ছুঁৎমার্গ পরিহার

উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা

(১৭ ধারা) ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সংসদ ছোঁয়াছুয়ির নিরোধমূলক এক আইন পাস করিয়া যাঁহারা হরিজনদিগকে কোন মন্দিরাদি সাধারণের পূজার স্থানে, কূপ,পুষ্করিণী, হোটেল, ধর্মশালা, হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে প্রবেশে বাধা দিবেন তাহাদের কঠোর শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। (২) এইসব শ্রেণীর ব্যক্তিদের শিক্ষার ও আর্থিক উন্নতির বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাঁহারা যাহাতে সাধারণ, বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের জন্য আসন সংরক্ষিত হইয়াছে। (৩) তাঁহাদের জন্য চাকুরির একটা নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম করে যে যেসব চাকুরিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা লোক লওয়া হয়, সেই সব পদের শতকরা সাড়ে বারটি পদ তপশিলী জাতিদের জন্য ও

তপশিলী জনজাতিদের জন্য শতকরা পাঁচটি পদ সংরক্ষিত থাকিবে। বিনা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যেসব পদ পূর্ণ করা হয়, তাহার শতকরা ১৬⅔ ভাগ তপশিলী জাতিদের জন্য ও ৫ ভাগ তপশিলী জনজাতির জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। অবশ্য তাঁহাদের ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। এইসব শ্রেণীর পরীক্ষার্থীর নিকট হইতে কম হারে ফিঃ লইবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। তাঁহাদের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন বয়সের সীমা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। চাকুরিতে প্রমোশন দিবার বিষয়েও তাঁহাদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের অধীনে তিন লক্ষ উনিশ হাজার নয়শত আটানব্বই জন কর্মচারী তপশিলী জাতি ও জনজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই অবশ্য রেল ও ডাক বিভাগে চাকুরি করেন।

কিয়দংশ চাকুরির সংরক্ষণ

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে একটি লোহার শিকলের যেমন প্রত্যেকটি অংশ সমান মজবুত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি যে কোন সরকারী বিভাগের ছোট বড় প্রত্যেক কর্মচারী সমান দক্ষ হওয়া দরকার। রেলের সামান্য একজন গুমটিঘরের পয়েণ্টস্‌ম্যানের কর্তব্যের অবহেলার দরুণ ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। অনুন্নত শ্রেণীদের উন্নতি করিবার সর্ববিধ চেষ্টা করা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলিয়া যোগ্যতার মান যেন হ্রাস না পায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তপশিলী জাতি, জনজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের বেতন, পুস্তকের মূল্য, বাসস্থান, বৃত্তি প্রভৃতি সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্নাতক হইতেছেন এবং অনেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাস করিতেছেন। দক্ষিণ ভারতে অধিকাংশ চাকুরিই অ-ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত। কাজেই সেখানকার ব্রাহ্মণেরা হয় নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পাস করিবার চেষ্টা করেন, না হয় ব্যবসাবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। চাকুরির সাধারণ দরজা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বহু ব্রাহ্মণ শিল্প ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে কোন কোন চাকুরিতে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইতেছে বলিয়া বিক্ষোভ প্রকাশ নিরর্থক। চাকুরির ভাগবাটোয়ারা লইয়া ভারতের গণতন্ত্র যেন বিপন্ন না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

চাকুরি সংরক্ষণের সুফল ও কুফল

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তপশিলী জাতি ও জনজাতির জন্য সংসদেও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় কতকগুলি আসন সংরক্ষিত হইয়াছে। এরূপ সংরক্ষণ প্রথমে দশ বৎসরের জন্য করা হইয়াছিল, এখন আরও দশবৎসর উহার মেয়াদ বাড়ানো হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে এইভাবে আইন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দেওয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আইনসভায় সংরক্ষিত আসন

তপশিলী জাতি ও জনজাতির উন্নয়নের জন্য যেসব সুবিধা সংরক্ষণ করা হইয়াছে তাহার ফল কিরূপ হইতেছে, তাঁহারা কতখানি সুযোগ সুবিধা পাইতেছেন তাহা নির্ণয় করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন বিশেষ পদাধিকারী (Special Officer) নিযুক্ত করেন। তিনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহা সংসদে পেশ করা হয়। শিক্ষা ও সামাজিক ব্যাপারে অনুন্নত শ্রেণীদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের অগ্রগতির বাধা দূর করিবার জন্য সুপারিশ করিবার ক্ষমতা দিয়া রাষ্ট্রপতি মাঝে মাঝে একটি কমিসন নিযুক্ত করিতে পারেন। এইরূপ একটি কমিসন কিছুদিন পূর্বে একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে।

বিশেষ পদাধিকারী ও কমিসন

কমনওয়েলথে ভারতের সদস্যতা: ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত-স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act) পাস করিবার পর ঐ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়নে পরিণত হয়। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র যেমন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ওয়েস্টমিনস্টার আইন বলে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাধীন হইয়াছিল, ভারতবর্ষও সেইরূপ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থাকিয়া এবং ব্রিটিশ রাজের (Crown) আনুগত্য স্বীকার করিয়াও স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল। প্রায় সাড়ে আটাশ মাস ডোমিনিয়নরূপে থাকার পর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষ স্বাধীন সাধারণতন্ত্র হইল। যে দেশ সাধারণতন্ত্র হয় সে দেশে রাজার কোন স্থান থাকে না। কাজেই ভারতবর্ষ ব্রিটনের রাজাকে আর প্রধানরূপে স্বীকার করে না। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে এপ্রিল তারিখে কমনওয়েলথের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হয় যে ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের সদস্যপদ বজায় রাখিবে এবং রাজাকে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সংঘের ঐক্যের প্রতীকরূপে মানিবে। ("The Government of India have, however, declared and affirmed

India's desire to continue her full membership of the Commonwealth of Nations and her acceptance of the king as the symbol of the free association of its independent member nations and as such, the Head of the Commonwealth.")

রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ যখন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহন করেন, তখন তিনি কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রে উহা ঘোষণা করেন; কিন্তু ভারতবর্ষ সাধারণতন্ত্র বলিয়া এখানে কোন ঘোষণা করা হয় নাই।

ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকায় ব্রিটেনে ও অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রে ভারতীয় দ্রব্যাদি রপ্তানি করতে সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটেন ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে (European Common Market) যোগ দিবে বলিয়া স্থির করায় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্র ঘোরতর আপত্তি জানায়। ব্রিটেন এখনও উহাতে যোগ দেয় নাই।

ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সহিত মৈত্রী সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছে; ইহাতে তাহার স্বাতন্ত্র্যের কিংবা গণতন্ত্রের কোন হানি হয় নাই। আমরা ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র হইতে সংসদীয় শাসনপ্রথা, দ্বিসদনযুক্ত সংসদ, স্বাধীন নির্বাচন প্রথা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছি। ব্রিটেনের গণতন্ত্রকে ভারতবর্ষের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক অনুকরণযোগ্য আদর্শ বলিয়া মনে করেন।

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ: ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সামূহিক বিকাশ যোজনা (Community Development Project) কতদূর সফল হইয়াছে বিচার করিবার সময় শ্রীবলবন্তরায় মেহেতার নেতৃত্বে যে অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতির উপর জোর দেয়। এই নীতির দুইটি দিক আছে। এক দিকে ইহাতে বলা হয় যে, পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে নীতি নির্ধারণ. অর্থের ব্যবহার ও প্রশাসনের সমস্ত ব্যবস্থা নিজেরাই করিবেন; অন্যদিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য-সরকার ও জেলার শাসকবর্গ তাঁহাদের কাজে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ করিবেন না। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করিলে উপর হইতে নীচের দিকে কর্তৃত্বভার ন্যস্ত হইবে এবং জনগণের সহকারিতায় সমস্ত কার্য নিষ্পন্ন হইবে। এই নীতির সমর্থকেরা বলেন যে গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতরাজ স্থাপিত হইলে গ্রামগুলি পুনর্জীবন লাভ করিবে, তথাকার লোকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ জুটিবে এবং

সকলের উপরে পলিটিক্সের ঘূর্ণাবর্ত হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। এই আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বিভিন্ন রাজ্যের সরকার পঞ্চায়েতীরাজ স্থাপনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশূর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে শতকরা এক শতভাগ লোকের জন্য এবং মহারাষ্ট্রে ৯৯ ভাগ, মাদ্রাজে ও গুজরাতে ৯৮ ভাগ, উড়িষ্যায় ৯৬ ভাগ, বিহারে ৯৫ ভাগ, কেরলে ৯১ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে ৬৯ ভাগ ও পশ্চিমবঙ্গে ২৮ ভাগ পল্লী অঞ্চলের লোকের জন্য পঞ্চায়েত স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যত্র সর্বস্থানে সামূহিক বিকাশের (Community Development) সহিত পঞ্চায়েতকে সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। আমরা পঞ্চায়েতীরাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি কিভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লকের পঞ্চায়েতী সমিতি ও জেলা পরিষদ এ ত্রি-স্তরে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সংগঠন হইয়াছে। ইহার ফলে পঞ্চায়েতের হাতে প্রচুর ক্ষমতা আসিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, গ্রামের লোক কি রাজনৈতিক দলাদলির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে? গত নির্বাচনের সময় দেখা গিয়াছে যে, পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান তাঁহাদের অনুচরবর্গ লইয়া যে দিকে ঝুঁকিয়াছেন সেই দিকেই বেশি ভোট পড়িয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি প্রধান ও সরপঞ্চকে হাত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি উহাদিগকে নির্বাচন করিবার সময়েই রাজনৈতিক দলের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল, যদিও পঞ্চায়েতী আইনে রাজনৈতিক দলের কোন স্থান নাই। কেহ কেহ বলেন যে পঞ্চায়েতীরাজের প্রভাবে গ্রামে দলাদলি আরও বাড়িয়াছে। পূর্বে যেখানে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া দলাদলি হইত এখন সেখানে ক্ষমতালাভের জন্য জোট পাকানো হয়। পাঞ্চায়েতের নির্বাচনের সময় যে দল জয়লাভ করে, সেই দলের লোকের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নলকূপ বসানো হয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে যেখানে তকাবি ধার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে সেখানে সরপঞ্চের বিরোধীরা যোগ্যতা সত্ত্বেও ঋণ পান না। কিন্তু এরূপ অবস্থার জন্য পঞ্চায়েতীরাজের ব্যবস্থাকে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত **Village Government in India** নামক গ্রন্থে **Ralph H. Rutzlaff** লিখিয়াছেন যে নির্বাচনের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে বিরোধ বাড়ে বটে, কিন্তু নির্বাচনের দরুণ লোকে জোট পাকায় মনে করিলে ভুল হইবে।

পঞ্চায়েতী নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার বহু আগে হইতেই ভারতের পল্লী অঞ্চলে জোট পাকানো বর্তমান আছে ("Elections in rural India offer an opportunity, for competing groups within the villages to manifest their opposition. They reflect village factions and admittedly may even heighten tensions between them, but it is erroneous to say that elections cause factions. Factionalism existed in rural India long before statutory electoral procedures were introduced.)"।

শিশু হাঁটিতে চেষ্টা করিলে পড়িয়া আঘাত পাইবে এই ভয়ে যদি তাহাকে হাঁটিতেই দেওয়া না হয় তাহা হইলে সে যেমন পঙ্গু হয়, তেমনি পল্লী অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিলে সেখানকার লোক জোট পাকাইবে, ভুল করিবে, ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে এই ভয়ে তাহাদিগকে অনন্তকাল ধরিয়া স্বায়ত্তশাসন হইতে বঞ্চিত রাখিলে কোনদিনই তাহাদের মধ্যে নেতৃত্বের উদ্ভব হইবে না। প্রচুর গোবর এক জায়গায় স্তূপীকৃত হইলে যেমন দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো যায়, না, তেমনি প্রচুর ধন ও প্রচুর ক্ষমতা একই কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত করিলে এক অসহ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। গ্রামের লোককে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহাদের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে হইবে এবং তাহাদের বিকাশের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে এই নীতি অনুসারে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্য ও অন্তরায়ঃ ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার ফলে জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুবিধা ঘটিয়াছে। তাঁহাদের নিজের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগিয়াছে। জমিদারি ও সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত হইয়াছে। যে সব রাজা মহারাজা ও রানী মহারানী কখনও তাঁহাদের প্রজার দুয়ারে পদধূলি দিতেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন নির্বাচনপ্রার্থী হইয়া সাধারণের দরজায় ধর্ণা দিতেছেন। আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বংশানুগতিক আনুগত্যের ভাব খুব প্রবল। তাই তাঁহারা সাধারণতঃ প্রাক্তন রাজারানীকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করেন। তবে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেসের নিকট দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধি-

সাধারণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ

রাজ, দ্বিতীয় নির্বাচনে এক কম্যুনিস্ট প্রার্থীর নিকট বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও তৃতীয় নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী এক রেলওয়ে ইউনিয়নের নেতার নিকট ডুমরাঁওয়ের মহারাজকুমার পরাজিত হইয়াছেন। কংগ্রেস অবশ্য এখন অনেক রাজারানীকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইয়া তাঁহাদের নির্বাচনের সুযোগ দিতেছেন।

নির্বাচিত ব্যক্তিদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি বাবদ বহু লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে। এই খরচ এড়াইবার উপায় নাই। তাঁহাদিগকে যদি কোন বেতন ও ভাতা না দেওয়া হয় তাহা হইলে আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করিবার একচেটিয়া অধিকার কেবলমাত্র বড়লোকদেরই হয়। যোগ্য, সৎ অথচ অস্বচ্ছল অবস্থার লোককে নির্বাচনের সুযোগ দিতে হইলে তাঁহাদিগকে বেতন ও ভাতা দিতে হইবে। কিন্তু অভিযোগ শোনা যায় যে কংগ্রেস কখনও কখনও এমন প্রার্থীকে মনোনয়ন করেন যাঁহারা মোটা টাকা খরচ করিতে পারিবেন। মনোনয়ন প্রর্থীদের প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রথমে একটা মোটা ফিঃ লওয়া হয়। এই অভিযোগ সত্য হইলে উহা গণতন্ত্রের অগ্রগতির পরিপন্থী বলিতে হইবে।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বেতনাদি

ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের প্রধান অন্তরায় হইতেছে দারিদ্র্য। বুভুক্ষু, রুগ্ন ও অশিক্ষিত জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু একদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অন্যদিকে মুদ্রা স্ফীতি দারিদ্র্য সমস্যাকে জটিলতর করিতেছে। এরূপক্ষেত্রে সরকারী অর্থের যাহাতে কোন অপব্যয় না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের শাসনপরিষদে (Executive Council) মাত্র ৭জন সদস্য ছিলেন; ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা বাড়িয়া ১৪ হইয়াছিল। এই সদস্যগণ বেতন ও যাতায়াতের ভাতা ছাড়া আর কিছু পাইতেন না। তাঁহাদের পকেট হইতে বাড়ি ভাড়া, জল ও বিদ্যুতের খরচ, লোককে খাওয়াইবার খরচ দিতে হইত। কিন্তু এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীতে ৫৭ জন সদস্য আছেন। ১৯৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ৪৭ এবং বেতন ছিল ১১,৮৬,০০০, ভাতা, যাতায়াতের খরচ প্রভৃতি লইয়া বাজেটে তাঁহাদের জন্য ১৯,১৮,৪০০ টাকা ধরা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগকে বাড়ি ভাড়া, জলের ও বিদ্যুতের খরচ দিতে হইত না। ইংলণ্ডে কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সচিব,

জনসাধারণের দারিদ্র্য

সরকারী খরচের বৃদ্ধি

অর্থ সচিব ও নৌবিভাগের সচিব (First Lord of the Admiralty) সরকারী বাসস্থান পান। এখানে প্রত্যেক মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী বিরাট কম্পাউণ্ড ও বাগান শোভিত সরকারী ভবনে বিনা ভাড়ায় থাকিবার সুবিধা পান। তাঁহাদের বাগানের মালির বেতন ও অন্যান্য খরচা সরকার হইতে দেওয়া হয়। তাঁহাদের গেটে দিনরাত্র পুলিশ প্রহরী মোতায়েন থাকে। যখন তাঁহারা সফরে বাহির হন, তখন প্রত্যেক মন্ত্রীকে রক্ষার জন্য চারজন করিয়া সাধারণ পোষাক পরিহিত পুলিশ বিভাগের কর্মচারী তাঁহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। প্রধান-মন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষা সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীদের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা শুধু ঠাট বজায় রাখার জন্য। যখন দেশে সন্ত্রাসবাদ খুব প্রবল ছিল তখনও বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য এমন বিপুল ব্যবস্থা করা হইত না। প্রাদেশিক মন্ত্রীদের প্রত্যেকের বাড়িতেও সর্বদা পুলিশ মোতায়েন থাকে। তাঁহারা যখন সফরে যান তখন প্রত্যেকের জন্য দুইজন করিয়া পুলিশ কর্মচারী (Security Officer) গোপনে তাঁহাদিগের নিরাপত্তা রক্ষা করেন। তাঁহারাও প্রথম শ্রেণীর রেলকামরায় ভ্রমণ করেন এবং লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে, তাঁহার সহযাত্রী ঐরূপ একজন কর্মচারী নির্বিবাদে সারারাত্রি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়াছিলেন—তাঁহার মন্ত্রী মহাশয় অবশ্য পাশের কামরায় ছিলেন। মন্ত্রীরা প্রায়ই সফর করেন। তাঁহারা যখন যে সার্কিট হাউসে অবস্থান করেন, সেখানে অন্য ব্যক্তির (যাঁহাদের সার্কিট হাউসে থাকিবার যোগ্যতা আছে) স্থান জুটে না। এইভাবে আমাদের মন্ত্রী মহাশয়েরা তাঁহাদের পদগৌরব বজায় রাখেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে তাঁহারা গণতন্ত্রশাসিত দেশের মন্ত্রী, জনসাধারণের সহিত সংযোগ রক্ষা তাঁহাদের কর্তব্য অথচ লোকে পুলিশ প্রহরীর বাহুল্য দেখিয়া মন্ত্রীদের কাছে আগাইতে সাহস পান না। তাঁহারা শুধু দূরে বসিয়া মন্ত্রীদের উপদেশামৃত শ্রবণ করিবার অধিকারী। মন্ত্রীদের ও রাজকর্মচারীদের জীবন-যাত্রার মানের সহিত সাধারণের জীবনযাত্রার স্তরের যদি গুরুতর পার্থক্য থাকে তাহা হইলে লোকে বিক্ষুব্ধ হইতে পারে।

মন্ত্রীদের সহিত জনগণের সংযোগ রাখার ব্যবস্থা

আমাদের দেশের রাজকর্মচারীরাও ব্রিটিশ যুগের শাসকদের ন্যায় নাগরিকদের নিকট হইতে সযত্নে দূরত্ব বজায় রাখেন। তাঁহারা পদমর্যাদার গৌরবে গর্বিত।

সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার হউন, ব্লক বিকাশ অফিসার, এমন কি বড় গ্রামের সাবরেজিস্ট্রার হউন বা গ্রামের দফাদার হউন সকলেই নিজেকে জনগণের হর্তাকর্তা বিধাতা বলিয়া ও জনসাধারণকে তাঁহাদের অনুগ্রহপ্রার্থীরূপে দেখেন। এরূপ মনোবৃত্তি থাকিলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না।

রাজকর্মচারীদের পদমর্যাদা

ব্রিটিশ আমলের পুলিশ, রাষ্ট্র এখন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কাজেই কর্মচারীর সংখ্যা কিছু বাড়িবে ইহা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ সংখ্যা কিছুটা বাড়ে নাই—অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে I. A. S. ও পুরাতন I. C. S. পর্যায়ের ৮০৩ জন কর্মচারী ছিলেন; ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উহা বাড়িয়া ২১৪৭ হইয়াছে। জল স্থল, ও বিমান

কর্মচারীর সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়াছে

বিভাগের সৈন্যদল এবং রেল, ডাক ও তার বিভাগ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সংখ্যা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে উনপঞ্চাশ হাজার মাত্র ছিল; ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে উহা বাড়িয়া এক লক্ষ সত্তর হাজার, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে এক লক্ষ নব্বই হাজার এবং ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে প্রায় চার লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। গত সাতআট-বৎসরের মধ্যে কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিগুণের অধিক হইল কেন? উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হুসেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বলেন যে পদস্থ কর্মচারীরা তাঁহাদের অফিসে কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো তাঁহাদের পদমর্যাদাবৃদ্ধির অন্যতম উপায় বলিয়া মনে করেন। নানা বিভাগের কাজ অনেক বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এত বেশি বাড়া যুক্তিযুক্ত কিনা পরীক্ষা করা দরকার।

জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যধিক আনুরক্তি

ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্য এক প্রধান অন্তরায় হইতেছে জাতি (Caste) ও সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যধিক আনুরক্তি। রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত ধর্মপ্রচারকগণের প্রভাবে বাংলাদেশে অবশ্য জাতির (Caste) খাতিরে বড় একটা কেহ ভোট দেন না, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে দেশের চেয়ে নিজের জাতি লোকের স্বার্থ বড় করিয়া দেখা হয়। ভারতবর্ষকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হইলেও এখনও সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত হয় নাই। প্রাদেশিক

সংকীর্ণতা এদেশেও কম দেখা যায় না। এই সব অন্তরায় দূর করিতে না পারিলে ভারতে যথার্থ গণতন্ত্র স্থাপিত হইতে পারিবে না। শিক্ষার অভাবও গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি প্রধান বাধা। শিক্ষার প্রসার যতটা দ্রুত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তত দ্রুত বেগে শিক্ষার অগ্রগতি ঘটিতেছে না, তথাপি আমাদের দেশের জনসাধারণ ভোট দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতা

কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের সরকার কঠোর হস্তে দুর্নীতি, মুনাফাবাজি, কর ফাঁকি দেওয়া, সরকারী ঋণ পরিশোধ না দেওয়া প্রভৃতি দুষ্কার্য দমন না করিয়া গণতান্ত্রিক আবেদন-নিবেদনের আতিশয্য দেখাইতেছেন। যখনই কোথাও বন্যা, অনাবৃষ্টি বা কোনরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে তখই সরকার হইতে মুক্তহস্তে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেসপ্রধান কোন কোন রাজ্যে টাকা ধার দিবার সময় ভবিষ্যৎ নির্বাচনে যাহাতে ভোট পাইবার সুবিধা হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঋণ দান করা হইয়াছিল। এখন তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা ফেরত পাওয়া কঠিন হইয়াছে। এক দ্বারভাঙ্গা জেলার লোকদের কাছেই দশকোটি টাকা পাওনা আছে বলিয়া ত্রিহুতের কমিসনার মন্তব্য করেন। আমাদের জনপ্রিয় মন্ত্রী মহাশয়েরা অধমর্ণদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন মাত্র। যাঁহারা কালো বাজারে মুনাফা করিয়া সোনার তাল বানাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা সরকারের হাতে ঐ সোনা তুলিয়া দিলে, সোনা তাঁহাদের হাতে কিভাবে আসিল সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে না এবং তাঁহাদিগকে দামও দেওয়া হইবে। যাঁহারা কোটি কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও বিশেষ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। আমাদের সরকার বাঘকে ছাগল না খাইবার জন্য অনুরোধ করার মতন ব্যবসায়ীদিগকে বলেন তাঁহারা যেন বেশি দাম না লন। কিন্তু এত আপীল সত্ত্বেও জিনিস পত্রের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে। গণতন্ত্রের নামে দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

গণতন্ত্র মানে যে সরকারের দুর্বলতা। নহে তাহা প্রমাণ করা প্রয়োজন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবর্ষই গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ। ভারতবর্ষে গণতন্ত্র সফল না হইলে সমগ্র এশিয়া মহাদেশ হইতে গণতান্ত্রিক প্রণালী লোপ পাইবে। তাই

প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য প্রাণপণেদারিদ্র্য, অশিক্ষা, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা ও ভাষাগত জঙ্গী মনোভাব বিদূরিত করা। কোটি কোটি

গণতন্ত্র জয়যুক্ত হইবেই

ভোটার যেরূপ শান্তিপূর্ণভাবে তিন তিনটি সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের সাফল্য সম্বন্ধে প্রচুর আশা জাগে। এখানে একটিমাত্র দল এতাবৎকাল শাসনকার্য চালাইয়া আসিতেছে, কোন প্রবল বিরোধী দল সংগঠিত হয় নাই সত্য, কিন্তু কোন রাজনৈতিকদলের কার্যকলাপে বিন্দুমাত্র বাধা দেওয়া হয় না। সেইজন্য ভারতে গণতন্ত্র জয়যুক্ত হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

———

নির্ঘণ্ট